উন্মনী সারদেশ্বরী

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ-সারদা সপ্তমী

প্রকাশিকা :

সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী

মাতৃমন্দির

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

প্রচ্ছদপট শিল্পী :

আচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

শান্তিনিকেতন

মুদ্রক :

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

বোধি প্রেস

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন,

কলিকাতা ৬

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

সিউড়ী, বীরভুম

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তোষ সেবায়তন

২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন

বরাহনগর

কলিকাতা ৩৬

ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস

৫১ সি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা

মূল্য ৩৲

উৎসর্গ

"মা"

—নিবেদন—

আজ জগৎ জুড়ে স্থরু হয়ে গেছে শ্রীশ্রীমা'র পূজা আরাধনা…

সকলেই আনে তাদের নিবেদন সম্ভার…

ক্ষুদ্র ও দীন হলেও এই বিশ্বজোড়া আয়োজনে আমাদেরও আছে অংশ, তাই আমরাও করেছি যোগাড়, সামর্থ অনুযায়ী পূজা উপায়ন, বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর শত বার্ষিকী উপলক্ষে……

লেখিকা তাঁর ধ্যান ও অনুভূতির স্থরকম্পনে রচনা করেছেন এই বইখানি।

উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রীতি……

ভুল দোষ সব মার্জ্জনা করবেন লেখিকার বয়সের মাপকাঠিতে শ্রদ্ধা জানাই প্রচ্ছদপটের নন্দিত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুকে। শ্রদ্ধা জানাই সুচিন্তিত ভূমিকা লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে।

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত অক্ষয় চৈতন্যের "জননী সারদেশ্বরী" শ্রীআশুতোষ মিত্রের "শ্রীমা" উদ্বোধনের প্রকাশিত "শ্রীমা'র কথা" ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ও বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাপ্ত কয়েকটী বই এর সহায্য গ্রহণের ঋণ স্বীকার করি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী
প্রকাশিকা

ভূমিকা

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নম ওঁ।

ওঁ শ্রীশ্রী ১০০৮ শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবো জয়তি।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।

সারদারামকৃষ্ণাখ্যৌ বন্দেঽহং পিতরৌ সতাম্ ১॥

জগজ্জননী মহামায়াখ্যা পরিপূর্ণা ভগবচ্ছক্তি নারীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন জননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীরূপে। তাঁহার মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিতেন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব। তাঁহারই প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া জননীর ঐশ্বরিক রূপ ও বিভূতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণতনয়বৃন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ লীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ। নিজের মধ্যে মহত্ত্ব না থাকিলে মহত্ত্বের অনুভব ও সমাদর করা অসম্ভব। মাদৃশ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন রাগদ্বেষবশীভূত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীশ্রীমাতার সম্বন্ধে কোন উক্তি করা ধৃষ্টতার পরিচায়কমাত্র নহে, ইহা অপরাধও। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের উক্তি,—"আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া"—গুরুজনের আদেশ বিনা বিচারে পালন করিতে হইবে। মহাকবির এই উপদেশ ও আদেশের অনুবর্ত্তনে স্বামীজি মহারাজদিগের বাক্যে অভিব্যক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভীতভীতচিত্তে আমি শ্রীঅর্চ্চনাপুরী বিরচিত জননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবনালেখ্যের মুখবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সাধুগণ এই অসমসাহসিকতা মার্জ্জনা করিবেন সন্দেহ নাই। মাতা অর্চ্চনাপুরী এই জীবনালেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন ভক্তির আবেশে। তাঁহার চিত্ত শ্রীশ্রীমাতার ধ্যানরসে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অতিরিক্ত ভাবাবেগে উচ্ছলিত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে ভাষায়। ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

ভগবান্ নিজেকে স্বেচ্ছায় ভক্তিরজ্জুতে আবদ্ধ করেন এবং তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্য দিব্যচক্ষু দান করেন। তাই সম্ভব হইয়াছে এইরূপ হৃদয়বিদ্রাবী আখ্যানের রচনা। যাঁহারা ঐতিহাসিক, ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের অনুসন্ধানে নিরত, তাঁহারা বাহ্যবস্তুর ও বৃত্তান্তের বিবরণের দ্বারা ব্যক্তিচিত্তের প্রতিবিম্ব রচনা করেন। মহাপুরুষ ও মহীয়সী দেবীগণের পূর্ণমহিমা মর্ত্ত্যজগতের বৃত্তান্তসঙ্কলনের দ্বারা চরিতার্থ হয় না। এই বৃত্তান্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্তি, ইঙ্গিত ও ক্রিয়ার অভ্যন্তরে যে তাৎপর্য্য ও রহস্য বিদ্যমান, তাহার উদ্ভেদন করা কেবল মনীষার সাহায্যে সম্ভব হয় না। যিনি দিব্য অনুভূতির অধিকারী এবং দিব্য চরিত্রের অভ্যন্তরবর্ত্তী দিব্যভাবের সন্ধান পান তিনি কোন্ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং সে তাৎপর্য্যই বা কত গভীর ও গূঢ় তাহা উপলব্ধি করেন এবং উপযুক্ত বাগ্-বিভূতি লাভ করিয়া সামান্য অধিকারীর নিকট বোধ্য ও উপাদেয় করিয়া প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন। এই জীবনচরিত আমার উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিবে।

ভগবতীর দিব্যলীলার নানা বিবরণ শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ ও কাব্যের মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত লীলায় দেবী তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণা। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছেন ভক্তজনের লোচনবৃন্দের অন্তরালে। দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর অবতরণের কথা নানাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দেবীর স্বয়ং শ্রীমুখের বাণী এই মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ পরম স্বস্ত্যয়ন, মহামারী সমুদ্ভূত অশেষ উপদ্রববিনাশকারী, এবং ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখসমূহের প্রশমন ইহার সদ্যোলব্ধ ফল। ঋষি স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,"তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥" মহারাজ সুরথ শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত স্বীয় রাজ্যের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন। সে কামনা দেবীর বরে অনায়াসে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পর ভগবান্ বিবস্বানের পুত্ররূপে বৈবস্বত মনু নামে জগতে প্রখ্যাত হইবেন। তাঁহার অভিলষিত বরের অধিক ঐশ্বর্য্য দেবী তাঁহাকে দান করিলেন। ইহাই অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম। অল্প চাহিলেও তাহা অতিরিক্ত

ইষ্টলাভেরই হেতু হয়। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়, পুনঃপুনঃ ব্যয় ও উৎসর্গের মধ্যেও তাহা পরিপূর্ণ থাকে—শ্রুতি যাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়. পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ইহা ভিতরেও পূর্ণ, বাহিরেও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পরিপূর্ণের নির্গম। অথচ পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। লৌকিক মানদণ্ডের দ্বারা ইহার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব। অনন্তের স্বরূপই ইহাই। একজন য়ুরোপীয় গাণিতিক অনন্তের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "The infinite is that of which every part is infinite." তাহাই অনন্ত যাহার প্রত্যেক অংশই অনন্ত। কথাটি প্রহেলিকা নহে। তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে। এক একটি অঙ্ক ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় অনন্ত পর্য্যন্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক সংখ্যারই বিভাগ করিতে পারা যায় $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ প্রভৃতি অনন্ত সংখ্যায়। অনন্ত সংখ্যার অংশভূত এক একটি সংখ্যাও অনন্ত। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাহায্যে এইরূপ এক একটি তত্ত্বে আমরা উপনীত হইয়া থাকি যাহা জগতের চরম ও পরম তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত যাহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এইরূপ সত্যের অস্পষ্ট অনুভূতির সন্ধান দেয়। কিন্তু ইহার অনাবৃত স্বরূপ পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে। এই তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়রূপে নানা সাধনার অবতারণা হইয়াছে ভারতভূমিতে এবং তাহার বাহিরেও। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রপঞ্চ-সহকারে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ এবং পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী গীতার বাক্য ও পদসমূহের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, সমস্ত সাধনার চরম পরিণতি ঘটে তত্ত্বজ্ঞানে। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে," "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগে উপনীত করে সাধকের সাধনা।

এই দুষ্ট কলিযুগে অর্থকাম সাধনায় নিরত মানববৃন্দের প্রকৃষ্ট ও সুখসাধ্য মার্গ ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগের সাধন ও পরিপোষণ হয় অবতারগণের

লীলা শ্রবণে ও চিন্তনে। যাহারা শমদমাদি সাধনসম্পদের বহুদূরে অবস্থিত, তাহাদেরও ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে কেবল ভক্তির সাহায্যে। ভগবান বলিয়াছেন যে, অতি দুরাচার ব্যক্তিও ভগবদ্ ভজনার দ্বারা শ্রেয়োমার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীজননী সারদেশ্বরীর এই জীবন-চরিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা অনুশীলিত হইলে মানবের শ্রেয়োলাভের পন্থা নিষ্কণ্টক হইবে। ঐহিক ভোগ, পারত্রিক স্বর্গ এবং পরিণামে অপবর্গ আরাধিতা হইয়া দেবী প্রসন্নচিত্তে দান করেন—ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং সিদ্ধ, ঋষি এবং আচার্য্যগণের পুনঃপুনঃ অনুভবের দ্বারা সুপরীক্ষিত। অবিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। শাস্ত্রবাক্যানুসারে এবং তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট সাধনমার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ বিফল মনোরথ হন নাই। বিনা পরীক্ষায় এই নিঃশ্রেয়স লাভের প্রশস্তরাজমার্গ অনঙ্গীকার করা অন্ধতার পরিচায়ক এবং হেতু।

রাগদ্বেষকলুষিতচিত্ত মাদৃশ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার নিমিত্তমাত্রই হইয়া থাকে। তথাপি শাস্ত্রবাক্যের যৌক্তিক অনুশীলনের দ্বারা যাহা বোধপদবীতে আরূঢ় হইয়াছে, তাহারই আভাসমাত্র প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলাম। অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন সংসারী জীবের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের প্রচেষ্টা বা উপদেশ একদেশদর্শিতাদোষেই দুষ্ট নহে, তাহা অনেক সময় বিপরীত বুদ্ধির সৃষ্টি করে। ঈদৃশ ন্যূনতা সম্বন্ধে আমি সচেতন থাকিতে চেষ্টা করি। মনুষ্যমাত্রেরই ভগবত্তত্ত্ব যাহা সমস্ত অবান্তর তত্ত্বসমূহকে স্বস্বরূপে বিধৃত করিয়া থাকে, সেই তত্ত্বের জিজ্ঞাসা স্বল্প বা অধিক মাত্রায় উদিত হয়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন তিনি যিনি তদ্‌গতচিত্ত এবং তদ্‌গত-প্রাণ। যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও উপপাদন দ্বারা স্বীয় জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট হন সেই পণ্ডিতসমাজের মধ্যে আমি একজন অতি নিম্নশ্রেণীর অধিকার-লিপ্সু। যৌক্তিক বুদ্ধিতে আমার চিত্তে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রণাম মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহারই

মীমাংসাসম্মত রীতিতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। মন্ত্রটি সুবিদিত তাহা এই—"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥" যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপক, যিনি স্বয়ং সর্ব্বধর্ম্মের স্বরূপ এবং যিনি অবতারবরিষ্ঠ সেই রামকৃষ্ণ তুমি, তোমাকে নমস্কার। ধর্ম্মের অননুভূতপূর্ব্ব গ্লানির মুহূর্ত্তে ভগবান্ রামকৃষ্ণের ধর্ম্মস্থাপনের কথা বিশেষ যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করার প্রয়োজন নাই। যখন ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে তাহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুবংশোদ্ভূত বিদ্যার্থিবৃন্দ কেবল কুসংস্কার ও অজ্ঞানের পরিচয়-মাত্র পাইত এবং নিজেদের জন্ম ও সংস্কারকে ধিক্কার দিয়া বিজেতা রাজপুরুষগণের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বরণ করিতে গৌরব বোধ করিত, যখন হিন্দুধর্ম্ম কেবল পৌত্তলিকতার আড়ম্বরমাত্র বলিয়া গৃহীত হইত এবং এই ধর্ম্মের সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই—এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছিল, তখন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতস্বরূপ আবরণমুক্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। সাকার ও নিরাকার উপাসনার বিবাদ চিরতরে প্রশমিত হইয়াছিল যাঁহার অনাড়ম্বর, অতি সহজ, অতি সরল ধর্ম্ম-প্রবচন ও লীলার মধ্যে, তিনি যে ধর্ম্মের সংস্থাপক তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বাক্য ও যুক্তির দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা পুনরুক্তি দোষে কলঙ্কিত হইবেই।

এখন 'সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে' এই দ্বিতীয় বিশেষণের আলোচনা করা যাক্। তৎকালপ্রবৃত্ত নানা ধর্ম্ম সাধনার অনুবর্ত্তন করিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেখিলেন এবং দেখাইলেন যে একই ঈশ্বরতত্ত্বে সকলেরই পরিসমাপ্তি। তিনি প্রমাণ করিলেন এই জগতের মূলতত্ত্ব ও বিধর্ত্তা এক পরমেশ্বর। নানা নামে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে, নানা অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে সকলেই তাঁহারই উপাসনা করে। এই সত্যের ঘোষণা অপৌরুষেয় ঋগ্বেদে আমরা পাইয়াছিলাম। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই—এই তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন ভারতবর্ষের ঋষি ও আচার্য্যগণ, ইহারই স্থূল ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ ও অভিব্যক্তি অবতারগণের লীলায় এবং অতিসাধারণ অতিহীন

হিন্দুধর্মাবলম্বীও প্রাণে প্রাণে ইহা বিশ্বাস করে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—সমস্ত কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত, যেমন অগ্নি ধূমের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, অতএব পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান উপাসনাপদ্ধতির পরিত্যাগ নিষ্প্রয়োজন মাত্র নহে—তাহা অকল্যাণেরই হেতু। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী পাশ্চাত্যশিক্ষাদুর্ব্বিদগ্ধ দুরভিমানী হিন্দুসন্তান বিস্মৃত হইয়া যখন অকল্যাণের মার্গে বহ্নিলুব্ধ শলভের ন্যায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইয়া দিলেন যে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বিশ্বাসে বা সাধনায় লজ্জা বা হীনতাবোধের কোন কারণ নাই। প্রত্যুত তিনি প্রমাণিত করিলেন যে, একমাত্র ঋষিগণের দ্বারা প্রচারিত এবং ভগবতী শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত যে ধর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা ছলে বলে কৌশলে পাশবিক নিগ্রহ ও উৎপীড়নের দ্বারা কিংবা ভোগবাসনা উদ্দীপিত করিয়া অর্থ ও পদমর্য্যাদার প্রলোভন দ্বারা ঋষিদিগের বংশধরগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রণোদিত করিতেছিল—তাহাদের ধর্ম্ম কেবলমাত্র পরধর্ম্ম নহে, তাহা উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরধর্ম্ম যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা সদ্যঃ পাইয়াছি। অবতার ঋষিগণের চরণরজঃ ধারণ করিয়া ভারতভূমি যে অখণ্ড সত্তায় অনাদি কাল হইতে বিরাজমান ছিল তাহা আজ পরধর্ম্মের প্রচারের ফলে এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের পরিণামস্বরূপ দ্বিধাবিভক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভারতবসুন্ধরার দক্ষিণ ও বাম হস্ত আজ ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণহরণ, সম্পদ্‌লুণ্ঠন, নারীর ধর্ষণ যে ধর্ম্মের অনুশাসনের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা যে ভয়াবহ ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুপূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরধর্ম্মের কবল হইতে আর্য্যধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" ভারতবাসী আর্যধর্ম্মানুবর্ত্তী মানবতার নিকট ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি কখনও অপালিত হয় নাই। ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটের দিনে তাই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল

শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। ধর্ম্মের স্বরূপ একটি কথায় তিনি ব্যক্ত করিলেন—কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ। হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য পরনারীতে মাতৃত্ববোধে এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ যিনি তাঁহার উপাসনায়। যাঁহারা বাহতঃ একেশ্বরবাদী অথচ অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের উপাস্য ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করেন তাঁহারাই বস্তুতঃ বহু ঈশ্বরবাদী। তাঁহাদের ঈশ্বর কোন জাতিবিশেষের প্রতিভূ। অন্যজাতির ধ্বংসসাধনই সেই ঈশ্বরের আরাধনার প্রকৃষ্টতম মার্গ। হিন্দু বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এক এবং যে কোন ভাষায়, পদ্ধতি বা অনুষ্ঠানে তাঁহার উপাসনা হউক, তাহা যদি ঐকান্তিক ভক্তি ও আস্তিক্যবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে তাহা একই ঈশ্বরের চরণে উপস্থিত হইবে। সেইজন্য হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টানের ধর্ম্মোপাসনায় বাধা সৃষ্টি করে না। ইহা দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি নহে। প্রবলপরাক্রম ম্লেচ্ছনিধনকারী মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর সাম্রাজ্যে মুসলমান ও খৃষ্টানের ধর্ম্মানুষ্ঠান অব্যাহতই ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যে মুসলমান বা খৃষ্টানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার কারণ হিন্দুর এই একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। যাহারই পূজা হউক, যেই বা পূজা করুক, তাহা পরমেশ্বরেরই পূজা এবং এই পরমেশ্বর এক বই দ্বিতীয় নয়। বর্ত্তমানে হিন্দুবংশধরগণ এই তত্ত্ব প্রণিধান করিলে স্বজাতিকে বীর্য্যবান, শক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ রামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপতার ব্যাখ্যা করা হইল।

এখন তৃতীয় বিশেষণের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অবতারবরিষ্ঠায়। ভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ। ইহা কি স্তুতি (Flattery) না ভূতার্থবাদ (Statement of Truth)? যাহাতে যে গুণ নাই সেই গুণের আরোপ করার নাম স্তুতি। ভূতার্থ বা সত্যার্থকথনের নাম ভূতার্থবাদ। কালিদাসের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই যে ইহা "ভূতার্থব্যাহৃতি সাহি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ।" ইহা পরমপুরুষের স্তুতি নহে—ইহা ভূতার্থব্যাহৃতি। ইহা সত্যের যথার্থস্বরূপের প্রতিপাদক। মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন—"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি"—ক্রান্তদর্শী আর্ষজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বচন অসত্য হইতে পারে না এবং তাহা নিরর্থকও নয়। অর্বাগ্দর্শিগণ অর্থানুসন্ধান করিয়া

শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্তু লোকোত্তরপ্রভাবশালী মহানুভব পুরুষগণের উক্তি এইরূপ নহে। অর্থই তাঁহাদের বাক্যের অনুসরণ করিয়া থাকে। আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানানুসারে এই বিশেষণের সার্থকতা বিচার করিতেছি। ভগবান্ রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বঅবতারগণের অপেক্ষায় বরিষ্ঠ। এই বিশেষণের দ্বারা কি পূর্ব্ব অবতারগণের মহিমা খর্ব্ব করা হইয়াছে? আমাদের মনে হয়, না। এই অবতারে ভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিগূহিত করিয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য ঈশ্বর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ। সেখানেও কোন ঐশ্বর্য্য তাঁহার প্রেমঘন স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে নাই। বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্য ভগবৎস্বরূপকে প্রচ্ছাদিতই করে, অভিব্যক্ত করে না। ভগবানের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিভূতি ও বিশুদ্ধি রামকৃষ্ণাবতারে সুপ্রকটিত। সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থতা তাঁহার লীলার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ফল যে অম্লান ও অম্লান সচ্চিদানন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও অধিগম তাহা সন্দেহাতীতরূপে সাংশয়িকের নিকটও প্রতিভাত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সাংশয়িক আবর্ত্তনের নিরসন তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। এই আধ্যাত্মিক নির্ম্মলতা প্রাকৃতজনের অধিগম্য নহে। তাহা না হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ভাগবতী-শক্তির ও বিশুদ্ধির পূর্ণ অভিব্যক্তি বিষয়ে তাহাদেরও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ভগবান রামকৃষ্ণ অতি পূত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনয়ন, দারগ্রহণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতীত এই সন্ন্যাস আশ্রম। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে উপস্থিত হইলেন তাঁহার নিকট তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী। দর্শনমাত্রে তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। বলিলেন—"আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহা গৃহস্থধর্ম্ম পালনের অনুপযুক্ত। তুমি যদি আদেশ কর বা অনুরোধ কর—আমাকে এই লোকোত্তর মার্গ পরিত্যাগ করিয়া গৃহীর জীবন গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহা সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ। কিন্তু দেখা গেল সত্যই শ্রীশ্রীসারদা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিনী। তিনি তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের সহায়িকাই হইলেন। প্রার্থনা করিলেন সমীপে অবস্থান মাত্র। ভগবান্ মহাদেব ও

পার্ব্বতীর অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্য সম্বন্ধের বিবরণ পুরাণাদিতে উপলব্ধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার স্বরূপ প্রাকৃত মনুষ্যের কল্পনাদ্বারা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপাদিত হয় নাই। যাঁহারা জ্ঞানী, রাজহংসের ন্যায় যাঁহারা নীর ও ক্ষীর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাই এই তত্ত্ব ও রহস্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলায় সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যাশ্রমের যে অচিন্তিতপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায় তাহা উভয় আশ্রমকেই বরণীয় করিয়াছে। রামাবতারে ভগবতী সীতার বিরহদুঃখ এবং চৈতন্য অবতারে ভগবতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অবজ্ঞাত ও ধিক্কৃত দাম্পত্যাধিকার পুনরায় স্বমহিমায় ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবনে। পূর্ব্ব লীলায় যে ন্যূনতা ও অসমঞ্জসতা লোক-দৃষ্টিতে অপরিহরণীয় ছিল তাহা পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য লাভ করিল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবন লীলায়। তাহার উপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে পিতা, মাতা, ভ্রাতার অধিকার হয়ত সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের কল্যাণমার্গ অবারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্মের সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিরোধ ও ব্যবধান তাহার দ্বারা তীব্রভাবেই প্রকটিত হইল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় এই ব্যবধান ও বিরোধ বিদূরিত হইল। সন্ন্যাসী কিরূপে গৃহী হইতে পারে এবং গৃহী সন্ন্যাসী হইতে পারে তাহার পরিচয় আমরা হরপার্ব্বতীর বৃত্তান্তে পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার উজ্জলতম, বিশুদ্ধতম, অনবদ্যতম, অম্লান ও অমলিন শত ভাস্করের তেজঃপুঞ্জ-প্রভাস্বর প্রকটরূপে এই প্রথম ভারতবর্ষের ভূমিতে প্রকাশিত হইল। এই অভূতপূর্ব্ব ও অচিন্তিতপূর্ব্ব অধ্যাত্মবিভূতির অখণ্ড অভিব্যক্তি তাঁহার অবতার-বরিষ্ঠত্বের অবিসংবাদিত প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদিগের বাক্যের অনুধাবন করেন অর্থ। ইহা যে সার্থক তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। ইহা কিন্তু তাহার একটি দিক্। অপর দিক্‌টির সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপনের অঙ্গরূপে অপরিহরণীয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে আমরা দেখি অন্যরূপ। দুষ্কর্ম্মকারী ও ধর্ম্মসংস্থাপনের বিরোধী যাঁহারা ছিলেন,

তাঁহাদিগকে তিনি জয় করিলেন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে। সাকার উপাসনার সমর্থক এই লোকোত্তর পুরুষপ্রবরের মিত্র ও ভক্ত হইলেন নিরাকার উপাসনার জয়গানকারী ব্রাহ্মগণ। স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, যিনি বাগ্মিতার অপূর্ব্ব কৌশল ও শক্তির দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাকার উপাসনায় বিমুখ ও নিরাকার উপাসনায় উদ্যুক্ত ও অনুরক্ত করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন তাঁহার পরম মিত্র, সুহৃদ, ভক্ত ও প্রথম মাহাত্ম্য-প্রচারক। খৃষ্টভক্তগণ যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও আত্মসমর্পণ করিলেন। এই অবতারের বৈশিষ্ট্য বাহ্য ঐশ্বর্য্য প্রকটনে নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্নিবার আত্মপ্রকাশে। বিরোধিগণের চিত্ত তিনি জয় করিলেন। এই চিত্তজয়ের পুনঃপুনঃ অপূর্ব্ব সঙ্ঘটনের দ্বারা ভগবান্ রামকৃষ্ণ স্বীয় অবতারণার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত করিলেন অতি প্রত্যক্ষ ও স্থূলভূমিতে। ঈদৃশ অবতার যে সর্ব্বাবতারবরিষ্ঠ তাহা লোকচক্ষুর অগোচর রহিল না।

ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রকটলীলার অবসানের পর তাঁহার আরব্ধকার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীমাতার লীলার অনুবৃত্তি চলিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের পরিপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয় এই লীলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুধ্যানে। শ্রবণ-মঙ্গল ও হৃৎকর্ণ-রসায়ন এই জীবনবৃত্ত আলোচনা করিয়া আমাদের ন্যায় সংসারাসক্তজীবও শ্রেয়োমার্গের সন্ধান লাভ করিবে। ঈদৃশ পুণ্যাবদানের আখ্যান ও ব্যাখ্যানের দ্বারা গ্রন্থরচয়িত্রী আমাদের সকলের নমস্যা ও পূজনীয়া হইলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা এই সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী ধৃতব্রতা গ্রন্থরচয়িত্রীকে এইরূপ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া যেন তিনি মানবগণের কল্যাণমার্গ উন্মুক্ত করেন। অনেক অফল কথা হয়ত বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে আমার অপরাধও বাড়িয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ও পাঠকবৃন্দের উপেক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়।



শ্রীশ্রীমা

জননী সারদেশ্বরী

ধ্যানময়ী রাত্রি······উপরে জ্যোতি উচ্ছলা শান্তনীলা অনন্ত আকাশ অসীমা নীচে চন্দ্রকিরণ স্নাতা শুভ্র সমুজ্জ্বলা জাহ্নবী—যেন গলিত হীরকের উছলিত বন্যা—আর তার কূলে অকূল স্তব্ধতা নিয়ে বিরাজমান সারা বিশ্বের যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বর—মৌন শান্ত সমাহিত। স্মৃতির কল্পলোকে দৃষ্টি যায় হারিয়ে। দেখা যায় সেই চন্দ্রোচ্ছলা জাহ্নবীর কূলে উপবিষ্টা এক মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি, যেন হিমগিরি দুহিতা—তুষার শুভ্র হিমরাজ যেন তাঁর অঙ্গের বিন্দু বিন্দু তুষার কণিকা তুলে দিয়েছেন এই দেবীর শ্রীঅঙ্গে, এমনি সে অঙ্গের জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তি, এমনি সে নির্ম্মল শুভ্র রূপমাধুরী। অঙ্গের শুভ্র অঞ্চল বায়ুহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত······ ভালে, সীমন্তে—সতীত্বের নবারুণ রেখা, শ্রীকরযুক্ত, করুণা বিগলিত অরুণায়িত দৃষ্টি দূর নভোমণ্ডলে স্থিরবদ্ধ। বিশ্বের সমস্ত আকুতি, সমস্ত মিনতি যেন তাঁর অন্তর মথিত করে তুলেছে—ঐ চাঁদের মাঝেও আছে কলঙ্ক, কিন্তু আমার মাঝে যেন সেটুকুও না থাকে, আমায় নিখাদ করো। এই নীরব প্রার্থনার লীলায় চলে উপরের অনন্তের সঙ্গে মাটীর অনন্তের নিত্য মিলন।

কি আশ্চর্য্য বিশ্বের যত শুভ্রতা যত পবিত্রতা খুঁজে ফেরে যাঁর চরণ আশ্রয়, তাঁর অন্তরের এই প্রার্থনা এ যেন আঁধার ধরণীর আঁধার কালিমা নিঃশেষে মুছে দিতে। কালো ছেলের মু[illegible]লোর হাসি ফুটিয়ে তুলতে জননীর গভীর ব্যাকুলতা……

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর—চির পিপাসিত চাতকীর মত তপ্ত ধরণী চেয়ে আছে উর্দ্ধগগন মুখে—কখন নেমে আসবে নন্দনের অলকানন্দা—মাটীর মর্ত্তে ফুটিয়ে তুলতে নন্দনের পারিজাত—ধরিত্রীর [illegible]ন্দ্রামথিত ক্রন্দন কেউ কি সেদিন শোনেনি কান পেতে, কিন্তু সত্যই সেদিন দেখা দিল যে নবীন আশার সম্ভাবনা, গ্রীষ্মতপ্ত গগনে নবীন মেঘভারের মত কেউ না রাখলেও ভারত তার প্রাণের ইতিহাসের স্বর্ণপাতায় অন্বিত ক'রে সে দিব্য অভ্যুদয়……

বিল্ববৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান পীড়িতা শ্যামাসুন্দরী—সারদা জননী শ্যামা সুন্দরী। সহসা নয়ন সম্মুখে তাঁর ফুটে উঠল এক অভূতপূর্ব্ব দি[illegible]র্শন—বিল্ববৃক্ষ শাখা[illegible] দোলন লীলায় মগ্ন ছোট্ট একটী কোমল [illegible]লিকা—যেন শ্যামশাখার বৃন্তে শুভ্র সুন্দর একটি যুথিকা। সহসা বৃন্তচ্যুত ফুলের মতই বালিকা [illegible] পড়ল ধরণীর ধূলায়—শুভ্র মৃণাল বাহু বন্ধনে জড়িয়ে ধরল শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠ—সেই দিব্যস্পর্শে আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল মা'র সারা দেহমন……মনে হল কি যেন তাঁর অঙ্গে প্রবেশ করল, সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেল সমস্ত চেতনা…

জননী সারদেশ্বরী

স্মৃতির তীর্থে আবার ভেসে ওঠে আর একটী দিব্যদর্শন—সেদিনও ছিল রৌদ্রকরোজ্জল দ্বিপ্রহর, যেন শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক, আর দহনে জ্বলে যাওয়া ধরণীর শুষ্ক হৃদয়। অভাবে পরিপূর্ণ পর্ণকুটীরে ক্লান্ত অবসন্ন শ্রীরামচন্দ্র—সারদা জনক শ্রীরামচন্দ্র শায়িত। ধীরে ধীরে গভীর চিন্তায় শ্রান্ত নয়ন পল্লবে ঘনিয়ে আসে শ্রান্তিহরা নিদ্রা, স্নেহময়ী জননীর মত—অভাবের জগৎ যায় মুছে—স্বপ্নের দুয়ার খুলে দেখা দেয় ভাবের জগৎ। রামচন্দ্র দেখেন, হেমনিন্দিত কান্তি একটী দিব্য কুমারী বালিকা, মৃণালভুজ বন্ধনে বেঁধেছে তাঁর কণ্ঠদেশ। বালিকার অপরূপ রূপ লাবণ্য—অঙ্গের বহুমূল্য আভরণে বিদ্যুৎদ্যুতি—শ্রীরামচন্দ্রের মনে জাগিয়ে তোলে অপার বিস্ময়...... বলে ওঠেন "কে মা তুমি?" উত্তর আসে বীণানিন্দিত কণ্ঠে "এই তোমার কাছেই এলুম"—পুলক কণ্টকিত হ'য়ে উঠে তাঁর সারা অঙ্গ—ঘুম যায় ভেঙ্গে, স্বপ্নের দুয়ার যায় রুদ্ধ হ'য়ে—অভিভূত রামচন্দ্র ভাবেন তবে কি কমলার কমলচরণ পড়ল দরিদ্রের পর্ণকুটীরে?

সারদা জনক শ্রীরামচন্দ্র, সারদা জননী শ্যামাসুন্দরী—ভক্তিনিষ্ঠায়, ক্ষমাসরলতায়, পরোপকারিতায়, উদারতায় আদর্শ দেবদম্পতি। জননী সারদার শ্রীমুখ নিসৃতঃ বাণীই তার প্রমাণ "আমার বাবা পরম ভক্ত ছিলেন, পরোপকারী; বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন নৈষ্ঠিক। মার কত দয়া ছিল লোকদের কত খাওয়াতেন। কত সরল!"

আমোদর নদীর কূল ঘেসে জেগে উঠেছে যে ছায়া নিবিড় গ্রামখানি, বাঁকুড়ার দক্ষিণপূর্ব্বে, সেই পল্লীলক্ষ্মীর আবাহন গেহ—জয়রামবাটীর এঁরা আদিম অধিবাসী ; বিষ্ণুপুরের রাজবংশের দলিলে আছে তার বহু প্রমাণ। দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি কতবার দেখা দিয়েছে এই বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, উজাড় হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম, কিন্তু জয়রামবাটীর বক্ষে যেন তার চির পরাজয়। শস্য শ্যামলতায় গ্রামখানি ছিল পরিপূর্ণ,—কৃষকের মুখে ছিল হাসি, সুগঠিত দেহে ছিল অক্লান্ত কর্ম্মপ্রেরণা—গ্রীষ্মের প্রখরতায় যখন দিকে দিকে দেখা দিত জলাভাব —ক্ষুদ্র আমোদরের নীল অঞ্জলিখানি ভ'রে তখনও টলমল করত স্বচ্ছগভীর বারিরাশি। কল্পনায় ভেসে ওঠে বাংলার পুরাতন পল্লীচিত্র —যান্ত্রিক সভ্যতার রুক্ষতা যেখানে মানবহৃদয়কে পাযাণ ক'রে তুলতে পারে নাই—বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক আলো যেখানে মাটীর প্রদীপকে দেয় নাই ম্লান ক'রে, নির্ম্মল আকাশে যেখানে জমে ওঠে নাই বাষ্পমলিন ধূমরাশি—সেই শান্তমধুর কুহু মুখরিত পল্লীভূমী। ছিল অভাব,— ছিল দুঃখ বেদনা, তবু ছিল শান্তি—সুনিবিড় শান্তি। ছিল মাধুর্য্য আর ছিল সরলতায় পরিপূর্ণ দরদী হৃদয়—তাই দেখি দরিদ্র রামচন্দ্রের পর্ণকুটীর, সে যেন অন্ন-পূর্ণার অন্ন-ভাণ্ডার—নিত্য অতিথি নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণের সেবাউপচারে পরিপূর্ণ। হৃদয়ের প্রসারতা যেখানে আকাশের মত উজ্জ্বল, উদার—অভাবের অন্ধকার সেখানে ঘনিয়ে থাকলেও সে হৃদয়, ছড়িয়ে দেবেই কল্যাণ আনন্দের আলো। সেই তার

স্বধর্ম্ম। তাই শ্রীরামচন্দ্রের সংসার যাত্রায় স্বচ্ছলতার অভাব থাকলেও সেই উদার হৃদয় দেবমানব ছিলেন সকলের মাননীয়, সকলের পূজনীয় চিরপ্রণম্য। এমনি হিমালয়ের মত উদার বক্ষ ছাড়া হিমগিরি দুহিতা কেমন করে আসবেন নেমে? আর সরলা কোমলা অথচ দৃঢ়চিত্তসম্পন্না শ্যামাসুন্দরী গৃহলক্ষ্মীর মতই সুনিপুণ হাতে অভাবের সংসারে ফুটিয়ে তুলেছেন লক্ষ্মীশ্রী। বিদুরের ক্ষুদকুঁড়ায় রন্ধন করেছেন দেবভোগ্য পরমান্ন, ধুলার বুকে এঁকেছেন লক্ষ্মীর আলপনা। যে কেউ এসেছে তাঁর ধুলার মন্দিরে, সেই পেয়েছে তাঁর যত্ন, তাঁর প্রীতি-পূর্ণ অন্তরের স্পর্শ। তাই তো তাঁর বুকে এসেছিলেন অলকার স্বর্ণ প্রতিমা।

মাত্র কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমি। যাজনকর্ম্ম আর তূলার ক্ষেত—এইতো ছিল সম্বল। স্বল্পে সন্তুষ্ট শ্রীরামচন্দ্র ফেরেন ঘরে ঘরে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের কাজ নিয়ে—আর তূলার ক্ষেত থেকে তূলা সংগ্রহ ক'রে পৈতা কাটেন শ্যামাসুন্দরী নিজে—আর তা'হতেই—নির্ব্বাহ হয় অন্নপূর্ণার সংসার—শান্তির সংসার······

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—হিমেলার কুয়াসাচ্ছন্ন প্রকৃতির মতই সংস্কারের তমসায় আচ্ছন্ন, অন্ধ সোনার বাংলার স্বর্ণকান্তি। সমগ্র বিশ্বের মধ্যমণি যেন এই ভারতভূমি—আর তার কন্যাতুল্যা এই বাংলাদেশ··· তাই যেখানে উঠেছে যত ঢেউ, সে ঢেউ এসে আঘাত করেছে ভারত

তথা বাংলার প্রাণতটে—সে ঢেউ কখনও এনে দিয়েছে সম্পদ, কখনও ভেঙে দিয়েছে তার কূল, জর্জ্জরিত করেছে তার সমগ্র সত্তাকে। দিয়েছে অল্পই—নিয়ে গেছে বেশী······কিন্তু এই আঘাতের পরিবর্ত্তে দেবভূমি ভারত যে অমূল্যরত্ন লাভ করেছে—যুগে যুগে বার বার, তার কি তুলনা আছে? সেই লাভই তার আঘাতের চরম মূল্যস্বরূপ হয়ে রয়েছে, সেই পরমধনে ধনী হয়ে সে হয়েছে বিশ্বের বরণীয়। তাই ভারত, সোনার ভারত। এক একটী অমূল্যরত্নে সে সমগ্র বিশ্বকে করেছে উজ্জ্বল—অন্তরের অমৃতধারায় করেছে অমৃতায়িত অবতার অন্ধকারেরই দান।

আবার এল অন্ধকার—যে আঁধার, আকুলআহ্বান জানালো আলোর দিশারীকে। কিন্তু এবার শুধু বাংলা, শুধু ভারত নয়—সমগ্র বিশ্বজুড়ে ঘটল এক অভাবনীয় প্রচণ্ড সংঘর্ষের অভ্যুদয়—দিকে দিকে ঘনায়মান হয়ে উঠল অন্ধকার—আর তাই হ'ল মহান অভ্যুদয়ের পরম মুহূর্ত্ত।

নেমে এলেন নারায়ণ—আবির্ভূতা হলেন নারায়ণী······যুগে যুগে যেমন এসেছেন, ঠিক তেমনি করেই এলেন সৃষ্টির আদিশক্তি—পুরুষোত্তমের লীলাসঙ্গিনী, কিন্তু—এবার যেন বিশ্বের কল্যাণে কল্যাণময়ী ধরলেন একটী স্বতন্ত্ররূপ, বিশ্বের মাঝে করে নিলেন স্বতন্ত্র আসন, যা চির মহিয়ান চির গরীয়ান! যেন মাটীর বুকে পাতা হল নীলিমার আসন, না ধরার ধুলায় থেকেও চির অধরা!

এবার যেন বিশ্বজননীর শুভ আগমন—পদদলিত, লাঞ্ছিতা, মাতৃজাতিকে তুলে ধরতে, তাকে মাতৃত্বের গৌরব আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে, তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে। পথহারা সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে আপন ঘরে আর জগতের বুকে মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে, যার অস্ফুটকলধ্বনি এই নারী জাগরণের যুগ, আর যার চাক্ষুষ প্রমাণ

ভোগক্ষেত্র বিলাসভূমি কলকতার বুকে জগজ্জননীর নামাঙ্কিত মাতৃমন্দির —শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—তার প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ—সারদারই মানস কন্যা—শিখাময়ী গৌরী মা—।

মরুর বক্ষ প্লাবিত করে যদি সহসা নেমে আসে হিমালয়ের তুষারগলিত অলকানন্দা—অমাস্পন্দিত বুকে যদি সহসা জেগে ওঠে পূর্ণিমার উচ্ছাস—আর অনেক দিনের মা-হারা শিশুর ঘুমন্ত আঁখি যদি গভীর রাতে ফিরে পায় মায়ের চুম্বন স্পন্দন তখন জেগে ওঠে যে বিস্ময়, যে পুলকের গভীর অনুভূতি, তার রূপ ভাষার বন্ধনে ধরা যায় না। ঠিক সেই বিস্ময়, সেই পুলক জেগে উঠেছিল পৌষের এক স্তব্ধ সন্ধ্যায়... সেদিন ছিল বারশো যাট শতকের সৌর পৌষের অষ্টম দিবস—বৃহস্পতিবার অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা সপ্তমীর সন্ধ্যা। সেদিন ছিল না বসন্ত পবনে জেগে ওঠা মুখরিত কুহুর দল—চন্দ্রিম রাত্রির আলোয় ফোটা জুঁই, চামেলীর সৌরভ রাশি···সেদিন শুধু জেগেছিল এক বিরাট মৌনতা বিরাট স্তব্ধতা যা ধরার বেদনা আর অধরার শান্তির সুস্পষ্ট আভাযে ভরা। আর ছিল দিকচক্রবালে জমে ওঠা কুহেলীর জমাট বাঁধা অন্ধকার—আকাশের বুকে নিবাত, নিস্পন্দ, দীপ শিখা...মাঙ্গলিক দীপশিখার মতই উজ্জ্বল। আর ঘরে ঘরে বেজে উঠেছিল পৌষ লক্ষ্মীর আবাহন শঙ্খ···। অন্নহীন, সম্বলহীন ভারতবাসীর প্রাণের গভীর আকুতির প্রতিধ্বনি। ঠিক এমনি সময় ঘন তমসার সেই কুহেলীর জাল দুহাতে

অপসারিত করে আবির্ভূতা হলেন 'যুগের কল্যাণময়ী শক্তি...বিশ্বের আদিভূতা সনাতনী...। আর পল্লীবাসী আকুল শ্রবণে শুনল শ্যামাসুন্দরীর স্নেহনীড় থেকে ভেসে আসা সদ্যজাত শিশুর অস্ফুট কলকাঁদনী...। সেদিন কেউ কি জানত যে সে ক্রন্দন বিশ্বের যত মলিনতা, যত আবিলতা ধুইয়ে দেবার অশ্রুর ভাগীরথী...সেই মৌন সন্ধ্যার—দীপ শিখা কম্পিত আলো ছায়ার লীলাভূমি—শ্যামা গেহ—মুখর করে বেজে উঠল যে মঙ্গল শঙ্খ—সে শঙ্খ শুনেছিল শুধু গ্রামবাসী—কিন্তু ধরিত্রী আজ তারি প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে, ঘরে ঘরে কবে মুখরিত হয়ে উঠবে সেই মাঙ্গলিক ধ্বনি...সেদিন গগন দেউলে আর জননীর মাটীর দেউলে জ্বলেছিল যে মঙ্গল দীপ...বাংলার মেয়ের চোখে কবে জ্বলে উঠবে তারি কল্যাণময়ী শিখা...

ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলোর মত একটুকরো মেয়ে সারদা—জনক জননীর বড় আদরের নাম। রূপের সঙ্গে নামের হয় অপূর্ব্ব মিলন। কোষ্ঠীর বিচারে রাশ্যাশ্রিত নাম দেখা যায় ঠাকুরমণি—এখানেও নাম-রূপের অপূর্ব্ব সম্মিলন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে ভক্তের জপমালায় যে নাম থাকবে গাঁথা—সে নাম হওয়া চাই অপ্রাকৃত—যে নাম চির-চিরন্তন। জননীর হুটী নামই দেখি সেই অপ্রাকৃত নাম। একদিকে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান দায়িনী—জননী সারদা মূর্ত্তিমতী সরস্বতী...আর একদিকে মা আমার হরিবক্ষ বিলাসিনী...কমলা—তাই গুপ্ত নাম ঠাকুরমণি—।

সেই বৈকুণ্ঠ বাসিনী আজ নেমে এলেন এই মাটীর মর্ত্তে···ধরার ধূলায় তাই জেগে উঠল অলকার আনন্দ—অখ্যাতনামা জয়রামবাটী হল মুক্তির স্বর্ণকাশী···জননীর জন্মভূমি—যা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী, স্বর্গের চেয়েও মহীয়সী···। যা ছিল ধূলা তাই হয়ে গেল সোনা—তাই মর্ত্তের মানুষের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে অমর্ত্তের দেবতারাও চুম্বন করলেন—জননীর চরণ এই ধরণীর তীর্থরেণু রঞ্জিত—শুরু হল আনন্দ লীলা—মানুষের ঘরে দেবতার ঠাকুরালী···স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধায়—শ্যামাসুন্দরী আর শ্রীরামচন্দ্র গড়ে তোলেন তাঁদের আদরের দুলালীর শৈশব জীবন। নন্দন বনের পুষ্পের মত কোমল শিশির শুভ্র মুখকান্তি—দিব্য মাধুরীতে ভরা আয়ত দুটী আঁখি—তাতে টলটল করছে মাতৃশ্রী···দেখে জনক জননীর মন ভরে ওঠে শ্রদ্ধায় আর বাৎসল্যে···। ভাবেন কত কি—কিন্তু কন্যাকে চিনতে গিয়ে সে যেন হয়ে যায় আরও অচেনা, আরও অধরা···। পাড়া প্রতিবেশীর চিত্তও বুঝি অজ্ঞাতসারে জয় করে এই দিব্য বালিকা—সকলে যেন লক্ষ্য করে বিস্মিত চোখে তার দিব্য জীবনের গতি ভঙ্গী আচার ব্যবহার। জনক জননী ছাড়া বালিকা সারদার আর একটী হৃদয়ে স্নেহের দাবী ছিল বেশী। তিনি ছিলেন সারদার খুল্লতাত—নাম নীলমাধব—সংসারের লোহার শিকল তাঁকে বাঁধতে পারে নাই, চিরকুমার পরেছিলেন সোনার শিকলের বন্ধন··· বালিকা সারদার স্নেহের বন্ধন। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সঙ্গিনীকে। কোন আনন্দই তাঁর ছিল না, আনন্দ প্রতিমা সারদা ছাড়া। তাঁর জীবনের শেষদিনে তাই দেখি জননীর স্নেহ দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন জগজ্জননী······

সারদার পর আরও ছয়টী পুত্র কন্যার জননী হন শ্যামাসুন্দরী। কন্যা কাদম্বিনী আর পাঁচটী পুত্র—প্রসন্ন, উমেশ, কালী, বরদা ও অভয়।

কিন্তু সকলের মাঝে সারদাই যেন সবার আনন্দের ধন, জীবনের জীবন সন্ধ্যাকাশের অম্লান তারার মত সারা ঘরখানির বুকে সে যেন আনন্দ উজ্জ্বল রূপে জেগে থাকে।...গৃহের প্রতিটি কাজই তার কোমল শিশু হাতের স্পর্শে সুচারু সুন্দর···জননী শ্যামার স্বল্প সচ্ছল সংসারের কর্ম্মব্যস্ততাটুকু কন্যার সাহচর্য্যে মনে হয় যেন মধুর হ'তে মধুর। কোন গ্লানি, কোন দুঃখ যেন আর থাকে না। শূন্য হৃদয়ের তৃষিত পাত্র আনন্দের অমৃত রসে টল টল করে ওঠে।···

স্মৃতির মুকুরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুদূর অতীতের বুক আলো করা আর একটি দিব্য সংসারের লীলাচিত্র······শ্রীরামপ্রসাদের সংসার... একদিন যে সংসারের ভাঙা বেড়ার ধারে লীলা চঞ্চলা ক্ষণিকের জন্য এঁকে দিয়েছিলেন তাঁর দুটি কমল চরণ চিহ্ন।···সেই একক্ষণের পিতৃ সম্বোধনের কথা, সেই কন্যারূপে লীলার কথা জগৎ শুনলো শুধু সাধক কবির অমর গানের ভাষায়···এবার পেলো তার চাক্ষুষ প্রমাণ। সেই লীলার নিত্য মূর্ত্ত পুনরাভিনয়ে...আবার দেখল—সেই উমা মহেশ্বরী রাজরাজেশ্বরী, শ্রীরামচন্দ্র তনয়ারূপে মাটীর ঘরে জ্বালছেন সন্ধ্যাপ্রদীপ ...ছুটে যাচ্ছেন জননী শ্যামার রন্ধন কার্য্যের সাহায্য করতে...কচি দুটি হাতে যতটুকু কুলায় তাই করছেন দুহাত ভ'রে। ছোট্ট ছোট্ট ভাই-বোনদের নিয়ে আমোদরের বুকে যাচ্ছেন গঙ্গাস্নান করতে—যে গঙ্গাপ্রীতি ছিল তাঁর চিরদিনের 'বাই' বিশেষ।

দেখতে দেখতে শিশির চুম্বনে ফুটে ওঠা কুসুমের মত আর পরিবর্দ্ধমান চন্দ্রকলার মত পূর্ণরূপিণী জননী পঞ্চমবর্ষ পার হয়ে পদার্পণ করেন ষষ্ঠে। শুক্লা ষষ্ঠীর চাঁদ যেন পার হয়ে এল পঞ্চমীর সন্ধ্যা···। সেদিনের বাংলা, যেদিন ঘরে ঘরে ছিল গৌরীদানের প্রথা —পাঁচ থেকে আট বৎসরের মধ্যে বাংলার মেয়ে পেত জননীর স্নেহ অঞ্চলের ছায়া, তারপরই তাকে দুদিনের স্নেহনীড় ছেড়ে চলে যেতে হ'ত অপর একটি গৃহের গৃহলক্ষ্মী হয়ে। তবু তাদের চোখে জ্বলত যে সতীত্বের অমিত-তেজ, তবু তারা রেখে গেছে যে ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতার দীপ্তিপূর্ণ আদর্শ, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সে যেন সোনার বাংলার ভুলে যাওয়া সোনার স্বপ্ন।

নব-যুগের হৈমবতী শ্রীরামচন্দ্র দুহিতা সারদাগৌরীর এল সেই গৌরীদানের শুভলগ্ন। তাই ডাক পড়ল গৌরীনাথের······

কল্পনার রঙীন পাতায় জেগে ওঠে স্বপ্নের তুলি দিয়ে আঁকা আর একটি সোনার ছবি—। শিহড় গ্রামের একটি গানের আসর—। আসরে সমাসীন চন্দ্রাদুলাল শ্রীগদাধরসুন্দর—আমাদের মাণিক বনের সোনার কিশোর। রূপে অরূপ...তবুত' গোপন। কিন্তু রূপময়ী ধরিত্রীর সৌন্দর্য্য যে রূপসিন্ধুর একটি বিন্দু যার একটি হিল্লোলে আঁধার আকাশের বুকে জেগে ওঠে অনন্ত আলোর বিলাস, সেই রূপ যখন পুঞ্জিভূত হয়ে ধরা দেয় ধূলার মেলায়—তখন তাকে যত আবরণেই ঢাকা যাক না কেন সে যেন হয়ে ওঠে আরও অপরূপ। সেই

কাঞ্চননিন্দিত বরতনু মনে হয় যেন ধূলায় ঢাকা অম্লান তারা। আসর বসেছে ভাগিনেয় হৃদয়ের ঘরে। শ্যামাসুন্দরীর পিতৃগৃহ শিহড়ে। তাই তিনিও উপস্থিত হয়েছেন তাঁর আদরের দুলালী আনন্দনন্দিনী-টিকে নিয়ে। সঙ্গীত মুখরিত হয়ে উঠল আসর—ভাবসিন্ধু উথলিত অরুণায়িত দুটি আঁখি মেলে আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন শ্যামগদাধর। স্বেদপুলক কম্পিত অঙ্গ সে রূপের তুলনা দিতে মনে পড়ে বৈষ্ণব পদকর্ত্তার একটি গোরা-রূপ কীর্ত্তনের পদ

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।

সেই নয়ন মেঘের সিঞ্চনে সেদিন কি জেগে উঠেছিল সমবেতদের অন্তর কিশলয়…? কিন্তু সেই প্রেম সিঞ্চনে একটি হৃদয়ের করুণ কান্ত কিশলয়, যে আঁখি মেলে ছিল—চিনে নিয়েছিল অন্তরের অন্তরতমকে—একটু পরেই তা ধরা পড়ল।

সঙ্গীত সমাপনান্তে শ্যামার ক্রোড়স্থিত ছোট্ট শিশু কন্যাকে নিয়ে সকলে সুরু করল আনন্দ গুঞ্জন। "এইত' এত লোক রয়েছে বলত মা এর মধ্যে তুই কাকে বিয়ে করবি?" চিন্তার কোন প্রয়োজন হয় না। যুগে যুগের চিরচেনা—সে ত' সন্মুখেই…। বালিকা দুটি কচি রাঙা হাত তুলে সাগ্রহে শ্যামার ঝিয়ারী দেখায় শ্রীচন্দ্রানন্দনের দিকে। সেই একটি অঙ্গুলীর সঙ্কেতে যে কি গভীর সঙ্কেত লুকান ছিল! কেউ তখন বোঝেনি তার প্রকৃত রহস্য। শিশুর খেয়াল খেলার মতই হাসির হিল্লোলে ডুবে যায় সেই অপূর্ব্ব চিত্রখানি।

তখনকার মত সে কথা মুছে যায় সকলের মন থেকে। কিন্তু এর কয়েক বৎসর পর যখন ষষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকা সারদার গৌরীদানের শুভ কামনায় শ্রীরামচন্দ্র হয়ে পড়লেন বিশেষ চেষ্টিত; তখনই মিলল এর দিশা।

দক্ষিণেশ্বর……বাংলার কাশী কাঞ্চি…সর্ব্বতীর্থের সমন্বয় মূর্ত্তি—ধূলার বৈকুণ্ঠ সেই দক্ষিণেশ্বর। কলকল্লোলিনী জাহ্নবীর উপকূলে সে যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—ধ্রুব তারকা…। পথহারা অনুসন্ধিৎসু পথিকের পথের আলো। তখন সেখানে সুরু হয়েছে এক বিরাট তপস্যার লীলা—জ্বলে উঠেছে নিজের জীবন আহুতি দেওয়া সমন্বয়ের হোমশিখা…যে শিখা প্রজ্বলিত করেছেন বিশ্বের প্রাণ পুরুষ, যাঁর হোতা যুগদেবতা—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং…। যে শিখা আজ সব মতের সব পথের বুকে জ্বেলে দিয়েছে আলোক বর্ত্তিকা…। সেই গগনচুম্বী দেবায়তনের দিকে পিপাসিত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে সারাবিশ্বের মানব, বিশ্বের উর্দ্ধলোকের তৃষিত আত্মা…দেবলোকের দেববৃন্দ—জগতের ইতিহাসে এক বিরাট মহান কল্যাণময় পরিবর্ত্তনের আশায়।

তার সূচনার হয়েছে সুরু। সেদিন যুগ প্রয়োজনে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মহাভারত লেখা হয়েছিল অসির মুখে রক্ত লেখায়। আর আজ যুগের নবপরিস্থিতিতে রচনা হল শান্তির মহাভারতী…যুগ সারথীর জীবন বেদ…। এ যুগের পুরুষোত্তম নর্ম, লীলায় যে তপস্যা

যে সাধনা করলেন চোখের জলে আর ব্যাকুলতায়, সে তপস্যাপ্রসূতফল জগৎ বুঝছে—দিনে দিনে আরো বুঝবে।

সন্ধ্যার ঘন আঁধার যখন নেমে আসে ধরণীর বুকে, পাগলের মত ঠাকুর ওঠেন কেঁদে "মা,...মা...মাগো, একটা দিন যে চলে গেল মা, এখনও দেখা দিলিনি...নিথর নিবিড় রাত্রে একাকী বসে থাকেন ঝোপের মধ্যে গভীর সমাধি মগ্ন...। পঞ্চবটীর ধূলায় বরতনু লুটিয়ে দিয়ে কখন কাঁদেন...মাথা খুঁড়ে ডাকেন জগজ্জননীকে "মাগো—দেখা দে মা—দেখা দে..." মন্দিরে পূজা করতে করতে ব্যাকুলতা হয় যেন আরও গভীর। চোখের জলে পূজার আয়োজন কোথায় যায় ভেসে...কাঁদতে কাঁদতে নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় সমস্ত দেহ... কখন আরতি প্রদীপ হাতে মন্দির আলোকিত করে করছেন মার আরতি, অন্য হাতে গুরুভার ঘণ্টা...। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে, তবু শেষ হয় না সেই অনন্তের আরতি লীলা—। সম্বিত যায় হারিয়ে...আর সেই রক্তিম ঘর্ম্মাক্ত ভাবতনু হৃদয়ে ধারণ করে বাহিরে নিয়ে আসে ভাগিনেয় হৃদয়...। লোকে বলে ছোট ঠাকুর হয়েছে পাগল, তা না হলে মাটীর মূর্ত্তিকে কেউ জাগতে বলে।

ওদিকে গদাধরচন্দ্র বিনা আঁধার হয়ে থাকে কামারপুকুর, আঁধার হয়ে থাকে মাণিকরাজার বন—গদাধরের লীলা নিকেতন। সখাজন পথ চেয়ে থাকে—পথ চেয়ে থাকে সারা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা—কবে আসবে তাদের প্রাণের গদাই—হাস্যে—লাস্যে আনন্দলীলায়—জাগিয়ে তুলবে হারিয়ে যাওয়া ব্রজের আনন্দ। স্মৃতির কুঞ্জে কেঁদে ফেরে কানুহারা বৃন্দাবনের বিরহ বিধুর দিনগুলি...।

শূন্যঘরে পথ চেয়ে ভাবেন জননী চন্দ্রা—তার গদাধরের কুশল কামনা করেন ইষ্টদেবতা রঘুবীরের চরণে।

এমনি সময় দক্ষিণেশ্বর থেকে আসে সংবাদ—যে সংবাদ জননীর বুকে হানে গভীর শেলাঘাত। গদাধর হয়েছি নাকি উন্মাদ। বহুরূপে পল্লবিত হয়েই আসে সে খবর। ব্যাকুল হয়ে উঠেন জননী—এইত সেদিন নিজের হাতে সাজিয়ে জ্যেষ্ঠ রামকুমারের হাতে তুলে দিলেন তাঁর আনন্দনন্দনকে। সেই রামকুমারও চলে গেল, চিরদিনের মত তাঁর স্নেহ অঞ্চল ছিন্ন করে, আর আজ শেষের সম্বল, নয়নের মণি গদাধর—সে নাকি উন্মাদ হয়ে ফিরছে পথে পথে। মন যে আর মানে না—অশ্রুধারা হয় যেন বাঁধন হারা—চিরদিনের কান্না কাঁদেন জননী চন্দ্রা—যেমন কেঁদে ছিলেন মথুরার রথে তুলে দিতে প্রাণের গোপালকে···যেমন কেঁদেছিলেন নবদ্বীপের শোভনচন্দ্র যেদিন হয়েছিলেন অস্তমিত···।

ছুটে আসেন রামেশ্বর—ক্ষুদিরামের মধ্যম পুত্র। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন "তুমি ভেবনা মাগো, আমি যেমন করে পারি ফিরিয়ে আনব তোমার প্রাণের গদাইকে।" তখনকার মত শান্ত হয়ে জননী মোছেন অশ্রুবারি। রামেশ্বর যাত্রা করেন দক্ষিণেশ্বরের পথে...

শ্রীরামেশ্বরের সাথে ফিরে আসেন প্রভু গদাধর। বহুদিনের অদর্শনজনিত বেদনা জুড়াতে ছুটে আসে কামারপুকুরবাসী, মধুলোভী ভ্রমরের মত গদাধরের চরণ কমলের সৌরভে। দেখে কোথায় পাগল, এত সেই নিত্যানন্দময়—চিরমনোহর, তাদের সোনার গদাই···। আবার সুরু হয় সেই আনন্দ-গুঞ্জন গদাধরকে ঘিরে। অনেকদিনের হারিয়ে

যাওয়া মাণিক ফিরে পেলে যা হয়…। এই প্রেম, ঐ কৃষ্ণপ্রীতি শুধু সম্ভব নিত্য প্রেমের বৃন্দাবনে...তাই যুগে যুগে বার বার যখন তিনি এসেছেন, সঙ্গে এসেছে তাঁর লীলার সাথী, আর ধূলার বুকে জেগে উঠেছে প্রেমের ব্রজভূমি…নব নব রূপায়ণে। কখন নদীয়ার রাঙা ধূলায়...কখন কামারপুকুরের হরিৎ হিরণ বক্ষে…।

পূর্ব্বের মতই আনন্দময় হলেও, মাঝে মাঝে গদাধরের মন যেন কোথায় যায় হারিয়ে—ধ্যান গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন একাকী। তখন কেউ সাহস করে না কাছে যেতে। তাই দেখে হিতৈষীরা পরামর্শ দেন পুত্রচিন্তাক্লিষ্টা চন্দ্রাকে…কেউ বলেন অপদেবতার ভর হয়েছে, রোজা দেখাও, কেউ বা বলেন বিবাহ দাও—সংসারের মায়ায় মন জড়ালে ওসব ভাব আপনিই যাবে খসে। তাই হল ঠিক, রামেশ্বর সুরু করেন খুঁজতে এই দিব্য কিশোর কুমার ভাইটির লীলাসঙ্গিনীটীকে…।

প্রথমটা কেউই সাহস করেনি গদাধরকে জানাতে, পাছে নীড়বিরাগী মন আরও বিরূপ হয়ে ওঠে, পাছে তাদের সোনার গদাই চলে যায় সংসার ছেড়ে…কিন্তু গোপন কি থাকে? যা কিছু গোপন, যা কিছু অন্তরের কথা—সবই যে আগেই জেনে নেন গোপন অন্তরের যিনি দেবতা—আর যাকে সাথে করে নিয়ে এসেছেন বিশ্বের কল্যাণ লীলার পূর্ণতা সাধন করতে তাকে কি গোপন রাখা চলে? তিনি না হলে লীলা যে হবে অপূর্ণ—ব্রহ্ম কি পারে শক্তি হারা হয়ে থাকতে? অগ্নি কি পারে তার দহন শক্তিকে দূরে রাখতে?—তাই বিবাহের সংবাদে চির আনন্দের ধন, চন্দ্রানন্দন কোন আপত্তির কথা না তুলে বালকের মত আনন্দময় হয়ে উঠলেন…এদিকে তখন ব্যর্থকাম হতে চলেছেন ভ্রাতা রামেশ্বর—শত সন্ধানেও যখন মিলল না দেবকুমারের উপযুক্ত একটি দেবকুমারী

তখন মধ্যম অগ্রজের বিষণ্ণমূর্ত্তি দেখে রঙ্গময়ের জেগে ওঠে করুণা··· ভাবে আবিষ্ট হয়ে একদিন বলেন, "জয়রামবাটী রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে দেখ্‌গে যা।" গোপন ঠাকুর—তাঁর গোপন লীলা সঙ্গিনী···। তাই এককে চেনাতে প্রয়োজন হয় আর এক জনের। ঠাকুরকে চেনাতে···মা। আর মাকে চেনাতে...ঠাকুর। যাই হোক, গদাধরের এই ভাব বাণীতে সকলের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। বেজে ওঠে মঙ্গল শঙ্খ···পড়ে যায় উৎসবের সাড়া। রামেশ্বর ছুটে যান জয়রামবাটীতে—গিয়ে দেখেন সত্যই দেবতার উদ্দেশ্যে তুলে রাখা নন্দনের অনাঘ্রাত কুসুম কোরকই বটে···গদাধরের কথায় "কুটো বেঁধে রাখা।"

ষষ্ঠবর্ষীয়া দিব্য-রূপ-গুণ সম্পন্না কুমারী সারদাকে দেখে রামেশ্বরের মনে হয় যেন সোনার প্রতিমা—হিমদুহিতা উমামহেশ্বরী···। তাদের ভোলামহেশ্বর গদাধরের উপযুক্ত ঘরণী। শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আবেদন জানাতেই তিনি যেন হাতে পান আকাশের অধরা চাঁদ আর সঙ্গে সঙ্গেই সানন্দ সম্মতি দানে তৃপ্ত করেন রামেশ্বরকে...। ফিরে আসেন রামেশ্বর আনন্দ সংবাদ বহন ক'রে। বিবাহের দিন স্থির হয় শেষ বৈশাখের এক মুকুলজাগা দিনে।

দেখতে দেখতে আনন্দচঞ্চল পদবিক্ষেপে এসে পড়ে সেই পুণ্য তিথি। চন্দ্রাকুটীরের ক্ষুদ্র আনন্দ পাত্রখানি আজ উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গৃহে গৃহান্তে···। আজ সোনার কিশোরকে বরবেশে সাজিয়ে দিতে ছুটে আসে কামারপুকুরবাসিনীরা। কেউ গাঁথে বরমাল্য···দুলিয়ে দেয় অনুরাগরক্তিম বক্ষ সজ্জিত করে, কেউ বা প্রশস্ত চন্দ্রললাটে এঁকে দেয় নয়ন লোভন অলকাপাঁতি···। হেমগলিত অঙ্গে শোভা পায় রাঙ্গা চেলি—সেই স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া, ঠিকরে পড়া রূপ দেখে চোখ

যেন কারো ফেরে না···বুঝি ভাবে·বিধাতার রূপ তুলিকায় কি এত রূপলেখা ছিল?

জননী চন্দ্রা, জননীতুল্যা ভ্রাতৃবধূর— আনন্দ অশ্রুর গোধূলিতে যাত্রা করেন গদাধর···সঙ্গে বরযাত্রী গ্রামের যত দীন নারায়ণ—হাতে লাঠি, কোমরে, মাথায় গামছা বাঁধা—কণ্ঠে অফুরাণ আনন্দ কলরব। আনন্দ উল্লাসে দিক উল্লসিত করে সকলে চলে যেন জয়যাত্রার পথে তাদের একটুকরো গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীকে বরণ করে আনতে। মনে পড়ে যায় উমাকে বরণ করতে চলেছেন—ভোলা মহেশ্বর, শিবসুন্দর, ভস্মাঙ্গভূষিত অঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্মে ফণিহারে বরবপু সজ্জিত···সঙ্গে প্রধান পার্ষদ নন্দী ভৃঙ্গী, আর ভূত প্রেত দানা দৈত্যের দল—পদভারে ধরণী কম্পিত, কণ্ঠনাদে গগন বিদীর্ণ···। অবশেষে সকলেই উপনীত শ্যামার কুটীরে ···গৌরী গৃহে আগত গৌরীনাথ। কিন্তু শুভলগ্নে ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। সাতাশকাটির আলোয় যখন গদাধর সুন্দরকে ঘিরে চলেছে পরিবেষ্টন—বিশ্বেশ্বরের আরতির মতই হয়েছে সে স্বর্গীয় দৃশ্য···সহসা সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সংযোগে ভস্মীভূত হয়ে গেল শ্রীগদাধরের বরদহস্তের মাঙ্গলিক সূতা।

শিবশক্তির অনন্ত নিত্যমিলনের কাছে জাগতিক সূত্রের বন্ধন এমনি করেই বুঝি হয় চিরব্যর্থ···তখন সেই লীলার প্রকাশেই মর্ত্তের মুরলীতে বেজে ওঠে অমর্ত্তের আকুল করা সুর···যা শুনলে মানুষ হয়ে যায় স্তম্ভিত ...মনে জেগে ওঠে দিব্য অমৃতময়ী চেতনা·· তাই যখন জয়রামবাটীর সেই দেববাসরে সকলে আনন্দলীলায় মগ্ন—আনন্দের সম্পদ গদাধর ও সারদাকে ঘিরে, সেই আনন্দলীলা দৃষ্টে ভাবময় ঠাকুর গদাধর সুন্দরের জেগে ওঠে মাতৃপ্রেমের বিলাস। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমুখে আধ আধ স্বরে ফুটে ওঠে মা মা বুলি। কণ্ঠ মুরলীতে বেজে ওঠে মাতৃসঙ্গীত—যে

সুরস্রষ্টার সুরে সৃষ্টির উষায় জেগে উঠেছিল নবপুলকের কম্প···সেই চিন্ময় সুরে যখন শ্যামাগেহ হ'ল মুখরিত,···তখন সমাগতদের অন্তর-চেতনা হল বিকশিত, আর বাহ্যচেতনা হল বিলুপ্ত প্রায়। বাসরের আনন্দ গুঞ্জন গেল স্তম্ভিত হয়ে···ঘরে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের আহার গেল থেমে···রন্ধনরতা সারদাজননী ছুটে এলেন গদাধরের কণ্ঠমুরলীর মোহময়ীর আকর্ষণে, মোহাবিষ্টের মত চেয়ে রইলেন সেই ভাব গদগদ আধসমাধিগত শ্রীমুখের পানে···। গদাধর ভাবস্থ...আর সেই ভাবের ছোঁওয়া লাগে বুঝি সকলের প্রাণে। কামারপুকুরের যাদুকর তার সোনার কাঠির দিব্য পরশে বুঝি আজ ক্ষণিকের জন্যেও সকলের মনে এনে দিয়েছে চেতয়িতার অমৃতময়ী চেতনা···।

···পরের চিত্র কামারপুকুরের চন্দ্রাকুটীর। সে কুটীর আজ আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীতে আনন্দ মুখরিত। চন্দ্রামণির ভাঙ্গা ভিটার আনন্দ—যজ্ঞে আজ যেন সবার নিমন্ত্রণ। যে আসে লুটে নেয় আনন্দ। আজ যেন মেনকার পাষাণপুরী আঁধার নিথর করে শিবগেহে এসেছেন শিব গেহিনী······চন্দ্রাদুলালের সাথে চন্দ্রাদুলালী। অশ্রু উচ্ছলিত চোখে দেখেন চন্দ্রা···স্বস্তি আর শান্তিতে বুক ওঠে ভরে···অতৃপ্ত নয়নে দেখে পাড়া প্রতিবেশী······তাদের আনন্দও আর ধরে না—কেউ জানায় প্রাণভরা আশীষ কেউ বা জানায় প্রণাম। ভক্তি আর স্নেহ

এই দুয়ের বন্ধনই যে বিশ্বজননীর গভীর বন্ধন। অভাবের সংসার ······দুঃখের সংসার······ভিখারী ভোলার সবহারানো সংসার······ তাই গভীর দুঃখে গদাধরজননী আজকের দিনেও বার বার মোছেন গোপন ব্যথায় ঝরেপড়া অশ্রুরাশি। যে সোনার প্রতিমাকে বরণ করে আনলেন তাঁর ঘরে—কোথায় পাবেন তার অঙ্গ আভরণ—যা দিয়ে তিনি সাজিয়ে রাখবেন মনের মত করে ?···আজ ত শুধু কতকগুলি চেয়ে আনা অলঙ্কারে সমাপ্ত দেবীর অঙ্গ সজ্জা। কোন মুখে তিনি সেগুলি ফিরে চাইবেন···সোনার অঙ্গ শূন্য করে ?—গভীর স্নেহ এসে আঘাত দেয় ব্যথার দুয়ারে······অন্তর্যামী দেব সন্তান বোঝেন জননীর অন্তরের গুমরে ওঠা ব্যথা—তাই করেন উপায়······নিদ্রিতা স্বর্ণ প্রতিমার অঙ্গ হতে খুলে নেন আভরণগুলি, বালিকা কিছুই পারেন না জানতে। নিদ্রা ভঙ্গে শ্যামার দুলালী অন্বেষণে হন রত······ কোথায় গেল তাঁর আভরণ ?···ব্যথিতা গদাধরজননী পরম স্নেহে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে অশ্রুসজল চোখে দেন সান্ত্বনা······"মা, গদাই পরে তোমায় এর চেয়ে অনেক ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে"······। শান্তিময়ী মা আমার তাতেই শান্ত······কিন্তু আভরণহীনা সারদাকে দেখে রুষ্ট হন নীলমাধব, বালিকার স্নেহ-পাগল খুল্লতাত। এবং তখনকার মত দুঃখ অভিমান পূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁদের আদরের দুলালীকে। নিরুপায় চন্দ্রার বুকে এ ব্যথা বাজে গভীরভাবে, কিন্তু সে ব্যথার অশ্রুও মুছিয়ে দেন রঙ্গভরা হাসির আলোয় তাঁর রঙ্গময় সন্তান-যুগের ব্যথাহারী ঠাকুর······"যাক্ না নিয়ে, বিয়ে ত আর ফিরবেকনি।"

এর পর দীর্ঘ দুটি বৎসর কেটেছিল আনন্দ সংবেদনে, দুটি বৎসর মায়ের কোল ছেড়ে যাননি মায়ের দুলাল। মাঝে আর একবার তাঁর চরণ ধূলায় রাঙা হয়েছিল জয়রামবাটীর পথধূলি।

সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা সারদা সেদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে দেবতার ধূলি ধূসরিত চরণদুটি ধুইয়ে দিয়েছিলেন সুস্নিগ্ধ বারিধারায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ পদসেবায় পরিতৃপ্ত করেছিলেন তাঁকে। এই সময় কিছুদিন শ্যামাগেহ দিব্যআনন্দে পরিপূর্ণ করে ফিরে এলেন ঠাকুর কামারপুকুরে, সঙ্গে নিয়ে এলেন শ্যামার দুলালীকে।...এরপরে কামারপুকুরের সেই আনন্দমুখর দিনগুলির কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার আঁচরে লেখা থাকে না—হেলায় হারিয়ে যাওয়া পরশপাথরের মত এই দীর্ঘ দিবসের আনন্দ চিত্রগুলি বুঝি সহজলভ্য হয়েই হারিয়ে যায় কালের ধূলায়। সুখের শেষে আসে দুখের রাতি—সে যেন আসে জমাট বাঁধা মেঘের রথে, তাই যেতে যেতে চায় না যেতে। আর সুখ যেন ভেসে আসা দখিণ হাওয়ার ধন—ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল পায়ে এসে ক্ষণিক আনন্দ ছড়িয়ে দিয়ে সে যায় চলে…। তাই দেখি কামারপুকুরে গদাধরের সঙ্গ-সুখের দিনগুলি চঞ্চল স্রোতের মত ভেসে চলে যায়। গদাধরচন্দ্র ফিরে যান সাধনার সপ্ততীর্থ…দক্ষিণেশ্বরে…ডুব দেন মাতৃপ্রেমের অতল তলে। আর এদিকে ফিরে আসেন শ্যামার দুলালী, জননী আর জন্মভূমির ছায়ানিবিড় কোলে। পিছনে পড়ে থাকে বিরহ-ব্যাকুল কামারপুকুর……রাঙা ধূলায় ফেলে যাওয়া চরণ চিহ্ন বুকে নিয়ে স্মৃতির তীর্থরূপে, যেন বলে—

"অব দখিনাপুর গদাধর গেল
নয়নক নিধি কো বিধি নেল॥"[১]

বালিকা সারদা পিত্রালয়ে ফিরে দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মসাধনায় যান ডুবে···। পল্লীর অন্যান্য দরিদ্র সংসারের মত এ গৃহেও পূর্ব্বাসার দ্বারে উষায় আলোর ডাকে সুরু হয় নূতন দিনের কর্ম্মধারা··· দিনান্তের অস্তচ্ছায়ে হয় তার সমাপ্তি...। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে জননীর সাথে শয্যাত্যাগ ক'রে বালিকা সারদা জননীর গৃহকর্ম্মে হন সঙ্গিনী।...মায়ের সাথে তূলার ক্ষেত হতে সংগ্রহ করেন তূলা···আবার নিপুন হাতে কাটা হয় পৈতা, ছোট ভাই বোন-গুলির প্রতিপালনের ভার ত' আছেই। সময় সময় রন্ধনের ভারও পড়ে মাতা অসুস্থ হলে—কোমল অপটু হাতে অন্নভাণ্ড উত্তোলনে যখন হন অক্ষম, পিতা রামচন্দ্র এসে করেন সাহায্য।···দুঃখের সংসার নিত্য নূতন দুঃখ যেন ঘনিয়েই আছে। সেবার এল পঙ্গপালের দল···সোনাফলা মাঠে বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারের মত দুষ্ট কীটের দল প্রায় সমস্ত শষ্য দিল নষ্ট করে। যেটুকু রইল অবশিষ্ট ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। গ্রামবাসী আসে ছুটে, অবশিষ্ট যা আছে তাই বাঁচিয়ে রাখবার আশায়······তাদের সঙ্গে দেখা যায় এসেছেন শ্যামার একটুকরো মেয়ে সারদা লক্ষ্মী—খুঁটে তুলছেন সমস্ত পতিত শস্য। কে বলবে সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা—.

এমনি ভাবে কাটে বিশ্বজননীর পল্লী জীবন······দরিদ্র জনক-জননীর অভাবপূর্ণ সংসারটীকে অভয় হস্তে আঁকড়ে ধরে······যেন অতি সাধারণ একটী পল্লীবালা। স্মরণে কণ্টকিত হয়ে ওঠে দেহ-

মন, নত হয়ে আসে শির, সতী-সিমন্তিনীর পদরেণু লাঞ্ছিত দেব ভারতের পথ—ধূলে···ধূলার মেলায় অলকার আলোর দোলা দেখে নয়ন যায় জুড়িয়ে।—

রাজা যখন আসেন ছদ্মবেশে তাঁর আপন রাজ্য পরিদর্শন করতে ···তখন কেউ কি চেনে তাঁর স্বরূপ, যদি তিনি না দেন ধরা? তাঁর স্বরূপ শুধু তাঁরই কাছে স্বপ্রকাশ······

তেমনি এই মর্ত্তলোকে যখন নেমে আসেন অমর্ত্তের অধরা, মানব দুয়ারে প্রেমের ভিখারী বেশে, সেদিনও অতি অল্প কয়েকজনই তাঁকে চেনে...তিনি যে চির অচিন···"অচিনে গাছ দেখেছ! কেউ চেনেনা।" শ্রীঠাকুরেরই কথা - তাই যেদিন মানবী মুর্ত্তিতে স্বর্গের আনন্দপ্রতিমা ধরা দিলেন ধূলার তীর্থে···প্রকৃতির দুলালীর মত খেলে বেড়ালেন ধরণীর শ্যাম শয্যা বিছানো পল্লীর অঞ্চল ছায়ে,—সেদিনও বুঝি চিনেও চেনেনি পল্লীবাসী···খুলেও যেন খোলেনি জননীর আড়ালের অবগুণ্ঠন ···সে অবগুণ্ঠন শুধু বুঝি উন্মুক্ত ছিল নিজের কাছে।···তাও সময় সময় যায় হারিয়ে; ধরার ব্যথায় গ'লে মনে থাকে না সেই জ্যোতির্লোকের কথা।

সকলে দেখে বালিকা সারদা শত কাজের মাঝে যেন হয়ে পড়ে আনমনা···একান্ত উদাসীন···আর শ্যামার দুলালী দেখেন ঠিক তাঁরি অনুরূপ আর একটি রূপময়ী কুমারী হয়েছে তাঁর কর্ম্মের সঙ্গিনী,... তার সাহচর্য্যে সকল কাজ সমাপণ হয়ে উঠছে—সকলের চেয়ে দ্রুততর ভাবে।—হয়তো বালিকা সারদা তৃণসমাচ্ছন্ন দীঘির কালো জলে নেমেছেন দল ঘাস কাটতে...ক্ষুধার্ত্ত গাভীগুলির আহার জোগাতে হবে তো···দেখেন সঙ্গে আছে সেই অপরূপ দিব্য কুমারী। দুজনের দিব্যহস্তের স্পর্শে মুহূর্ত্তের ভিতর পূর্ণ হয়ে যায় কাজ।—সবার

অলক্ষ্যে হাস্যে লাস্যে দিব্য আলাপে রঙ্গে একই স্বরূপ দুটি রঙ্গময়ীর চলে নিত্য নূতন রঙ্গলীলা···পরিচয় সে দেয় না,···কিন্তু বালিকা জননী কি চিনেছিলেন তাঁর আপন স্বরূপকে? না কি লীলাময়ী গোপন লীলায় গিয়েছিলেন আপন ভুলে। তাই বুঝি পরবর্ত্তী কালে ভক্ত সন্তানের দলকে বলেছেন "মেয়েটি যে কে কিছুই বুঝতে পারিনি।" —চণ্ডীর লীলাতেও দেখি দেবাসুরের প্রয়োজনে এক উমা-মহেশ্বরীর নানা রূপের বিকাশ একই কালে একই স্থানে··।

বাঁকুড়ার বক্ষ জুড়ে সেবার হল দুর্ভিক্ষ, মহাপ্রলয়রূপিনার সর্ব্বগ্রাসী রূপের ক্ষণপরকাশ। কুন্তলিত শ্যামবনাঙ্গনে জ্বলে ওঠে দাবানল, রুদ্রের অভিশাপ, বহ্নি···।—১২৭১ সালের সেই মৃত্যুলীলার দিনগুলি জয়রামবাটী ভুলে যাবে না।—হাহাকারে—ক্রন্দনে ভরা আকাশ বাতাস। বৃষ্টিবিহীন গগনের দিকে চেয়ে আকুল হয়ে উঠেছে ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ। কিন্তু বিশ্বের আর্ত্তির মাঝে আজ জেগেছেন জননী বিশ্বার্ত্তিহারিণী, বিশ্বের সন্তান আজ শুনেছে জননীর অভয় চরণ সিঞ্জন।···তাই দেখি সেই মৃত্যুলীলার মাঝে অমৃতের ভাণ্ডার খুলে দিলেন···একান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ সারদা-জনক শ্রীরামচন্দ্র। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল করুণানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ফিরে চেয়ে দেখলেন না ভবিষ্যতের আঁধার পথের পানে···আগের বৎসরের সঞ্চিত লক্ষ্মীর ধন স্বরূপ ধান্যগুলি এই সময় দিলেন ব্যয় করে।—

ভাণ্ডে ভাণ্ডে পরিপূর্ণ করে রাখলেন ক্ষুদিতের ক্ষুধাহরা সুধা…। যে আসে সেই পেট ভরে পায় জননীর স্নেহ পরসাদ…। এক একদিন দেখা যায় ক্ষুধিত এসে ঝাপিয়ে পড়ে অন্নভাণ্ডের উপর আর কুলিয়ে ওঠা যায় না কিন্তু অন্নপূর্ণার ভাণ্ড অফুরান হয়ে আসে পরিপূর্ণ হয়ে। আর দেখা যায় সন্তুতপ্ত সেই অন্ন—ছোট্ট দুটি রাঙা হাতের কোমল বায়ে জুড়িয়ে দিচ্ছেন, বাংলা মাটির সোনার মেয়ে বালিকা সারদা। বিশ্বের বুক জোড়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জননীরূপে একদিন যিনি শত শত সন্তানের ব্যথা জুড়িয়ে দেবেন; তাদের মুখে তুলে ধরবেন করুণার সুধা পাত্র তাঁর এরূপ তো সেই মহান ভবিষ্যতেরই অগ্রসূচী…। আজকের এই দাবদগ্ধ ধরণীর শুষ্ক হৃদয় জননীর স্নেহচুম্বন ছাড়া সরস হবে কেমন ক'রে?…

দিন যায় কেটে—সাক্ষী শুধু মহাকাল…কোন দিন জীর্ণ, পাতার মত যায় ঝরে, ধূলায় পড়ে ঢাকা। আর দিব্য মহান দিনগুলি বুঝি ফুলের মত থাকে গাঁথা তাঁর বরকণ্ঠে।…সুখের দুঃখের সংসারে জনকজননীর স্নেহ আকুতি ভরা উদার বক্ষছায়ে—পল্লীর শ্যাম অঙ্গনে… আর আমোদরের তীরে নর্ম্মলীলায়…শ্যামার দুলালীর দিনগুলি যেন ফুলের মত শতদলে ওঠে ফুটে—আর তারি বুকে চরণ রেখে আনমনা বালিকা কখন যেন এসে দাঁড়ায় কৈশোরের পূর্ব্বাশায়!…

ত্রয়োদশবর্ষীয়া সেই সোনার কিশোরীর ডাক আসে কামারপুর চন্দ্রাগেহ হতে—চন্দ্রানন্দন তখন দূর দখিনাপুরে। রাণী রাসমণি আর মথুরের তখন ধন্য হবার পালা…এদিকে আমেরবনে…চন্দ্রাভবনে… বেজেই থাকে বিদায় পূরবীর সুর……বেদন গোধূলির ছায়া যেন মিলিয়ে যেতেও যায় না, তাই বুঝি গদাধরজননী স্নেহব্যাকুল বুকের জ্বালা জুড়াতে, শূন্য অঞ্চল ছায়ে নিয়ে এলেন চন্দ্রাদুলালের পরিবর্ত্তে চন্দ্রাদুলালীকে।

যাঁর লীলার ক্ষণ ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছিল বিলসিত, তিনি নিজে যখন ধরা দেন আপনহারা নর্ম্মলীলায়, তখন বুঝি লীলার সাগরে অথৈ হয়ে জেগে ওঠে বাঁধন হারা নিত্য নূতন বিলাসের তরঙ্গ···সেদিন যখন লাজনম্রা কিশোরী পল্লীবধূর মত জননী সারদা এসে দাঁড়ালেন পথের পাশে···অন্তর লাজভীতিতে দুরু দুরু···না জানি একাকী কেমন করে যাবেন দ্বিপ্রাহরিক স্নানে?...এমন সময় শোনা যায় দূরে যেন কাদের চরণধ্বনি। দেখতে দেখতে বনলক্ষ্মীর মত এগিয়ে আসে আটটী দিব্যকুমারী···আর চিরপরিচিতের মত পরম আদরে শ্যামার দুলালীকে মাঝে নিয়ে মোহনছন্দে এগিয়ে চলে, রাঙামাটির পথ বেয়ে, হালদার দিঘীর অভিমুখে—স্নান তীর্থে।

·· মনে হয় যেন কল্পনা···মনে হয় যেন চির স্বপ্নের ধন···। সেই পল্লীজননীর বক্ষ নিস্তব্ধ করা অলস মধ্যাহ্ন, জেগে আছে শুধু ঘুঘুর কূজন আর আলোকউজ্জ্বল শান্ত আকাশ······সেই শুভক্ষণে পল্লীপথ বুকে বেজে উঠেছে দেবলোকের দেবকুমারীদের নূপুর সিঞ্জা—সবার অলক্ষ্যে—মর্ত্তের অনবধানে বুঝি চলেছে অমর্ত্তের লীলা···তাই অলস, আচ্ছন্ন পল্লীবাসীর চোখে এই স্নানলীলা পড়েনি ধরা···বুঝি দেখেছিল শুধু পল্লীলক্ষ্মী আর ঝরে পড়েছিল দুটি ফোঁটা আনন্দ অশ্রু। হালদার দীঘির স্বচ্ছ শ্যামল বারি লীলায় হয়ে ওঠে চঞ্চল, জননীর সাথে অষ্টসখীর স্নানলীলায়—উথল পাথল হয়ে ওঠে তাদের কুম্ভঘটের আর কনককঙ্কনের মধুর নিক্বণে। স্মৃতির পটভূমে জাগে ব্রজেশ্বরীর সখী সঙ্গে স্নানাভিসার···আর জাগে হিমরাজ দুহিতাকে ঘিরে অষ্টসখীর সমাবেশ। শুধু একদিন নয়—দুদিন নয়—সেবার কামারপুকুরে জননীর শুভ অবস্থিতিতে নিত্য নিত্য চলেছে মধ্যাহ্নের এই দিব্য মধুর লীলা।—কিন্তু এখানেও শুনি লীলাময়ীর গোপনকরা বাণী "অনেক দিন মনে

করেছি মেয়েগুলি কারা, আমার স্নানের সময় রোজই আসে।—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।"

এই সময় মাসাধিককাল কামারপুকুরে অবস্থান করে চন্দ্রামণির তপ্ত বুকের জ্বালা শান্ত করে আমাদের সারদালক্ষ্মী ফিরলেন পিত্রালয়ে …কিন্তু চার মাস অতিবাহিত হতে না হতে, আবার এল ডাক…তবে এবার আর শূন্য ঘরে ব্যথায় ভরা আহ্বান নয়—এবার বাজল আনন্দ শঙ্খে জননীর শুভ আবাহনী; গদাধরচন্দ্র ফিরেছেন চন্দ্রামণির আঁধার কোলে…। কামারপুকুরে আর চন্দ্রাগেহে আবার বসেছে আনন্দের হাট। তারি পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য এবার এসেছে শুভ আহ্বান। আনন্দভরা প্রাণে এলেন জননী…বিলিয়ে দিলেন আপনাকে পরম দেবতার চরণতলে…যুগে যুগে যেমন বিলিয়ে দিয়েছেন।…এখানে দেখি জননীর অপূর্ব্ব আত্মসমর্পণের রূপ…শতদল যেমন উন্মুক্ত করে দেয় আপনাকে…শতধারে ঝরে পড়া অরুণ আলোর নির্ঝর বুকে ধরে নিতে তেমনি করে কিশোরী জননী তাঁর স্ফুটনোন্মুখ জীবনকোরক মেলে ধরলেন ঠাকুরের দিব্য আলোয়…আর ঠাকুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নবারুণের মত তাঁকে সাদর সস্নেহ শিক্ষায় দিলেন দীক্ষা। সে দীক্ষায় নিহিত ছিল ক্ষুদ্র সংসারের খুঁটিনাটি থেকে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পর্য্যন্ত।…

…অথচ সব এক—যে মা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বিরাজ করেছেন দক্ষিণেশ্বরীরূপে—সেই তিনিই তো জননী সারদারূপে অবতীর্ণা এ শ্রীঠাকুরেরই মুখের কথা। লীলাময়ী একরূপে নিচ্ছেন যাঁর আত্ম-নিবেদন আর এক রূপে তাঁর কাছে কর্চ্ছেন আত্মসমর্পণ।

আনন্দ ছাওয়া দিনের কোলে দিন কাটিয়ে সাতটি মাস পরে ঠাকুর আবার ফিরলেন দখিণাপুরে—১২৭৪ সালের কুহেলি ভরা অগ্রহায়ণে। পঞ্চবটীর দেউল হলো আলো আর কামারপুকুরে চন্দ্রামায়ের চাঁদের হাট আবার গেল ভেঙ্গে। আলোছায়ার দোলায় দোলানো এইত তাঁর লীলা!

জননী সারদালক্ষ্মীও আবার ফিরলেন শ্যামামায়ের কোলে; জয়রামবাটীর সেই পরিচিত মাটীর দেউলে···। ফিরলেন—কিন্তু দেবতার বিচ্ছেদজনিত বেদনা নিয়ে নয়; রামকৃষ্ণগত প্রাণা—গদাধরময়ী জননী—গদাধরের আনন্দ সত্ত্বায় আপনার হৃদয়ঘট কানায় কানায় পরিপূর্ণ করেই ফিরে এলেন বাল্যের লীলাভূমে······।

"এ সময় সর্ব্বদাই অনুভব করতাম, আনন্দের পূর্ণঘট যেন হৃদয়ে স্থাপিত হয়েছে।" (মাতৃবাণী)

প্রেম আর বিদ্বেষ—এই দুটি তত্ত্বেই চলেছে এই বিরাট বিশ্বলীলা···। গ্রীক দার্শনিক এমপিডক্লিজের এই বাণী। এই বাণীর মাঝে আছে এক পরম সত্য। তাই বিশ্বের মানব, পশু, প্রতিটি অনুপরমানু পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে পরস্পরের নিকট হতে অন্তরের এই দুটি ভাবের স্পর্শ। এমন কি বিশ্বের অন্তরতম দেবতা তাঁর প্রেমঘন সত্ত্বা নিয়ে যখন নেমে আসেন এই বিশ্বেরই ধুলার বুকে, তখন তিনিও পান না শুধু প্রেমের নিকষিত হেমহার—পান বিদ্বেষের কণ্টকজ্বালা···। এ চিত্র যুগে যুগে বিরল নয়—

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন লহরিত হয়ে উঠেছে যুগ-দেবতার সাধনলীলা নিত্য নবনব রূপায়নে,

"যত মত তত পথে"র বুকে যখন আলো জাগিয়ে তুলতে ছুটে চলেছেন বিশ্বপথের দিশারী—কখন মাতৃনামে বিভোর—কখন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী শ্রীরাধিকা···কখন করুণকান্ত রামলালা সাথে ঠাকুরের ঠাকুরালী—আবার কখন বা বেদান্তের নির্ব্বাণ পথে অন্তরের অন্তরতম ইষ্টদেবীকেও খণ্ডিত করে ছুটে যাওয়া ব্রহ্মতত্ত্বে······শতযুগ বাঞ্ছিত নব যুগের এই অপরূপ নবীন অভ্যুদয়ে দক্ষিণেশ্বর তখন আলোয় আলোময় ···সেই আলোয়, তমসাবৃত আঁধারের পথিকদের অন্ধনয়ন বুঝি গিয়েছিল ধাঁধিয়ে, তাই ঠাকুরের ঠাকুরালী তাদের চোখে ঠেকে সৃষ্টিছাড়া পাগলামী···। আর তাই নিয়ে একটী ক্ষুদ্র আলোড়নেরও সৃষ্টি হয়েছিল একথা না বললেও চলে।

আপনভোলা বিশ্বপাগলের পাগলখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে ···জয়রামবাটীতেও শোনা যায় তারি কানাকানি,...পাড়াপড়শীদের মুখে মুখে ও নানা জল্পনায় কল্পনায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে প্রতিবেশীদের গৃহ···! অবশেষে সোনার দুলালী সারদাকে তারা অভিহিত করে পাগলের বধু নামে···মনে ভাবে একান্ত করুণার পাত্রী এই দেব কিশোরী···।

যদিও পাগল মহেশের ঘরণী উমামহেশ্বরীর কাছে এ নাম নূতন নয়···এতো তাঁর চিরবাঞ্ছিত নাম, যুগে যুগে···তবু দেবদয়িতের নিন্দা সতীলক্ষ্মীর বুকে বাজে তীক্ষ্মশেলের মত! সর্বংসহা জননী তবু সে আঘাত সহ্য করেন নীরব অশ্রু-জলে···লোকসঙ্গ হয় অসহ্য; নিরবচ্ছিন্ন অসঙ্গ জীবন যাপন হ'য়ে ওঠে একান্ত কাম্য...বাহিরের লোক বোঝে না দরদ, বোঝে না কোথায় ব্যথা···মৌখিক সান্ত্বনা দেবার ছলে এসে আঘাতই করে বসে পুষ্পকোমল হৃদয়ে···তাই বাহিরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে কিশোরী জননী গৃহকোণের কর্ম্মগুলিকে করেন সম্বল···আর গোপন অন্তরে চলে দেবতার লীলা স্মরণ···গোপন

অশ্রুধারায় হয় তাঁর নিত্য অভিষেক···ব্যথার পুষ্পচন্দনে হয় তাঁর পূজা, মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির অমৃতময় ছন্দ,

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট পড়েছে
ভিতর দুয়ার খোলা"

ব্যথায় ভরা দিনগুলির মাঝেও লুকিয়ে থাকে আশা···তাই বিরহ-বিধুর বক্ষে থাকে এক নীরব সান্ত্বনার বাণী। আশায়—নিরাশায়——আলো-ছায়ায় দিন চলে কেটে···একদিন নয় দুদিন নয়...সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর। মহাকালের বাধাহীন কালচক্র, কারো অপেক্ষাই সে রাখেনা—নিষ্ঠুরতায় নিরপেক্ষ।

জননী শ্যামার দুলালীর ব্যাকুল প্রতীক্ষা যেন হয়ে ওঠে আরও গভীর—আরও নিবিড়। পরম দেবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে অন্তর হয়ে ওঠে উদ্বেলিত, তবু আসেনা চিরবাঞ্ছিতের আহ্বান ···দখিণাপুরের সেই লীলাময়, আর কত লীলা করবেন কে জানে ?··· ব্যাকুল ব্যথা হয়ে ওঠে ধৈর্য্যহারা···কিন্তু বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না··· বাংলার মেয়ের চিরন্তন-আদর্শ দেখি জননীর মাঝে। অবশেষে একদিন শোনেন মৌনমনের ব্যথাভরা বাণী—অন্তরের যিনি চির আত্মীয়। তাই স্থূলভাবে তাঁর ডাক না এলেও ঘটে যায় এক পরম সুযোগ···জননী সারদার দক্ষিণেশ্বর যাত্রার !—

১২৭৮ সালের ফাল্গুনীপূর্ণিমা—গৌরচন্দ্রের শুভ আবির্ভাবের পুণ্যদিবস। পুণ্য লোভাতুর বাঙ্গালীর গঙ্গাভক্তি আজন্ম। মর্ত্তের মন্দাকিনী, মুক্তির প্রস্রবন স্বরূপিনী, এই মনোহারী গাঙ্গ্যবারি। তার স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন ক'রে— তার ক্ষণিক স্পর্শমাত্রে মানুষ ধুয়ে নিতে চায় তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি, পুণ্য প্রভাতের জ্যোতিগঙ্গায় আপনাকে হারিয়ে সত্যই আধারের মানুষ ভুলে যেতে চায় তার সব মলিনতা, সব আবিলতা। তাই এক একটী শুভলগ্নকে উপলক্ষ করে গঙ্গাতটে জমে ওঠে ভিড়···ভাগীরথী-বক্ষ উদ্বেলিত ক'রে ছুটে আসে সহস্র সহস্র নরনারীর দল···। পুণ্যময়ী জননীর বক্ষে সহস্র শিশুর মেলা দেখে নত হয়ে আসে শির······প্রণাম জানাই এই ব্রহ্মবারীকে আর প্রণাম জানাই এই সরলমনের গতিকে।

এই পুণ্য দিবসে জয়রামবাটীর পল্লীজননীরাও করেছেন মনস্থ গঙ্গাস্নান যাত্রার···সকলেই উদ্যোগে ব্যস্ত, কলিকাতার ভাগীরথীই হ'ল তাঁদের গম্যস্থল···।

এই তো পরম সুযোগ···পূর্ণ চন্দ্রের আহ্বানে যেমন উদ্বেলিত হয়ে উঠে ভাগীরথীর কুলহারা তরঙ্গ···তেমনি বুঝি উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে শ্যামার দুলালীর আকুল অন্তর দেবদর্শনের আকুল আকাঙ্খায়। অন্তরের অভিলাষ তিনি জানান সঙ্গিনীদের—তিনিও যাবেন গঙ্গাস্নানে ···। সঙ্গিনীদের মুখে শ্রবন করেন পিতা রামচন্দ্র···বোঝেন কন্যার অন্তরের গোপন ইচ্ছা, তাই তিনি স্থির করেন নিজেই নিয়ে যাবেন তাঁর স্নেহের পুতলীকে।—

শুভলগ্নে সুরু হল তীর্থ যাত্রা···আধুনিক যুগের মত তখন তীর্থপথ এত সহজ ছিল না, ছিল দুর্গম বিপদসঙ্কুল। রেলপথের সুবিধা না থাকায় পদব্রজে অথবা পাল্কীতেই ছিল চলাচলের ব্যবস্থা···। পিতা আর সঙ্গিনীদের সাথে চলেছেন জননী সারদা পদব্রজে···। দুর

পথশ্রমে অনভ্যস্থ কোমল চরণ দুটি ক্ষণে ক্ষণে অক্ষম অপটু হয়ে পড়লেও অন্তরের আশাআনন্দের কোন ব্যাঘাতই হয় না…সামান্য দৈহিক কষ্ট পারেনা সে দিব্য চরণের গতি রোধ করতে…এমনিভাবে কখন উন্মুক্ত প্রান্তর, কখনও কণ্টকসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথরেখার বুকে তিনটী দিবস ধরে চলল ক্লান্তিহীন পথচলা। অস্ফুট চরণ দুটি হল শত আঘাতে জর্জ্জরিত…কোমল দেবতনুতে শ্রমভার হয় বুঝি অসহ। তাই কোমলা জননী সহসা আক্রান্ত হন প্রবল জ্বরে …আকস্মিক বাধায় সকলের গতি যায় থেমে…যুগে যুগের যে আপন জন তাকে ব্যথা দেওয়া, তাকে বাধা দেওয়া, এ যেন তাঁর চিরদিনের লীলা…। তাই দেখি শ্রীরাধিকার অভিসার পথে জমে ওঠে শত বাধা… সমগ্র নদীয়াবাসীর দর্শনের অনুমতির মাঝে জেগে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্রের কঠোর নিষেধ বাণী…তাই এ বাধা, এ ব্যথা জননীর যুগে যুগের পাওয়া…। বাধ্য হয়েই পিতা রামচন্দ্র স্নেহের কন্যাকে নিয়ে নিকটের একটী চটীতে নেন আশ্রয়…। অন্য সকলে চলে এগিয়ে…।

পান্থশালার একটি ঘরে একটি বস্ত্রে কন্যাকে সযত্নে রক্ষিত করে চিন্তামগ্ন রামচন্দ্র একাকী যাপন করেন নিঃসঙ্গ দুশ্চিন্তা ভরা রাত্রি…।

আঁধার পদবিক্ষেপে নীরব নিশিথিনী চুপিসারে এসে দাঁড়ায় ধরনীর দুয়ারে…স্বপ্নের মোহজাল ছড়িয়ে দিয়ে…স্নিগ্ধ শান্তকর হেনে ধরনীর শিশুর চোখে আনে নিদালীর ছায়া…। জানিনা কোন দিনান্তের অবসানে এসেছিল এই রাত্রি, একটী দিব্যলীলা প্রকাশের পরম লগ্ন হয়ে, ধন্য করতে দীন পান্থশালার ধূলিকণাকে।

দেহ জ্বরে আচ্ছন্ন—মন ক্লান্তিতে ভরা, অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায়

ধূলায় ঝরা হেমলতার মত জননীর কোমল দেহখানি লুটিয়ে থাকে পান্থশালার একটী নিরালা আঁধার কোনে···প্রহরের পর প্রহর যায় কেটে···। সহসা কার এ স্নিগ্ধ শুচি স্পর্শ ? চমকিত হয়ে ওঠেন জননী সারদালক্ষ্মী···সেই মধুর স্পর্শে তনুতীরে বয়ে যায় যেন শান্তির সুরধুনী...দেহের সাথে মনের জ্বালা হয় যেন উপশমিত। চোখ দুটি মেলে চেয়ে দেখেন জননী—অমাময়ী রাত্রিদেবীর মত স্নেহ আঁধার বরণ এক অপরূপ রূপময়ী—শ্রীঅঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছে তার স্নিগ্ধ শীতল হাতখানি···।

পরিচয় নেওয়ার ছলে শুধান জননী—"তুমি কোথা থেকে আসছ গা ?" চির চেনার ভঙ্গীতে রূপময়ী দেন তার উত্তর..."আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি"···বিস্ময়বিমুগ্ধ উদ্বেলিত কণ্ঠে আবার জাগে প্রশ্ন..."দক্ষিণেশ্বর থেকে ? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাব···তাঁকে দেখব···তাঁর সেবা করব, কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় ঐ সব আর হল না।"···দরদভরা সান্ত্বনার সুরে বলেন শান্তিময়ী "সে কি ? তুমি দক্ষিণেশ্বর যাবে বই কি···ভাল হয়ে সেখানে যাবে তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" কার বুকে জাগলো এত দরদ...কি তার পরিচয় ?...আবার জননী করেন প্রশ্ন··· "বটে তুমি আমাদের কে হও গা ?" বিজলী হাসি হেসে কালো মেয়ে দেয় তার উত্তর "আমি তোমার বোন হই।" পরিচয়ের পালা এইখানেই হয় সমাপ্ত।

সাধ ক'রে মায়ার কাজল চোখে এঁকে খেলতে এলেন মহামায়া, এই তো তাঁর কাজ নইলে তো নানা রঙ্গে, নানা ভাব তরঙ্গে, নানা হাসি কান্নার হীরে পান্নার দোলায় "লীলা পোষ্টা"ই হয় না। তাই আপনাকে চিনেও থাকেন আপনহারা...চেনাজনও হয় যেন কত

অচেনা। তা না হলে লীলাময়ীর বুঝতে কি বাকী ছিল, সহসা রাত্রির আঁধারে যাঁর প্রকাশ, সে আর কেউ নয়, সে তাঁরি অঙ্গসম্ভূতা স্বয়ং দেবী কৌশিকী !

মঙ্গলময়ী উষসি চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় গগন অঙ্গনে। চিন্তাক্লিষ্ট রামচন্দ্রের চিন্তা হয় দূর ; দেখেন কন্যার জ্বর হয়েছে উপশম...রাত্রির অন্ধকারে দীন পান্থশালাখানি যে এক মূহুর্তের জন্যও হয়েছিল মহাদেবীর লীলানিকেতন, সে কথা রামচন্দ্র যেন আভাসেও জানতে পারেন না।

দেবজনকের সাথে দেবকন্যার সুরু হল যাত্রা...পথে সঙ্গীদের মেলে সাক্ষাৎ। সেদিনও আবার আসে খিন্নতা, কিন্তু কল্যাণী জননী সেদিন কাউকে দেন না জানতে। কিন্তু কন্যার রোগখিন্ন কোমল দেহখানির পানে তাকিয়ে রামচন্দ্রের বুঝতে বাকী থাকে না তার অসুস্থতার কথা...তাই ঠিক করেন একটী পাল্কী ; দুর্গম তীর্থ যাত্রার পথে আরামে যাওয়ার এইটুকু ত' ছিল সম্বল। পাল্কীর ভেতর কন্যাকে সযত্নে রক্ষা ক'রে, নিজে পদব্রজে চলেন পিছনে পিছনে। লক্ষ্য—দূর দখিণাপুর······

দূর গগনের বুক ভেঙ্গে যখন সুরু হয় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার অমৃত সিঞ্চন, —আর চুম্বন করে ধরণীর শ্যাম অধর, তখন সেই দুকুল প্লাবি আলোকবন্যার বুকে বুঝি খুঁজে পাই চন্দ্রের সত্যকার মাধুর্য্য।

জ্যোৎস্না—সে যেন চন্দ্রের লীলাময়ী রূপ। চন্দ্র আর জ্যোৎস্না—অগ্নি আর তার দাহনী শক্তি—পুষ্প আর তার সৌরভ, এ যেন নিত্য মিলনের ক্ষণ পরকাশ।

আর এই নিত্য মিলনের নিত্য বিকাশ অবতার আর তাঁর লীলা সঙ্গিনী—তাই যখন স্মরণের ব্রজ কুঞ্জে বেজে উঠে শ্যামলের মধুর মুরলী-নিঃস্বন তখনই শুনি, কজ্জল ধৌত যমুনার তীরে অভিসারিকা শ্রীরাধার নূপুর সিঞ্চন। আবার যখনই দেখি—মহানগরী অযোধ্যার স্বর্ণ সিংহাসন গৌরবোজ্জল করে বিরাজমান প্রজানুরঞ্জনকারী শ্রীরঘুপতি রাঘব রামচন্দ্র, তার সঙ্গে নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠে বাল্মিকীর তপোবনচ্ছায়ে অশ্রুজলাভিষিক্তা রামবিরহব্যাকুলা সীতা মূর্ত্তি। কলবাহিনী সরযু আজও বহন করে ফিরছে যাঁর করুণ বিরহ গাঁথা··· আবার নদীয়ার বুকে দ্বারে দ্বারে যখন চলেছে গৌরচন্দ্রের কৃষ্ণপ্রেম-ভিক্ষা, অশ্রুজলের রাগিনীতে বেজে উঠেছে কৃষ্ণবিরহের গভীর মূর্চ্ছনা, তখন তারও অনুতে অনুতে বুঝি জড়িত ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরপ্রীতি; তাঁর বেদনমথিত অন্তরে গভীর দীর্ঘশ্বাস।

যুগপ্রয়োজনে চলেছে যুগলীলা। তাই এবার যখন পঞ্চবটীর গহনকানন মুখরিত করে সমন্বয়ের পাঞ্চজন্য হাতে এসে দাঁড়ালেন যুগ-নারায়ণ শ্রীগদাধরসুন্দর তখন তাঁর পাশে তাঁরি লীলার অনুবর্ত্তিনী রূপে আবির্ভূতা হ'লেন যুগের বরাভয়দাত্রী জননী সারদা, যুগনারায়ণের যুগলক্ষ্মী। তাঁ'দের যুগল চরণচিহ্ন চুম্বন করে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল দ্বাদশটী স্বর্ণকমল···আর জাগরনোন্মুখ হ'য়ে উঠল ভারত তথা সারা বিশ্বের স্তিমিত চেতনা।

উচ্ছলিত সুরধুনীর কূলে সেদিন নেমে আসে আলোয় ভরা রাত্রি, আসন্ন দোলপূর্ণিমার পূর্ব্বাভাষ নিয়ে···বসন্তপবনমর্ম্মরিত কুহুমুখরিত

পঞ্চবটী···আলোকস্নাতা সুরস্রোতস্বিনীর বুকে অজানার আবেগ··· কার চরণ ধ্বনি সিঞ্চিত সে সুর কে জানে···। সহসা দেখা যায়, জাহ্নবীর চঞ্চল স্রোতে ভেসে আসে একখানি ক্ষুদ্র তরণী—ধীরে অতি ধীরে সে তরী এসে ভীড়ল বকুলঝরা শ্যামল তটে···আর সঙ্গে সঙ্গে কূল থেকে শোনা যায় ঠাকুরের মধুর দরদী কণ্ঠ—"ও হৃদু, বারবেলা নাই তো? প্রথমবার আসছে?"—তরণী থেকে ধীরনম্রপদে নেমে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী—জননী সারদেশ্বরী আর তাঁর দেবজনক—শ্রীরামচন্দ্র!

সেদিন জননীর বরণশঙ্খ বেজে ওঠে নাই দেউলে দেউলে··· পুরবাসিগণ আনেনি বেদনাসিক্ত অর্ঘের ডালা···শুধু নীরব বটের-বীণা ধরেছিল জননীর শুভ আবাহনী। এদিকে···চির দরদী ঠাকুরের আচরণে দরদহীনতার কোন লক্ষণই খুঁজে পান না কিশোরী জননী। মিটে যায় সকল দ্বন্দ্ব, সকল অবুঝ ব্যথা, অভিমান—ভরে ওঠে আনন্দের পূর্ণঘট, বৈষ্ণব কবির ভাষায় "ডুবহি ডুর ডুরভান।"

শিশু ভোলানাথ ঠাকুর বলেন "এতদিনে এলে, আর কি আমার সেজবাবু আছে, যে যত্ন করবে?" আর তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাও হয় থাকবার। আপন শ্রীমন্দিরেই হল সে ব্যবস্থা।

এদিকে চলে সমানছন্দে অপরূপ সাধনলীলা···গভীর রাত্রে কখন দেখা যায় ব্যাকুলা জননী সারদা জেগে ব'সে আছেন সমাধিমগ্ন নিথর দেবমূর্ত্তির পানে চেয়ে······বিহ্বল আঁখি অজানা ভয়ে ভরা, কখন বা ছুটে আসেন বাইরে, অশ্রুসজল আঁখি—ভীতব্যাকুলকণ্ঠে ডাকেন ভাগিনেয় হৃদয়কে। বালিকার মত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, সমাধি অচল দেবতাকে কেমন ক'রে যায় জাগানো,—বহুবার সমাধি দর্শনে অভ্যস্ত, হৃদয় ছোট্ট মামীটিকে শেখান কোন্ সমাধিতে কি নাম শোনাতে

হবে। তবু বালিকার মত প্রায়ই গভীর আশঙ্কায় কাটে জননীর বিনিদ্র রজনী···ঠাকুর জানতে পেরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন থাকবার। নহবতে জননী চন্দ্রার নিকট করেন প্রেরণ কিশোরী জননীকে। আবার কখন দেখা যায় জননী সারদা—সাজিয়ে দিচ্ছেন শ্রীঠাকুরকে অপরূপ রমণীবেশে। শ্রীঅঙ্গে পরিয়ে দিচ্ছেন নানা অলঙ্কার, বহুমূল্য বাস—। ভাবময় ঠাকুরের ভাবে ভাবিতা, তদ্‌গতচিত্তা মাও যে তখন ঠাকুরেরই মত জগজ্জননীর একান্ত সেবিকা—দাসী—ঠাকুরের সখী—ঠাকুরের কথায়—"দুজনেই মার সখী" এমনি চলে কত শত নিত্য নূতন দিব্য ভাবের লীলা, যা ভারত তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে চিরনূতন···।

আরও একদিনের কথা—ঠাকুর ভাবে বিভোর, ছোট খাটটিতে বসে আছেন···মা একটি গৃহকর্ম্মরতা বধূর মতই পরিষ্কার করছেন ঠাকুরের মন্দির। সহসা মা করেন প্রশ্ন; "আমি তোমার কে?" দিব্যশিশু সুন্দর হাসি হেসে ঠাকুর দেন উত্তর,—"তুমি আমার মা আনন্দময়ী।" এই সময় আরও একদিন শয়ননিষণ্ণ ঠাকুরের শ্রীচরণদুটি সেবা করতে করতে আবার মা করেন প্রশ্ন, "আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?" মাতৃবক্ষবিলাসী ঠাকুরের কণ্ঠে বেজে থাকে—

সেই একই উত্তর, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন, আর সম্প্রতি নহবতে বাস ক'রছেন। সেই তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ ব'লে তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্যই দেখতে পাই।"

এই বাণী ঠাকুরের শ্রীমুখ হ'তে এক বার নয় দুইবার নয়, পাওয়া যায় বহুবার, বহুরূপে।

সেবক ভাগিনেয় হৃদয়রাম শ্রীঠাকুরকে প্রাণঢালা সেবায় পরিতৃপ্ত করলেও কিছু রুক্ষস্বভাবের জন্য ভৎর্সনা তিরস্কারও লাভ করেছেন মাঝে মাঝে "খাদ না থাকলেও ত' গড়ন হয় না"—শ্রীঠাকুরেরই কথা। তাই কখন কখন দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য ভক্ত হৃদয়রামকে ঠাকুরকে তিরস্কার বা মিষ্ট কথায় সাবধান করে দিতে হয়েছে। একবার তাঁর উমামহেশ্বরী ছোট মামীটির প্রতি হৃদয় দুর্বিনীত ব্যবহার করে বসেন। সাবধান করে দেন ঠাকুর, সেবকের অমঙ্গল আশঙ্কায়, "ওরে সাবধানে কাজ কর। উনি যদি রুষ্ট হন তা হলে আর রক্ষা নাই।" অনির্ব্বচনীয় যে শক্তি—তাকে ধরা ছোঁওয়ার মাঝে আনতে, তাঁকে চিনতে, তাঁকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে এমন সাধ্য আছে কার? একমাত্র ব্রহ্ম সে অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে ধারণ এবং ধারণা করতে পারেন।—তাই ব্রহ্মস্বরূপ ঠাকুরই একমাত্র মাকে দিয়েছেন পূর্ণ মর্য্যাদা, চিনতে পেরেছেন তাঁর গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন স্বরূপ "ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।"—মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের গোলাপমার প্রতি এই গভীর উক্তি।

এ শুধু মুখের কথা নয়; যুগদেবতা নিজের দিব্য জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দিয়ে গেছেন তার শত প্রমাণ…।

নিবিড় গভীর অমানিশা—১২৮০ সাল ১৩ই জ্যৈষ্ঠের এক রহস্যময়ী রজনী নেমে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে তথা সারা বিশ্বের প্রাণতটে…এক অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত অনুভূতির শিহরণ নিয়ে, লক্ষ তারকার বিস্মিত আঁখি মেলে চেয়ে আছে আকাশ, কি যেন এক মহান্ দিব্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যাবে। যা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় চির নূতন…

স্তব্ধ হয়ে কানপেতে আছে বনের বাতাস,—কার বেদনিষিক্ত কণ্ঠে

শুনবে নবদেব্যাস্তুতি···আর দক্ষিণেশ্বরে···তার রূপ সেদিন অতুলনীয় —ধ্যানে গম্ভীর পঞ্চবটী···শান্ত মন্থর অথচ কলস্বনা সুরধ্বনি···ধূপ সৌরভে, মালা আর পূজাসম্ভারে পরিপূর্ণ মাতৃদেউল···দেবীর শ্রীঅধরে চিররুচির হাসি। ফলহারিণী কালীকাপূজা···কি যেন এক গভীর ভাবে থমথম করছে শ্রীঠাকুরের শয়ন মন্দির, সেখানে আজ যেন সবারই প্রবেশ নিষেধ···। ভাবে আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন শ্রীঠাকুর একা— মাতৃপ্রেমে গরগর দেবতনু—আধো সমাধিলীন নেত্রে। কেবলমাত্র ভক্ত দিনু আজকে মহানিশার গোপন পূজার আয়োজনে করতে পেয়েছে প্রবেশাধিকার। কিছুক্ষণ পরে সেও যায় চ'লে, আরো ঘনায়িত হ'য়ে আসে তমোময়ী রাত্রি, ধীরে ধীরে মন্দিরদ্বারে এসে দাঁড়ান বিশ্বের অশুভফলহারিণী জাগ্রতপ্রতিমা জননী সারদেশ্বরী—। শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতআহ্বানে এসে উপবিষ্ট হন দক্ষিণপার্শ্বের শুভ্র আলিম্পনমণ্ডিত আসনে, সুরু হয় অপূর্ব পূজা···পূজারী শ্রীঠাকুর— পূজ্যা শ্রীশ্রীমা···অভিবেকান্তে ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল আবাহন মন্ত্র, "হে বালে, যে সর্ব্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ, ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার শরীর মনকে পবিত্র করে এঁতে আবির্ভূত হয়ে সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর। পুষ্পচন্দনে ভরে ওঠে জননীর শ্রীচরণ প্রান্ত—নিবেদিত হয় ভোগ···আধো ভাব-অতলে জননী উমামহেশ্বরী গ্রহণ করেন শিশু মহেশের পূজাঅর্ঘ, ধীরে ধীরে উভয়ে ডুবে যান গভীর সমাধির সপ্তসাগরে, সারা দক্ষিণেশ্বর যেন থম থম ক'রে ওঠে··· প্রহর অতীত হয় রাত্রির তৃতীয় প্রহরে—মন নেমে আসে ধরণীর নর্ম্মলোকে—সমাধির সপ্তলোক হতে···আত্মনিবেদনে হয় পূজার সমাপ্তি। সাধনায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় যা কিছু, জপের মালা-বস্ত্র, আভরণ, আর তার সঙ্গে বিল্বপত্রে অঙ্কিত নিজ নাম—সব কিছ হল

নিবেদিত দেবীর শ্রীচরণপঙ্কজে—সমাপ্ত হল রহস্যময়ী ষোড়শী পূজা—সুরু এসে মিলিত হল সমাপ্তিতে···সর্ব্বসাধনার পথরেখা এসে মিলিত হল চরম পরম পথতটে—সর্ব্বসিদ্ধি মিলিত হল এক মহতোমহীয়ান দিব্যাতিদিব্য চরম সিদ্ধিতে···প্রতিষ্ঠিত হল সাধনার শেষ কথা মহামাতৃভাব—যুগলীলার সাধ্য···

মৃত্যুর কাছে জীবনের বুঝি চিরপরাজয়। তাই কবির কাছে মরণ পেয়েছে মহামরণের স্থান। তবে দেবমানবগণের কাছে মরণ অনন্ত, বৃহত্তর জীবনস্বরূপ, সেখানে মৃত্যু মরণমোহন শ্যামস্বরূপ। তাই দেব-মানবগণের আবির্ভাবের মত তিরোধান দিবসও ধরণীর ধুলায় হয়ে থাকে বিশেষ স্মরণীয় তিথি। কোনো কোনো মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায় হয়তো বিশেষ এক দেবউৎসবের আনন্দমুখরিত দিবসে হয়েছে তাঁদের দিব্য জীবনের অবসান। ১২৮০ সালের পুণ্য রামনবমী তিথিতে শ্যামার দীনসংসারে এক দুর্য্যোগময় দিন। সেদিন পুত্র কালী মারের উপনয়নের চতুর্থ দিবস, আর সেইদিনই আজীবন শ্রীরামভক্ত শ্রীরাম-সেবক রামচন্দ্র ইষ্টচরণান্তিকে নিলেন চিরআশ্রয়। জ্যোতির সায়রে দীপ শিখার মত মিলিয়ে গেল তাঁর ক্ষুদ্র জীবনশিখা। পিছনে পড়ে রইল শত অভাবতাড়িত ক্ষুদ্র সংসার···শ্যামার দীনআকৃতি—আর সংসারজ্ঞানভিজ্ঞ কয়েকটি নাবালক বালক···এই সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর চিরআদরিণী দুহিতা···মুক্তিদাত্রী জগন্মাতা···! শ্রীরামচন্দ্র যেন

তাঁরই স্নেহচ্ছায়ে সমর্পণ করে গেলেন আপনার যথাসর্ব্বস্ব। জননীকেও দেখি আজীবন আপন আশ্রয়েই রেখেছিলেন এই সংসারটিকে। তবে মানবী রূপে লীলা করতে এসে তার সবটুকু ছলই করতে হয়, তাই আদরিণী দুলালীর মতই জনকের দেহাবসানে মা হয়ে পড়লেন শোকাকুলা।

শ্রীঠাকুরের কথা "থিয়েটারে যে রাজা সেজেছে সে রাজার মতই ব্যবহার করবে।" আরো বলেছেন, "দেখছ না রাম সীতার জন্য মায়ায় কাঁদছেন।" এ যুগের লীলা যে এত গোপন তার কারণ এই আপনার কাছেও আপনাকে গোপন করা ভাব।

এই সময়ে জননী সারদা পিত্রালয় হতে চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জননীর সান্নিধ্যে—নহবতের সেই ছোট্ট ঘরখানিতে। অত্যধিক ছোট্ট ঘরখানিতে দুজনের বাস অসম্ভব চিন্তা ক'রে চিহ্নিত ভক্ত রসসর্দ্দার শ্রীশম্ভুমল্লিক ক্রয় করলেন কিছু জমি, ভবতারিণীর পুরীর নিকটেই, আর শ্রীঠাকুরের অপর একটি ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—শ্রীঠাকুর স্নেহভরে যাঁকে ডাকতেন কাপ্তেন,—তিনি দিলেন কিছু শাল কাঠ—তাই দিয়ে নির্ম্মিত হ'ল একটী চালা ঘর। আর তাতেই শম্ভুমল্লিক নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণজননীকে আর, তার সাথে নিয়ে এলেন জননী সারদাকে। নিযুক্ত হল পরিচারিকা, জননীর সারাদিনের কর্ম্মসূচীতে সহযোগিতা করতে। শ্রীঠাকুরের প্রথম লীলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি ভক্ত রসদ্দার যোগ দিয়েছিলেন গোপন লীলার বৃন্দাবনে, তাঁদের মধ্যে শ্রীশম্ভু মল্লিকের আছে যেন একটি বিশেষ স্থান—বিশেষ করে ভক্তি-বিশ্বাসের দিক দিয়ে—তাই দেখি প্রতি মঙ্গলবার ভবতারিণীর পূজার প্রশস্ত দিবসটীতে চিন্ময় দেহে অবস্থিতা জননী সারদাকে আকুল আহ্বানে আনয়ন করেন স্বগৃহে—আর তিনি এবং তাঁর

সাধ্বী পত্নী, উভয়ে ভক্তিঅর্ঘে ষোড়শোপচারে পূজা করে জননীর শ্রীচরণপঙ্কজ। কথামৃতের স্থানে স্থানে তাই বুঝি ঠাকুর নিজমুখে দিয়ে গেছেন ভক্তের ভক্তিবিশ্বাসের বহু পরিচয়।

তাঁরি নির্ম্মিত এই ছোট্ট চালাঘরখানি হয়ে ওঠে যেন নারায়ণের ভোগমন্দির। নিত্য নানা উপচারে ভোগ রন্ধন করেন স্বয়ং লক্ষ্মী-রূপিণী জননী। রন্ধনান্তে স্বহস্তে ভোগ সজ্জিত করে নিয়ে যান শ্রীঠাকুরের মন্দিরে, নিজে বসে ভোগ নিবেদন করে আসেন জাগ্রত নারায়ণকে।—

এমনি ভাবে কেটে যায় একটী বৎসর দেবসেবায়···এরপর শারিরীক অসুস্থতায় মাকে ফিরে আসতে হয় আপন পিত্রালয়ে। তখন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাস।—

সারা যুগের আকুল হাতছানিতে যাঁদের আবির্ভাব, তাঁদের ত' চলে না একটী কি দুটী কর্ম্মের বন্ধনে বাঁধা থাকা। সারা যুগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজন যে তাঁদের ডাকছে কাতর কণ্ঠে···সকল ডাকেই জেগে ওঠে তাঁদের সাড়া...তাই তাঁদের দেব জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির ভিতরেও নিহিত থাকে এক একটি মহান্ উদ্দেশ্য···

জয়রামবাটীর গ্রাম্য দেবী সিংহবাহিনী দেহস্থিতা চিন্ময়ী দেবীর লীলা নিকেতনের দেবীমূর্ত্তি—অখ্যাত হয়েই ছিল তাঁর দেবমাহাত্ম্য। পাশের গ্রামের অধিবাসীদেরও অনেকে জানেন না তাঁর কথা—তাই নিত্য নতন

দূরাগত ভক্তের পূজাউপচারে ভরেও উঠত না মন্দির প্রাঙ্গণ। এবার তাই বুঝি তাঁকে জাগ্রত করতে জননী আপন দেহে নিলেন কঠিন রোগ। পিত্রালয়ে ফিরে মা'র দেব-দেহ রোগের পুনরাক্রমণে হয়ে পড়ল শয্যালীন···। দিন যায় কিন্তু রোগ শান্তির কোন লক্ষণই যায় না দেখা। অবশেষে সিংহবাহিনীর পূজামণ্ডপে দেখা যায় জননী সারদা পড়ে আছেন হত্যা দিয়ে। বেশীক্ষণ নয় মাত্র পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হতে না হতে চিন্ময়ী দেহস্থিতা দেবীর চৈতন্যে মৃন্ময়ী দেবী জাগ্রতা হয়ে ওঠেন, আকুল হয়ে বলেন "তুমি কেন পড়ে আছ গো?" এবং রোগের ঔষধরূপে নির্দ্দেশ দেন নিজ মন্দিরের তলতলার মৃত্তিকা।···

দেবমাহাত্ম্যের অন্যান্য ঘটনাও পাওয়া যায়···এমন কি, সর্পাঘাত-গ্রস্ত ব্যক্তির বিষ নেমে যায় দেবীর মৃত্তিকাগুণে। ধীরে ধীরে গ্রামে গ্রামান্তরে গিয়ে পৌছয় ওই বার্ত্তা···। ছুটে আসে আর্ত্তভক্তের দল পূজাউপচারে। ভক্তসংখ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণ নিত্য হয়ে থাকে পরিপূর্ণ···।—এমনি করেই তো যুগে যুগে হয় শত শত দেব বিগ্রহ শত শত তীর্থের প্রতিষ্ঠা···তাইতো আজও ভারত দেবতার লীলা পীঠ।

অভাবগ্রস্ত দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসার—এ যেন বঙ্গজননীর একটী বিশেষরূপ···। তবু তারি মাঝে থাকে সাধ—থাকে আশা—থাকে কল্পনার জাল বোনা···এই নিয়েই মানুষ মরেও থাকে বেঁচে।

শ্রীরামচন্দ্রের দেহান্তে অন্যান্য দরিদ্র সংসারের মতই হল জননী সারদার পিতৃগৃহের অবস্থা···। অপ্রাপ্তবয়স্ক কয়েকটি নাবালক··· কোন উপার্জ্জনও নাই···যাজনলব্ধ আয়ের পথও রুদ্ধ···জমিতে লোকাভাবে হয় না প্রচুর ধান্য উৎপন্ন···যেদিকে দৃষ্টি পড়ে শুধু অভাবের করাল মূর্ত্তি···। দেবকন্যা আর দেবমাতা নিজেরাই ধরেন হাল। গাঁয়ের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাঁড়ুয্যে,—মা শ্যামাসুন্দরী তাঁদের এক আঢ়া

করে ধান দেন ভেনে…লাভ হয় চার কুড়ি ধান…তাইতেই হয় দিনাতিপাত।…দুঃখের মাঝে কাটে দিন…। রাত্রি যত হয় গভীর, তত সে যায় প্রভাতের দিকে এগিয়ে। দুঃখও চরমে পৌঁছলে বুঝতে হবে সুখের বুঝি আর দেরী নাই…।

সেবার নব মুখুয্যে নামী গ্রামের জনৈক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শ্যামা-সুন্দরীপ্রদত্ত চালগুলি নিলে না—কালী পূজার সময় দেবীর পূজার কাজে লাগাতে…। ভক্তের প্রাণে বাজে ব্যথা…নিবেদিত অর্ঘ্য তা'হলে দেবী গ্রহণ করলেন না—অশ্রুধারায় অঞ্চল যায় ভিজে। দীন আকুতিতে অন্তর ওঠে হাহাকার করে…বলেন, "কালীর জন্যে চাল করেছি, আমার চাল নিলে না, এ চাল আমার কে খাবে ?" সারা রাত্রি ধরে বাঁধনহারা হয়ে ঝরে অশ্রুধারা। অবশেষে সে অশ্রু মানে বাঁধ, যখন শ্রান্তি-ক্লান্তিহরা আপনি এসে দাঁড়ান আধো তন্দ্রালোকে ; শ্যামা-সুন্দরী দেখেন বিস্ময়ে রক্তবর্ণা দেবীমূর্ত্তি সান্ত্বনাপূর্ণ করাঘাতে তাঁকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, তুমি কাঁদছ কেন ? "কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি ?"

বিস্ময়ে বিহ্বলতায় শ্যামামা করেন প্রশ্ন, "কে তুমি ?" মধুর হাস্যের সঙ্গে দেবীকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "এই যে গো এর পরেই যার পূজো।" নিশা হয় অবসান। তার সঙ্গে দুঃখনিশার অবসানেরও বুঝি পূর্ব্বাশা যায় দেখা। শয্যা ত্যাগ করে দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লাল রং, পায়ের ওপর পা—ওকি ঠাকুর জগদ্ধাত্রী ? আমি জগদ্ধাত্রী পূজো করব।"

মা'র মুখের কথা তাঁর দেবজননীর প্রসঙ্গে যে, "জগদ্ধাত্রী পূজো করব, জগদ্ধাত্রী পূজো করব একটা বাই হয়ে গেল।" যাই হোক, দীন সংসারে শত দুঃখ, বাধার ভিতর দিয়ে হয় পূজার আয়োজন।

বিশ্বাসদের কাছ থেকে দু আড়া ধান হল আনা—কিন্তু ধান শুকোবে কেমন করে? চারিদিকে তখন ঘোরঘনঘটা—প্রবল বৃষ্টিপাত। নিরুপায় জননী শ্যামা যেন আরও হয়ে পড়েন উপায়হীন—কিন্তু জগদ্ধাত্রী যেখানে কন্যারূপে হয়েছেন আবির্ভূত, সেখানে কাঁটার মাঝে কমল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবেই। তাই জননী শ্যামা অশ্রুভরা চোখে দেখেন চারিদিকে প্রবল বৃষ্টিধারা, কিন্তু তাঁর ভাঙ্গা কুঁড়ের ধানের চাটাইতে এসে পড়েছে একটুকরো সোনালী কিরণময়ী রৌদ্রের ধারা। আবার দেবী প্রতিমার ব্যবস্থাও হয় দিব্য প্রেরণায়। শিওর গ্রামের কুঞ্জমিস্ত্রী, সেই গড়ে যত দেবদেবীর মূর্ত্তি। সহসা সেদিন তার কাছে সাধারণ একটি গ্রাম্য রমণী বেশে কে যেন এসে তাঁকে করলেন আদেশ, "জয়রামবাটীর প্রসন্ন মুখুজ্যের ঘরে হবে দেবীপূজা, সেই দেবীমূর্ত্তি গড়তে তাকেই যেতে হবে।" ছুটে আসে মিস্ত্রী—এদিকে বিন্দুমাত্রও কিছু জানেন না শ্যামাসুন্দরী। তিনি বিদুরের খুদকুড়োয় রিক্ত ডালা সাজাতেই রত, চিন্তা—কেমন করে জগৎজননীকে এই রিক্ততার মাঝে এনে তাঁকে প্রাণের সেবায় করা যায় পরিতুষ্ট। আবেগে করেন প্রশ্ন, —"কে গেছল তোমাকে বলতে। উত্তরে মিস্ত্রী বলেন, আপনারা যে একটি মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন।"

চোখ হতে রহস্যের যবনিকা যায় খসে। সকলেই বুঝতে পারে দেবী জগৎজননী নিজেই গিয়েছিলেন তাঁর প্রতিমা নির্ম্মাণের আদেশ দিতে। স্থূলভাবে যে সংসারটির সুখেদুঃখে নিজেকে রেখেছেন জড়িয়ে, সূক্ষ্মেও সেই সংসারটির সকল ভার যে তাঁকে নিতে হবে, সেতো কিছু আশ্চর্য্য নয়। যাই হোক, সেই প্রবল বাদলভরা দিনে মূর্ত্তি হল নির্ম্মাণ এবং মূর্ত্তি রঞ্জিত করা হোল কাঠের আগুনে সেঁকে। দূর দখিণাপুরে খবর পৌছায়। মাতৃপূজার সংবাদে ভাবে বিভোর ঠাকুর পরমানন্দে

বলেন, "মা আসবেন, মা আসবেন। বেশ বেশ। তোদের বড় অবস্থা খারাপ ছিল যেরে?"—মায়ের আগমণী আরও মধুর করে তুলতে শ্রীঠাকুরকে আহ্বান জানান প্রসন্নমামা—মায়ের ভাই। "আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম।" ঠাকুর উত্তরে বলেন, এই আমার যাওয়া হ'ল। যা বেশ পূজো করগে। বেশ বেশ, তোদের ভাল হবে।" শ্রীমুখচ্যুত করুণার আশীষ হয়েছিল পূর্ণ।

সমারোহের সঙ্গে সমাপন হল মাতৃপূজা—দেশের লোক—আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে গ্রহণ করলে প্রসাদ পরিপূর্ণভাবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ চালেই সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হয়ে গেল অতি সহজ ভাবে।…বেজে ওঠে বিসর্জ্জনের বাজনা। ভক্তের অন্তরে আসে বিষাদের বন্যা…অশ্রু-উছলিত চোখে জননী শ্যামা জগদ্ধাত্রীর কানে কানে বলেন অতি সংগোপনে, "মা জগাই আবার আর বছর এসো—আমি সমস্ত বছর ধরে তোমার জন্যে সমস্ত যোগাড় করে রাখব।" এমনি বুক নিঙড়ানো আকুলতা, এমনি আঁকড়ে ধরা বিশ্বাস না হ'লে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী কন্যা-রূপে আসবেন কেন—ভাঙ্গাকুঁড়েতে। পরের বছর জননীর কি লীলা জানি না? হয়তো পরীক্ষা, না হয় সংসারের অসচ্ছলতার কথা ভেবে বলেন "একবার পূজা হ'ল আবার কেন?" রাত্রে জননী সারদা নিজে দেখেন স্বপ্ন, জগদ্ধাত্রী জয়া বিজয়ার সাথে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন চলে। বলছেন "আমরা তবে যাই।" তিনবার এইকথা বলার পরই গল-লগ্নকৃত বাসে জননী সারদা ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে বলেন, "না না, তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলি নাই।" একই শক্তির নানা রূপের বিলাস, এই দেবলীলা,—সাধারণ বুদ্ধি এখানে মূক হয়ে যায়। শুধু একেরই লীলা ছাড়া আর কোন কথাই চলেনা। এই জগদ্ধাত্রী পূজার সময় একবার জননী সারদা বসেছিলেন দেবীমূর্ত্তির

সম্মুখে। ধ্যানসমাহিত দেবতনিম্মা—সম্মুখে স্থিত প্রতিমার মত নিশ্চল স্থির। গ্রামবাসী বৃদ্ধ একজন ঠিক এমনি সময়ে এসে উপস্থিত প্রতিমা দর্শন করতে। সুরু হয় দেবলীলা—বৃদ্ধের নয়নে লাগে ধাঁধা—চিন্ময়ী মৃন্ময়ী ভেদ যায় হারিয়ে। দিব্য চেতনা, তার অন্তরের মোহ আবরণ যায় খসে। ভীত, বিস্মিত, সন্ত্রস্ত হ'য়ে সে বার বার চেয়ে দেখে একই স্বরূপ দুটি দেবী প্রতিমার দিকে, অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অবশেষে অসহ্য হয়ে ওঠে এই দিব্যানুভূতি। বৃদ্ধ ভীত ব্যাকুল হ'য়ে সেখান হতে পালাই ছুটে। অথচ প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় শ্যামার ঝিয়ারীকে আসতে হ'ত—মার পূজার বাসন মাজতে। অবশেষে মায়ের কথা—"ছেলে যোগীন সব কাঠের বাসন করে দিয়ে বল্লে, "মা তোমাকে আর বাসন মাজতে হবে না। জগদ্ধাত্রী পূজোর জমিও করে দিলে।" এই থেকে চলতে লাগল মার পূজা, বৎসরের পর বৎসর। এমন কি পরবর্ত্তী কালে জনৈক ভক্তের প্রতি মায়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় যে, দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে তাঁর কর্ণআভরণ একটি খুলে রাখা যেন হয়—জননী জগদ্ধাত্রী তাহলে সেইটি মনে করে আবার আসবেন। মায়ের প্রচলিত সেই প্রথাই তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রথাস্বরূপে দাঁড়িয়ে গেছে। সরল বিশ্বাসী ভক্তের মাকে আবার ফিরিয়ে আনবার একটি সহজ উপায় এই। দুর্দ্দিনভরা যুগে মায়ের জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী রূপ যে ছেলেদের একান্ত প্রয়োজন—কি চিন্ময় দেহে কি চিন্ময় বিগ্রহে সব রকমে······

সহস্রদল কমল যখন ফুটে ওঠে পূর্ণ বিকাশের লীলায়, তখন তার সব কটী দলই ত হয় তার রূপ বিকাশের অনুকূল...এমনি যখন মর্ত্ত্যের বুকে ফুটে ওঠে অমর্ত্ত্যের লীলার কমল, তখন তাঁরও সব কটী দলই হয় লীলা বিকাশের অনুকূল...ছোট বড়র প্রশ্ন এখানে নীরব...।

খুব সম্ভব তখন ১২৮৩ সালের শীতকাল; দেব জননী চন্দ্রা তখন নরদেহের অবসানে অমৃতলোক বাসিনী...জননী সারদা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে সেই ভক্ত নির্ম্মিত পর্ণকুটীরে...কিন্তু সেখানে অধিক দিন হয়না থাকা, দেবতার সেবায় যে অসুবিধা হচ্ছে। শ্রীঠাকুরের দেবদেহে তখন আশ্রয় নিয়েছে কঠিন আমাশয় রোগ...লীলায় মন রাখবার এ এক অদ্ভুত পন্থা—ঠিক এই সময়েই কোথা হ'তে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন এক স্বরূপিনী প্রাচীনা...পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন তিনি কাশীবাসিনী...এসেই কারো আপত্তি অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই স্ব ইচ্ছায় তুলে নেন শ্রীঠাকুরের দেবতনুর সেবা নানাপ্রকারে ...আর সেই সঙ্গে বহু চেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট নহবত রূপ ছোট্ট দেবয়াতনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন জননী সারদাকে...।—দিব্য মাধুর্যে পরিপূর্ণ এই রামকৃষ্ণলীলা...শ্রীশ্রীমা তখনও শ্রীঠাকুরের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবতী গ্রাম্য বধুটী শ্রীঠাকুরের সেবার সমস্ত কাজের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে রেখেও যেন রেখেছেন নিজেকে প্রচ্ছন্ন...আড়ালের অবগুণ্ঠনে...।—যেখানে যত আপন সেখানে তত গোপন।

দিব্য প্রাচীন ভক্তটির প্রাণে তা সয়না। তাই সেদিন যখন ধরার

চোখে ঘনিয়ে এল. নিশিথিনীর ঘুমের চুনা···তারার আলোয় আধো আঁধারে আকাশের বুকে আর ধরণীর বুকে রচনা হয়েছে দীর্ঘ ছায়া পথ···ঠিক এমনি মহানিশার লগ্নে প্রাচীনা ভক্তিমতী কাশীবাসিনী নিয়ে এলেন জননীকে আহ্বান করে···শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে আর উন্মোচন করে দিলেন তাঁর অবগুণ্ঠন···চিরদিনের দিব্যশিশু ঠাকুর আর চির-দিনের আদিভূতা সনাতনী জগন্মাতা জননী সারদা···এই পরিচয়েই যে হয়েছে এবারের লীলা সুরু, তাই মহানিশায় মাতৃদর্শনে ভাবে বিভোর, তন্ময় হয়ে সুরু করলেন মধুর ভাগবতী প্রসঙ্গ। সেখানে নীরব নিস্তব্ধ ঠাকুর আত্মহারা শ্রোতা জননী আর তার সঙ্গিনী…। দীর্ঘদিন গেছে চলে সেদিন জানিয়ে দিলেন অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষারী ভোলানাথ আজ অন্নপূর্ণা এসে দাঁড়ালেন শিবের দ্বারে চক্ষে কুণ্ঠাজড়িত মৌন মিনতি বহুদিনের অদর্শনের দেবতারও প্রতিশোধ আছে। আছে লীলার অবস্থা। মুহূর্ত্তের পদক্ষেপে কেটে চলে রাত্রি প্রভাতের পানে মুখ রেখে…ধ্যানসমাহিত শ্রীমন্দিরে তার কোন ছায়াপাতই হয়না, সেখানে সেই এক ভাবেই চলে দিব্য আলাপন···তিনজনেই দণ্ডায়মান…তিনজনেই ভাবসাগরে ডুবু ডুবু…। কখন যে রাত্রি হয়েছে প্রভাত…কখন খুলে গেছে দেবালয়ের দ্বার, কখন যে এসেছে পুষ্পচয়ন ছলে সেবকের দল, সে খেয়াল নেই কারোরই…মর্ত্তের কালের মাপ হারিয়ে যায় কালাতীতের কালের মাপে…। তাই কি পুরাণে শুনি আমাদের যুগ কেটে গেলেও তখন ব্রহ্মের এক মুহূর্ত্ত হয় না পুরো…। এমনি ভাবে সেদিন কেটেছিল সারাটি রাত, প্রভাতের আলোয় হুঁস ফিরে এলে ফিরে এসেছিলেন মা আপনি কর্ম্মমন্দিরে…নহবতে…।

এর কয়েক বছর পরের কথা…কিছুদিন পিতৃভবনে অতিবাহিত করে ফিরে আসছেন মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে…সঙ্গে জননী শ্যামাসুন্দরী

...ঘাটে এসে লাগলো ছোট্ট তরীখানি...কোথায় ছিলো ভাগ্নে হৃদয়-রাম এল ছুটে···স্বভাবরুষ্ট সেবক...। কি জানি মহামায়ার কি অচিন্ত্য মায়া...সহসা চিরসেবক হৃদয় যেন হয়ে গেল অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, ক্রোধে অন্ধ, দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য...তার তীব্র অপমানভরা বাক্যবাণ বর্ষিত হতে লাগলো জননী শ্যামাসুন্দরীর উপর। অপমানে জর্জ্জরিতা শ্যামাসুন্দরী অভিমানে আহত হয়ে বলেন "এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব।" আর আমাদের কোমলা জননী? তাঁর অবস্থা? যেন বেগপ্রতিহত তরঙ্গিনী···একটি চরণ কূলচুম্বিত জলতটে স্পর্শ করে মূক স্তম্ভিত, কবির ভাষায়...

মার্গাচল ব্যাতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ···

আর চেয়ে দেখেন দেবদয়িত সম্মুখে...সমাধি গম্ভীর সদাশিব... সাক্ষীস্বরূপ আছেন দাঁড়িয়ে...দৃষ্টি সমাহিত, যেন ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ত্রিকালের ছায়া পড়েছে সে দ্রষ্টার দৃষ্টিতে...বুঝি বুঝেছিলেন হৃদয়ের জীবনের অন্য পরিচ্ছেদ সুরু হবার এইটিই আদি সূচনা.........। কালিদাসের কাব্যে মিলনান্তে হয়েছে সমাপ্তি, কিন্তু এখানে হল বিচ্ছেদের ব্যথায়...অপমানে লাঞ্ছিতা জননী ফিরে গেলেন···শুধু ভবতারিণীর চরণ কমলে রেখে গেলেন একটু সজল মিনতি "মা আবার যদি আনাও তবেই আসব।" ফিরে গেলেন জননী, কিন্তু কিছুদিন পরেই পেলেন খবর; হৃদয় কোন এক লঘু অপরাধে দক্ষিণেশ্বর হতে হয়েছে বিতাড়িত ...। সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম, অতি গহনগতি মহামায়ার দুরতিক্রমনীয় এই মায়া "ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে" তা না হলে চিরদিনের সেবক সেবার মূর্ত্তপ্রতীক হৃদয় কেন আজীবন এমন একটী

স্বাভাবের বশীভূত হবে...যা তাকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত ক'রে টেনে নিয়ে গেল ভগবানের সেবার রাজ্য থেকে...।

হৃদয়ের পর সেবার ভার পড়ল রামলালের উপর, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালেরও ঘটল পরাজয়..."সেবার পদে পদে ঘটে ব্যাঘাত......। ভাবে বিভোর গোরা রায় কখন হন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কোথাও বা ধূলায় গড়াগড়ি...আহ্বান এল জয়রামবাটীতে শ্যামার মন্দিরে...জননী সারদাকে যেতে হবে দখিণাপুরে...। যে ডাক কোনদিন আসেনি শত চাওয়ায়...আজ অচাওয়া অভিমানে আসে সেই আকুলকরা ডাক... আর আসে বার বার...। বহুদিন পরে যেন আপনহারা দেবতা মুখ তুলে চাইলেন......।

দিবালোকে উদ্ভাসিত প্রান্তর অতিক্রম করে দক্ষিণেশ্বরের পথে চলেছেন কয়েকটী বয়স্থা গ্রাম্য রমণী...অন্তরে গঙ্গাস্নানে পূণ্য অর্জ্জনের অভিলাষ, আর তাঁদের সঙ্গ নিয়েছেন জননী সারদা... তিনি চলেছেন দেব-দায়িতের চরণাশ্রয়ে...সঙ্গে শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম। চারিক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে আরামবাগে এসে উপস্থিত তীর্থযাত্রী দল...এইখানেই রাত্রিবাসের কথা। কিন্তু তখনও দিনের আলো মিলিয়ে যায় নি... অস্তরবি ঢলে পড়েনি অস্তাচলে...। তাই আনন্দচঞ্চল যাত্রীর দল পথের দূরত্বকে আনতে চায় কমিয়ে...নিকটে আনতে চায় দূরকে—

অন্তরতমের ব্যবধান যে নিকট হলেও দূর…। তাই এইখানেই পথ চলার বিরাম না দিয়ে আবার চলা হয় সুরু…। কোথাও তৃণাচ্ছাদিত ক্ষীণ পথরেখা গেছে মিলিয়ে, কোথাও উধাও করা আকাশ ছোঁওয়া প্রান্তর…কখন শুষ্ক কঙ্করময় ভূমি…সকল বাধা সরিয়ে চঞ্চল সুদৃঢ় পায়ে সকলে চলে এগিয়ে…কিন্তু কোমলা জননীর অফুট চরণ দুটি বারবার হয়ে পড়ে ক্লান্ত…। খর দিনতাপে ফুল্ল কুসুম হয়ে যায় শুষ্ক ম্লান বিধুর…তারো চেয়ে কোমল যে চরণ যে চরণের ব্যথা দূর করতে দেবাদিদেব পেতে দেন আপন বিশাল বক্ষ…সে চরণ ধরণীর ধূলায় থেকেও বুঝি চায়না থাকতে……ব্যথা বাজে পদে পদে…। অবুঝ সঙ্গিনীদল, বারবার জননী করে মিনতি দ্রুত চরণক্ষেপের জন্য। সাবধান করে দেন……এ পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে আছে বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা …কিন্তু উপায় কি ?…সকলকে এগিয়ে যেতে ব'লে জননী নিজে ধীরে ধীরে শান্ত পদক্ষেপে ভয়সঙ্কুল পথের পানে চলেন এগিয়ে—সকলকে চলার পথে এগিয়ে দেওয়াই ছিল মা'র স্বভাব সুলভ……কারো কোনরূপ অসুবিধার কারণ হওয়া ছিল স্বভাব বিরুদ্ধ……।

জীবনপথের যিনি দিশারী তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেন সঙ্গিনীর দল। মা'র সঙ্গে রইল কেবল আরো দুটি অক্ষমা—। কিন্তু লীলাময়ীর এমনি লীলা…পরবর্ত্তীকালে দর্শনধন্য ভক্তের মুখে এরূপ কথাও যায় শোনা যে, কোয়ালপাড়া হ'তে জয়রামবাটী চলেছেন তাঁরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। বলিষ্ঠ দেহ নিয়মিত শরীরচর্চ্চায় বেশ পুষ্ট। আর আমাদের বাংলার সজল মাটীর মেয়ে আমাদের মা ; নবনীত কান্ত, করুণ তনুশ্রী…চিরকোমল মাতৃমূর্ত্তি, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই জননীর সঙ্গে পথ চলতে হয়ে পড়েছেন বিব্রত তাঁর বীর বলিষ্ঠ সন্তান দল……… বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁরা দেখছেন মা যেন চকিত চপলার তীব্র গতিতে

চলেছেন এগিয়ে আর তাঁরা পড়ে আছেন বহুদূরে, কোনমতেই ধরতে পাচ্ছেন না জননীর সঙ্গ। শুধু ছলনাময়ী করুণাবশে যেন স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে মন্থর করছেন চরণবেগ, আর আহ্বান করছেন পিছে পড়ে থাকা সন্তানদলকে, কিন্তু তাঁরা নিকটস্থ হ'তে না হতেই আবার সেই বিদ্যুৎগতি জেগে উঠেছে চরণভঙ্গে। জননী চলে যাচ্ছেন তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবশেষে সকলে মিলে যখন এসে উপনীত জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে—তখন বলিষ্ঠ শরীরগুলি অত্যধিক শ্রমে হয়ে পড়েছে একান্ত অচল। আর জননী অফুরণ শক্তি ধারণ করে সন্তানের সেবায় করেছেন আত্মনিয়োগ...ক্ষণমাত্রও বিশ্রামের অবকাশ-টুকু না গ্রহণ করে। দশপ্রহরণধারিণী মা।

বিরাট মাতৃশক্তির কাছে বার বার পৌরুষের অহঙ্কার এমনি করেই হয়েছে পরাজিত, আর জননীর এই নানাভাবের রঙ্গ দেখে মনে পড়ে শুধু ভক্ত কবি রামপ্রসাদের কথা—"মায়ের ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।"

যাই হোক পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সেই বিপদসঙ্কুল প্রান্তর। বিপদ আসে না একা,—সঙ্গে তার থাকে আরো সঙ্গী, তাই সেই ভয়াবহ পথেই নেমে এল সন্ধ্যার গহিন আঁধার। তার শান্ত মধুর ছায়াময়ী রূপ যেন স্থানবিশেষে হয়ে উঠল ভীষণ হতেও ভীষণ—তারি মাঝে শান্ত অভয় চরণে অভয়া চলেন এগিয়ে—। সহসা আঁধারের বুক চিরে জেগে ওঠে ও কার কঠিন পদধ্বনি। জননী সারদা থমকে চেয়ে দেখেন দীর্ঘ বলিষ্ঠাকৃতি এক পুরুষ এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। কালো কষ্টিপাথর কুঁদে গড়া দেহ—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে বালা আর লাঠী। আঁধার কি রূপ নিল নয়ন সম্মুখে...। বুঝতে বাকী থাকেনা, এ সেই বিখ্যাত তেলোভেলার মাঠের ডাকাত ...

আর কেউ নয়—। পরিচয়ের প্রশ্ন আসে—কর্কশকণ্ঠে "কে তুমি ?" প্রান্তর ভয়ে হয়ে ওঠে স্তব্ধ ব্যাকুল, আঁধারে মুখ ডুবিয়ে বার বার ওঠে কেঁপে, কিন্তু পরক্ষণেই একি অপরূপ ভাবান্তর ! জননীর কোমল মধুর শ্রীমুখচন্দ্রের পানে চেয়ে কেন স্নেহাতুর হয়ে ওঠে ডাকাতের হিংস্র কঠোর দৃষ্টি ? কোমল বীণার ঝঙ্কারে নিন্দিত কণ্ঠের উত্তরে রুদ্ধ পাষাণ হৃদয়ের উৎস বুঝি যায় খুলে ! "বাবা সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে—আমি পথ হারিয়েছি ; তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।" কথার মাঝে এসে পড়ে আর একটি রমণী। জননীর বুঝতে বাকী থাকে না আগন্তুক রমণী ডাকাতেরই সহধর্ম্মিনী—ক্ষণবিলম্বের প্রয়োজন হয় না। সঙ্গে সঙ্গে আপন পবিত্র করকমলে তার হাতখানি ধরেন জড়িয়ে—স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, "মা আমি তোমার মেয়ে সারদা। কি বিপদেই পড়েছিলুম, যদি বাবা ও তুমি না এসে পড়তে !" জানিনা কি যাদু—কি মায়া ছিল সেই কণ্ঠে…কি মোহিনী শক্তি ছিল সেই মাতৃ-সম্বোধনে; সেই পিতৃ সম্বোধনে। যে ডাকে মরুর হৃদয়ে ছুটে এল মমতার অলকানন্দা, বাৎসল্যের প্রাবল্য—তারা সম্পূর্ণ বিস্মিত হল তাদের হীনজাতির কথা—বিস্মৃত হল তামসিকতাভরা হীন প্রবৃত্তির স্মৃতি। যে মহামায়ার মায়ায় স্বয়ং দেবাদিদেব আপনহারা, তাঁর কাছে তেলোভোলার ডাকাত তো নগণ্য……।

কন্যাস্নেহমুগ্ধ জনকজননীর মত তারা সান্ত্বনা আর অভয়দানে তুষ্টা করে মা সারদাকে, আর মাও যেন ছোট্ট আনন্দময়ী বালিকা —অবস্থা অনুযায়ী যত্নের হয় না ত্রুটি। তেলোভোলা গ্রামের একটি ছোট্ট দোকানে হ'ল রাত্রিবাসের ব্যবস্থা, সামান্য কিছু আহার্য্যে দেব-কন্যাকে পরিতৃপ্ত করে ডাকাত-মা তাঁর জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলের শয্যায়



"বাবা সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়াছে আমি পথ হারিয়েছি; তোমার জামাই দক্ষিনেশ্বরে রাণী রাসমনির কালীবাড়ীতে থাকেন আমি তার কাছে যাচ্ছি।"

ছোট্ট শিশুকন্যার মত ঘুম পাড়ালে সারা যুগের ঈশ্বরীকে, আর বাগ্দী ডাকাত-বাবা, তার চোখ থেকে বুঝি ঘুম আজ ছুটি নিয়েছে তার সব প্রবৃত্তির সাথে। সারাটী রাত লাঠী হাতে কুটীর দ্বারে থাকে প্রহরারত, প্রহরীর মত বিশ্বেশ্বরীর প্রহরায়···। চিরদিনের স্নেহরস বঞ্চিত বুভুক্ষিত হৃদয় একটি রাত্রির স্নেহের পরসাদে যেন পরিপূর্ণ করে নেয় সারাজীবনের শূন্য পাত্রখানি—বুঝি বুঝতে পারে এ অমৃত হতে বঞ্চিত থেকে তাঁরা কতখানি ব্যর্থতা অর্জন করেছে জীবন ভোর···।

ভোরের আলোয় আকাশ রাঙা হয়ে উঠতেই আবার সুরু হয় পথ চলা—এখন মা আমার একা নয়। সঙ্গে একটি রাত্রির পাতানো বাপ—মা, ডাকাত মা আর ডাকাত বাবা···সকলে চলেন তারকেশ্বরের পথে···উপরে আলো ঝলমল নীল নভতল, নীচে শ্যামশষ্পে আচ্ছাদিত—বাংলার পল্লীপ্রান্তর...।

চলেছেন জননী যেন ছোট্ট লীলাচঞ্চলা বালিকা—অঙ্গে ঝরে পড়ছে নবীন উষার অরুণিমা—চরণ চন্দ্রে পল্লীর শ্যামছন্দ···।

চলেছেন ডাকাত মা'র কোল ঘেঁসে...কালো আঁধারের মাঝে যেন এসে পড়েছে এক ঝলক আলো...।

ডাকাত মা তুলে দিচ্ছেন ক্ষেত থেকে কড়াই শুঁটি রাঙা হাত দুটি ভরে, আর পরমানন্দে খেতে খেতে চলেছেন মা সারদা; দ্বিধা নেই—সঙ্কোচ নেই, আনন্দময়ী মা আমার। অনেক বেলায় দেবকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাত মা আর ডাকাত বাবা এসে উপণীত হল তারকেশ্বর শিবালয়ে। কন্যারূপিণী জননীর শুষ্ক মুখ-খানির পানে চেয়ে আকুল হয়ে ওঠে তাদের প্রাণ...ব্যস্ত হয়ে ডাকাত মা ডাকাত বাবাকে পাঠায় শ্রীতারকনাথের পূজা দিয়ে

আসতে আর বাজার করে আনতে। মায়ের প্রাণ যে, তাই মেয়ের দরদ বোঝে বেশী।

দেখতে দেখতে অন্যান্য সঙ্গিনীদলও এসে জুটল [illegible] পাশে, সকলে মিলে আনন্দকলরবের সঙ্গে সমাপন [illegible]লো রন্ধন। দেখতে দেখতে জননী এবং তাঁর পার্শ্বদদের ভোজনকার্য্যও হল সমাধা। এইবার বিদায়ের পালা—ব্যথায় ভরা স্মৃতিরকণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হওয়া মুহূর্ত্ত। আকুল হয়ে কাঁদে ডাকাত মা আর ডাকাত বাবা...যে চোখে এতদিন শুধু জ্বলেছিল পশুত্বের জ্বালা দেব দুহিতার ক্ষণিক স্পর্শে অনুতাপ বেদনায়—স্নেহে—তা হয়ে ওঠে বাষ্পাচ্ছন্ন··· আর নেমে আসে সান্ত্বনাহীন অশ্রুধারা। অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয় তারা এই পথে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার পুতুলিটিকে··· ডাকাত মা ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলে কন্যার অঞ্চলে দেয় বেঁধে, চোখের জল মুছে বলে "মা সারদা রাত্রে এগুলো খাস মুড়ি দিয়ে। আমূল পরিবর্ত্তনে হারিয়ে গেছে তার কঠোর পাশব মূর্ত্তি, একটী রাত্রে সে যেন আর একটী মানুষ—আর ডা[illegible] বাবা? কেঁদে বলে, "মা যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী সঙ্গে না থাকতো, [illegible]াকে বাবার কাছে নিয়ে যেতুম।" অতি সহজ স্নেহের আকুতি। [illegible]র আকুতিতে ছোট্ট বালিকার মত কাঁদেন জননী সারদা···বাংলার [illegible]ন একটী গৃহচিত্র উঠল ফুটে ধূলিধূসরিত একটি মেঠো পথে...বার [illegible] মা অনুরোধ জানান, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাদের দর্শনঅভিলাষ পূর্ণ করে আসতে। যেন শতযুগের বাঁধন ছিঁড়ে বিদায়ের পালা হয় শেষ···।

জননীর প্রাণে সেই চিত্রখানি চিরজাগরূক হয়েই ছিল—"ডান দিকের রাস্তায় বাবা চলে গেল, আর আমি বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চল্লুম। যতদূর দেখা যায়, ফিরে ফিরে তাকায় আর কাঁদে।"

মর্ম্মচক্ষে ভেসে ওঠে একদিকে জগৎ জননীর স্নেহরসসিক্ত কান্ত করুণ কন্যারূপ, অপর দিকে স্নেহের অমোঘ শক্তিতে দ্রবীভূত, পরাভূত পশুশক্তি—দেবশক্তির চিরবিজয়···নবচণ্ডীর অভ্যুদয়ে। মাতৃকণ্ঠেই শুনি সেই কথা, আমি তাদের বল্লুম—"তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো? তারা উত্তর দিলে, তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা যে তোমাকে কালীরূপে দেখলুম। আমি বল্লুম সেকি গো, সেকি গো; তোমরা এটা কি দেখলে? তারা বল্লে, না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম, আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন করচ। আমি বল্লুম কি জানি, আমি তো কিছু জানিনা।"

পরে একদিন সত্যই দেখা যায়—তাদের সমস্ত হীন প্রবৃত্তি গেছে চুকে—তারা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে নিয়ে এসেছে মিষ্টান্ন। আর তাদের দেবকন্যা দেবজামাতা—ঠাকুর আর মাতা তাদের সুমধুর যত্নে করছেন আপ্যায়িত, করছেন পরিতৃপ্ত। তাদের সমস্ত পরিচয়ের মাঝে আজ একটি নূতন পরিচয় জেগে উঠেছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে, জননী সারদার পাতানো ডাকাত মা, আর ডাকাত বাবা।

ভক্তের আকুলতায় ভগবানের আসন ওঠে ট'লে, একথা বহুদিনের পুরান কাহিনী। কিন্তু ভক্তপ্রাণের অটুট বিশ্বাসে একথা আজকের আধুনিক যুগেও হয়ে আছে নিখাদ সত্য। কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরের মাঝে মাঝে বাঁকা পথরেখার কোলে জেগে উঠেছে ছোট ছোট ছায়াছন্ন গ্রাম, সেই গ্রামের বুকে কতবার চ'লে গেছেন যুগের ঠাকুর আর জননী সারদা, তাঁদের রাঙা পায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ জেগেছে সেই ছোট গ্রামগুলির বুকে—তারা হয়ে গেছে ধন্য, তাদেরও ত' আছে প্রাণ। সেবার যখন কলিকাতা হ'তে ঘাটাল পর্য্যন্ত সুরু হ'লো ষ্টিমার চলাচল, তখন একবার ঠাকুর আর মা পদব্রজে কামারপুকুর যাত্রা স্থগিত

রেখে শুভাগমন করলেন ষ্টিমারে জলপথে...বালি দেওয়ানগঞ্জ—গঙ্গার কূল ঘেঁসে উঠেছে একটী গ্রাম, সেইখানকার বাসি... জনৈক ভক্ত মোদক সাধুসন্তে দেবদ্বিজে অগাধ বিশ্বাস আর ভক্তিতে হৃদয়খানি পরিপূর্ণ। সেবার তার নবনির্ম্মিত বাসভবনখানিকে নিজেদের ব্যবহারে লাগবার আগে তার প্রাণে জাগে এক দিব্য ইচ্ছা। কোন দিব্যপুরুষ কি কোন সাধুসন্ত এসে ত্রিরাত্রি করেন বাস তার নবনির্ম্মিত বাস ভবনে, পূত চরণধূলিতে ধূসরিত করে তোলেন গৃহের প্রতিটি অনুপরমাণু! কিন্তু তা কি হবে? চিন্তায় কাটে মোদকের দিন। সহসা পরমলগ্ন এসে দেখা দেয় তার ভাগ্যাকাশে। সে চেয়েছিল কোন সাধু ভক্তের সাহচর্য্য, কিন্তু এসে দেখা দেন ভক্তআর্ত্তিহারী স্বয়ং, এ যেন রতনের পরিবর্ত্তে মিলল পরশ রতন।

সহসা সেদিন প্রবল ধারায় সুরু হ'য় মেঘ বর্ষণ। বালির দেওয়ানগঞ্জের ঘাটে এসে লাগে ষ্টীমার, কিন্তু সেখান থে... পদব্রজে কেমন ক'রে যাবেন কামারপুকুর, প্রবল বৃষ্টি ধারায় পথ হয়েছে কর্দ্দমা-বিল' পিচ্ছিল। ভক্তের অশ্রু আর্ত্তিতে এমনি করেই বুঝি বাধা দেয় ভগবানের রথচক্রের গতি...।

তাই নিরুপায় হ'য়ে ঠাকুর আর আমাদের জননী সারদা সঙ্গে ভাগিনেয় হৃদয় ভক্ত ভগবান ত্রয়ীতে এসে আশ্রয় নেন ভক্ত ...কের নবনির্ম্মিত বাসভবনে। পরমানন্দে মোদক সাদরে বরণ ক'রে নেয় যুগের ঠাকুর—যুগের জননীকে। তবু ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে খুবই, কেমন ক'রে জানানো যায় অভ্যর্থনা। কোন সেবায় সন্তুষ্ট করা যায় দেবতাকে, আপন সংসারটীকে মনে হ'য় দীন, তাঁদের সেবার অযোগ্য, তাই পরিশ্রমের শেষ থাকে না যথা সাধ্য আয়োজন করতে। এদিকে সমানভাবে চলে অবিরাম বৃষ্টি। কীর্ত্তনের আয়োজন হয়, সেই

বৃষ্টি তার সঙ্গে চলে অবিরাম লোক সংঘট; শ্রীমুখচ্যুত মধুক্ষরা কথামৃত পান করার নেশায় গ্রামখানি যেন ভরে ওঠে। আর মোদক, তার আর কোন চিন্তা নেই, শুধু সেবা—দেবতাকে পরিতৃপ্ত করবার দুর্ব্বার আকাঙ্খা। একটী দিন কেটে গেল, বিনিদ্র রজনী হয় যাপন...পরদিনের সেবার পরিকল্পনায়। সে দিনটীও নিষ্ঠাভরা সেবায় কেটে গেলে আবার নিদ্রাবিহীন চোখে জাগে শুধু সেবার স্বপ্ন। এমনি ভাবে তিনদিন ধরে মেঘধারা দেয় বাধা ঠাকুরের চলে যাওয়ার পথে। ঠিক তিনদিন পর সে বৃষ্টির হয় বিরাম, ভক্ত প্রাণের যেকটী দিনের আশা ছিল, ঠিক সেই কটী দিন পরেই। বৃষ্টির বিরাম হওয়ায় সেবক হৃদয় ঠাকুরকে জানায় এইবার যে যেতে হবে ফিরে। কৃপাআশীষে ধন্য করে ঠাকুর বিদায় চাইলেন ভক্তের কাছে। তখন মোদকের যেন চমক ভাঙে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সুখস্বপনের রজনী হয়েছে অবসান, এসেছে বিদায় লগ্ন। তবু অশ্রু জলে দিতে হয় বিদায়।—তাই হোক প্রভু সুখস্মৃতিই হোক সম্বল। বিদায়রাঙা পথে চলে গেলেন ঠাকুর কামারপুকুরের পথে...। পিছনে পড়ে রইল তিনটী দিনের অশ্রুভরা আকুতি। মাত্র তিনটী দিনের দেবপ্রতিষ্ঠায় যে গ্রাম তীর্থস্বরূপ হ'য়ে গেল সে গ্রাম আজ গঙ্গার গহিন গর্ভে বিলীন, যেমনি করে বিলীন, হয়ে গেছে প্রেমের নদীয়া ও আরো আরো অনেক তীর্থ, মানুষের একান্ত অবহেলায় অযোগ্যতায়।

এমনি ভাবেই চ'লে দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা, গোপনতম লীলা। স্বামী পূর্ণানন্দ নামে কোন ভাগ্যবান সন্ন্যাসীর নিকটে মা গ্রহণ করেছিলেন শক্তিমন্ত্র। আর যুগগুরুও দিলেন আপন লীলা সঙ্গিনীকে জিহ্বাগ্রে সাম্ভবী দীক্ষা। এ দীক্ষা না শিবশক্তির অপরূপ লীলা···। গোপন ঠাকুরের গোপন লীলাসঙ্গিনী—তাই সব কিছু তাঁর আরো গোপন। কত সাধনা, কত সেবা, কত ভাবে বুকভাঙা আকুলতায় ভরা ছিল সেই ছোট্ট নহবতখানাটী। সকলের অজানায় লজ্জাপটে আবৃতা দেবীর গোপন স্বরূপ চিরগোপনেই র'য়ে গেল। মাঝে মাঝে শুধু হয়েছিল প্রকাশিত কোন কোন মরমী ভক্তের দৃষ্টিতে। গভীর রাত্রে কখনও দেখা যায় জননীর ধ্যান-সমাহিতা যোগিনী মূর্ত্তি, আলুলায়িত কুন্তলা, কখনও বা নিঝুম নিশিথিনীতে অজানা দূর হ'তে ভেসে আসা মুরলী ধ্বনিতে জেগে ওঠে জননীর অপরূপ ভাব বিলাস। বুঝি মনে প'ড়ে শ্রীবৃন্দাবনের রূপাভিসার, তাই লীলাচঞ্চলা হেসে ওঠেন থেকে থেকে, ব্রজকিশোরীর অপূর্ব্ব ভাবে। কখনও ঝিকিমিকি চাঁদঝরা সুরধূনীর ঢেউয়ের পানে চেয়ে চেয়ে আকুল পার্থনায় কাটে সারাটি রাত, "রাত্রে যখন চাঁদ উঠত, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে প্রার্থনা ক'র্ত্তুম, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে"। তবু গোপন করা লীলাটুকু ত রাখা চাই, তাই কখনও হয়তো ভক্তমেয়েকে দিয়ে শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে জানানো হয়েছে আকুল

প্রার্থনা, ভাবের উচ্ছল প্রকাশের জন্য যেমন হয়েছে আর আর ভক্তদের। আর ঠাকুর এই কথা শোনা মাত্র যেন হয়ে ওঠেন ভাবনিথর, নিরুত্তর গভীর গম্ভীর...দেবতায় দেবতায় লীলা—রহস্যে অতলস্পর্শী—তাই গভীর বিস্ময় নিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে ভক্ত মেয়েটি এসে দেখেন দিব্য ভাবে টলমল করছে জননীর শ্রীঅঙ্গ। কখনও আকুল হ'য়ে কাঁদছেন ভুবন গলানো কান্না...কখনও দিব্য শিশুর মত হাসছেন পরমানন্দের হাসি। অবশেষে একেবারে সমাধির অতল সায়রে গেলেন ডুবে। শুধু নহবতের আঁধার কোনটিতেই যে হয়েছিল জননীর দিব্য সাধনার পরিসমাপ্তি তা নয়, বিশ্বকল্যাণ ব্রতে আঁধার রাতের এই সাধনা জননীর চলেছিল আজীবন। পরবর্ত্তীকালে গভীর রাতে কোন ভক্ত হয়তো সহসা নিদ্রাভঙ্গে দেখে জননী শয্যায়শায়িতা অবস্থাতেও আছেন জাগ্রতা; প্রশ্ন করেন, মা আপনার কি রাত্রে ভাল ঘুম হয়না? শান্ত স্নেহসিক্ত কণ্ঠে জননী দিয়েছেন তার উত্তর "বাবা! ঘুমোবো কখন? ছেলেগুলি এসে পড়েছে, নিজেরা তো কিছু পারে না, তাদের কাজ ক'র্ত্তেই সময় যায়"। অনন্ত আকাশের বুকে কখন জেগে ওঠে ঝড়ের তাণ্ডব, কখন সে হ'চ্ছে চন্দ্র কিরণে স্নাত। কত গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে তার মাঝে, কিন্তু আকাশ—সে শান্ত চির অচল। তারও চেয়ে ভাব অনন্তরূপিণী জননীর অন্তর লোকে যে কত ভাবতরঙ্গ, কত শক্তির খেলা চলেছিল, কিন্তু মূর্ত্তিমতি প্রশান্তির মতই যার সমস্ত শক্তি, সমস্ত রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন ক'রে। ভাব সায়র উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে হতে চেয়েছে প্রকাশোন্মুখ, কিন্তু একটুখানি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই জননী করেছেন তাকে প্রশমিত, করেছেন সংযত। সহজ ভাবে ধরা দিতে গিয়ে যেন হয়েছেন চির অজানিতা, চির অচিন, চির অনির্ব্বচনীয়া।—

কখনো হয়তো দেখা গেছে চোখ চেয়েই শূন্য দৃষ্টিতে আছেন

বসে, কোন ভক্ত এসে হয়তো দাঁড়িয়েই আছে, কিন্তু জননীর নয়ন-অপাঙ্গে দৃষ্টি পড়লে মনে হচ্ছে না সে দৃষ্টিতে বহির্জগতের কোন আভাস তখন আছে…কিন্তু ক্ষণিকেই সে ভাব করেন সংবরণ… সামনে সন্তানকে দণ্ডায়মান দেখে যেন সঙ্কোচ ভরে উঠে দাঁড়ান।…আবার সেই বাংলা মাটির মা। আবার কথা কইতে কইতে হয়ে পড়েছেন গভীর ভাবমগ্না…শ্রীচরণের অতি নিকটে প্রণাম করেও ভক্ত আপন উপস্থিতি পারে নাই জানাতে, উন্মুখ স্থির নয়ন তার। কোন অসীমে গেছে হারিয়ে কে জানে, নিশ্চল স্বর্ণ প্রতিমার মত সে মূর্ত্তি, ভক্ত প্রাণভরে দেখেছে আর চির-দিনের মত অঙ্কিত করে রেখেছে তার হৃদয়ের স্বর্ণপট।…মনে পড়ে কামারপুকুরের দেবভবনে যখন হয়েছে শ্রীঠাকুরের আগমন …আনন্দের হাট বসেছে চন্দ্রাদুলালকে ঘিরে…পল্লীজননীর দল এসে বসেছিল শান্ত মধ্যাহ্নের একান্ত অবসরে…তাঁদের নানা উপদেশে পরিতৃপ্ত করছেন প্রভু গদাধর। বালিকা জননীও সেখানে উপস্থিত—কখনও দেখা যায় ছোট্ট শ্যামার দুলালী হয়ে পড়েছেন নিদ্রাতুর, একটি পাশে ছোট্ট অঞ্চলখানি বিছিয়ে…। সকলে ভাবে আহা এমন কথাগুলো শুনতে পাবে না। ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা করে বলে, "ওমা এমন কথাগুলো শুনলেনি, ঘুমিয়ে পড়লে।" রঙ্গময় ঠাকুর একটুখানি মধুর হেসে বলেন, "না গো ওকে তুলোনি ওকি সাধে ঘুমিয়েছে, এসব শুনলে ও এখানে থাকবেনি—চোঁচা দৌড় মারবে"। এই গভীর বাণীতে মনে হয় জননীকে বিশ্বের বুকে ধরে রাখতে বিশ্বনাথের কি ব্যাকুল আকুতি? বিশ্বের উর্দ্ধলোকে যিনি মহান পুরুষ—পিতৃশক্তি—তাঁর হয়তো চলে সাক্ষীস্বরূপ হয়ে থাকা—কিন্তু যিনি মাতৃরূপিণী তাঁর তো চলে না সৃষ্টিকে ভুলে থাকা।

জননীর এই গোপন সাধনাকে জড়িয়েছিল একটি মূল সাধনা, সেবা। নীরবে নির্ব্বিচারে এই সাধনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, শ্রীঠাকুর আর তাঁর ভক্তদলের সেবা।—এ সেবায় ছিল না কোন প্রতি-দানের আশা, ছিল না এতটুকু স্বার্থগন্ধ, এখানে ছিল শুধু অকারণে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়ার নিবিড় আনন্দ। নিজমুখে বলেছেন শ্রীঠাকুরের কথায়, "ঠাকুরই সব। তিনই গুরু,—তিনিই ইষ্ট,—তিনিই পুরুষ,—তিনিই প্রকৃতি,—তিনি সর্ব্বদেবময়, তিনি সর্ব্বজীবময়।"

এত শুধু কথার কথা ছিল না—তাই বুঝি জননীর সেবা, জননীর ব্যথা, জননীর দরদ, ছিলনা সীমার বন্ধনে বাঁধা। সে সেবা, সে ব্যথা, সে দরদ ছিল অসীম—সর্ব্বভূতের জন্য সর্ব্বকালে—সর্ব্বদেশে। সর্ব্ব-জীবময় সর্ব্বদেবময় ঠাকুরের জন্য।

রাত্রির শেষ প্রহরে মার হত নিদ্রাভঙ্গ—আর শয্যায় থাকা চলে না...সারা দিনের কাজ যে তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—। তারপর মা যে আবার চন্দ্রার গৃহলক্ষ্মী—তাই সলজ্জ বধুর মত আড়ালের অবগুণ্ঠনে লোকচক্ষুর অন্তরালে সারা করতে হয় সব কাজ, তাই অন্ধকারেই স্নান ইত্যাদি হয় সমাপন, সামনে বকুলতলার ঘাটে।—একদিন ত' ঘটল অঘটন। সেদিন রাত্রির অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড কুমীর শুয়েছিল বকুলতলার সিঁড়ির ওপরেই।—সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে জননীর চরণ বুঝি স্পর্শ করে ঐ কুমীরের পিঠে—ভয় পেয়ে কুমীর লাফিয়ে গিয়ে পড়ল একেবারে গঙ্গাবক্ষে; ডুব দিয়ে চলে গেল

অতল তলে।—অভয়ার চরণস্পর্শ করতে মকর বাহিনীর বাহনই কি এসেছিল? না হলে কুমীরের চিরহিংসাবৃত্তি কি করে নিরুদ্ধ হল?

আবার একদিন গভীর আঁধারে ঘাটে নামতে গিয়ে মানবদেহ-ধারিনী জননীর অন্তরে কেমন যেন জেগে উঠল একটা অজানা আতঙ্ক। মুহূর্ত্তের ভিতরে একি কোথা হতে যেন এসে পড়ল বিচ্ছুরিত জ্যোতি-কিরণ—গঙ্গার ঘাট হয়ে উঠল আলোয় আলোময়। চেয়ে দেখেন জননী আপন ছোট্ট শ্রীমন্দির নহবত থেকেই আসছে ঐ আলোর তরঙ্গ। নির্ভয় স্বস্তিতে স্নান সেরে ফিরে আসেন মা সারদা। একদিন নয় দুদিন নয় সেদিন থেকে প্রতিদিনই এসে পড়ে এই আলোক ধারা ঠিক জননীর স্নানের সময়টিতেই। একাকী থাকতে ব্রহ্মের যে একদিন ভয় জেগেছিল যার ফলে সৃষ্টির বিলাস জ্ঞানের বিলাস...ভয়হারিণীর এও কি সেই ভয়?—যার ফলে চিৎজ্যোতির আবির্ভাব।—

যাই হোক প্রাতঃস্নান সমাপনের সঙ্গেই সুরু হয় শ্রীঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা, কত ভাবে কত রূপে। রান্না করা, পান সাজা, শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরখানি নিজের হাতে পরিষ্কার করা, শয্যা তৈরী করা, শ্রীঠাকুরকে তেল মাখানো, মাঝে মাঝে নাওয়ানো, তাঁর শ্রীচরণ দুটি সেবা করা—চিরদিনের ভাবে ভোলা বালকস্বভাব ঠাকুরকে ছোট্ট ছেলেটির মত ভুলিয়ে খাওয়ানো—আবার গরমের সময় বেলফুল দিয়ে খাবার জলটি রাখা হয় ঠাণ্ডা করে; এমনি আরো কত ভাবে, তা কি বলে শেষ করা যায়? সেবায় আত্ম-হারা মায়ের একটিমাত্র চিন্তাই যেন অন্তরে থাকে চিরজাগ্রত—কেমন করে অধরাকে রাখা যায় ধরে?, আত্মনিবেদনে সমাহিতা মা···ব্রহ্মানন্দ কেশব যেমন বলতেন, "শ্রীঠাকুরের দেবদেহ রাখা উচিৎ গ্লাস কেশে—তা না হ'লে এ দেহ রাখা মুস্কিল।"

ক্রমে ক্রমে একটি দুটি করে এসে জোটে ভক্তদল,—মধুলোভী ভ্রমরের মত। শ্রীরামকৃষ্ণ চরণশতদলের চারপাশে বসে তাদের মধুমেলা—আসেন গৃহী ভক্তের দল রামদত্ত, মানি মল্লিক, সুরেশ মিত্তির, সুরেন্দ্র, বলরাম। আসেন নরেন, কালী, রাখাল, শরৎ, যোগীন, লাটু, বালক যোগীর দল,—সর্বত্যাগী অন্তরঙ্গের দল। আসেন গোলাপ মা,—যোগীন মা—দক্ষিণেশ্বরের উমামহেশ্বরীর দুই সখী—জয়া-বিজয়া—ঈশাবতারের মার্থা আর মেরী…।

ভক্তসংমিলনের এই প্রথম ক্ষণে, একটি গোপন লীলার কথা এখনও হয়ে আছে অপ্রকাশিত। নন্দিনী, যদুমল্লিকের কন্যা—বালবিধবা। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে দেন সংসারের অসারতা—দিব্য জীবনযাপনের উপদেশ দিয়ে বলেন শ্রীকৃষ্ণই জগতের স্বামী চির অবিনাশী—তাঁরই চরণে সমর্পণ কর তোমার সব কিছু, তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক ; তোমার সব দুঃখ দূরে যাবে।

নন্দিনী যেন পায় নূতন পথের দিশা—আনন্দে ভজন পূজনে কাটতে থাকে তাঁর দিন, দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়াও যায় বেড়ে—জননী সারদা আর শ্রীঠাকুরের সঙ্গ দিনে দিনে তার লাগে মধুর হতে মধুরতর।

সাধনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে সে বুঝি জানতে পারে শ্রীঠাকুর আর মা সারদার লুকিয়ে রাখা গোপনস্বরূপ। তাই তার এক একদিন জাগে সাধ, নবলীলা সৃষ্টি করতে—মণিমল্লিক সে যুগের বেশ নাম-করা ধনী ব্যক্তি। বরাহনগরে উছলিত গঙ্গাতীরে সুরম্য প্রকাণ্ড

বাগানবাড়ী, ফুলে ফলে শ্যামলতায় ভরা। মধ্যাহ্নের স্তব্ধ অবসরে যখনি কলকাতার কর্ম্ম চঞ্চল দেহে নামে মন্থর আবেশ, তখন সেখানে এক একদিন গোপনে নিয়ে আসে নন্দিনী—জননী সারদাকে। তাঁকে নিয়ে খেলে এক অপূর্ব্ব খেলা। মস্ত বড় দোলনা, ফুলের মালায় শ্যামল পাতায় দোলায় তাতে হয় সাজানো মধু বনের মিলন ঝুলা…। তারপর সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা—মর্ম্মপটে যেন হয়ে থাকে চির অম্লান। শ্যামার নন্দিনী সাজে বৃষভানু-নন্দিনী—কনকগলা অঙ্গে নীলাম্বরীর নীল ঝলক হায় কুসুম সজ্জায় চন্দন রেখায় রূপ আর ধরে না। নন্দিনী তখন চতুরা গোপিনীর মত সখীভাবে বিভোর,—সুশ্রী কালো মেয়ে সে। পীতবাসে, চন্দনে, ফুলে সে আপনি সাজে ব্রজের কিশোর, সে তখন দুখিনী নন্দিনী নয়,—বৃন্দাবনের লীলাআনন্দে চিরআনন্দিনী…। তারপর সুরু হয় ঝুলন খেলা—বাইরের দুয়ার বন্ধ—তাই বাহিরের লোক পারে না জানতে, ভিতরে চলে ঝুলন লীলা—ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা, তারাও সাজে কৃষ্ণরাধার সখী—তাদের নূপুরসিঞ্জিত চরণের নৃত্যছন্দে দিবস মধ্যাহ্নেই নেমে আসে ঝুলনের চন্দ্রিম রজনীর অতন্দ্র আবেশ… ভাবে বিভোর নন্দিনী—ভাবে বিভোরা জননী সারদা—বুঝি মনে পড়ে পুরাতন লীলার দিনগুলি—লীলার পুনরাভিনয়ে। এমনি ভাবে নৃত্য-গীতে ঝুলন দোলায় বৃন্দাবনবিলাসে কাটে সারাটি মধ্যাহ্ন। বৈকালের ছায়া পড়তে না পড়তে নন্দিনী ফিরে দিয়ে যায় দক্ষিণেশ্বরীকে সেই নহবতের ছোট্ট মন্দিরটীতে।

এমনি কত গোপন লীলাই যে রয়ে গেছে কালের আড়ালে চিরপ্রচ্ছন্ন কে জানে? ভক্তও নিত্য—ভক্তের লীলাও নিত্য। আর চিরনিত্য তার লীলার বৃন্দাবন…।

নদীর স্রোতের মত দিন যায় কেটে—দখিণাপুরীর দেউল দিনে দিনে ভক্তসমাগমে হয়ে ওঠে পূর্ণ। সাধনলীলার অবসানে সুরু হয়েছে এখন ভক্তলীলা। দিব্যআনন্দের স্রোত চির প্রবহমান,—কখন পঞ্চবটীর ছায়া মূলে, সুরধুনীর কুলে, বিহার করে ফিরছে গদাধর-সুন্দর, সঙ্গে ভক্তবৃন্দ,—কখন চির পরিচিত খাটটিতে বসে কথামৃতের অমৃত করছেন বর্ষণ, হাসির হিল্লোলে বাঁকা চোখের নীল কমলে যেন ফেণিয়ে উঠেছে রসের সায়র, আর ভক্তঅলি পানে বিভোর···কখনও ভাবে গরগর—রূপে ঢরঢর দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করছেন সংকীর্ত্তন আনন্দে। ডুব্ ডুব্ করে রূপসাগরে দিচ্ছেন ডুব...ডুব দেওয়া ত নয়, এ যেন ডুবিয়ে দেওয়ার ছল...আবার মুহুর্মুহু সমাধি। উচ্চ কীর্ত্তনরোলে আকাশ বাতাস মুখরিত—গঙ্গাবক্ষ সুরতরঙ্গিত—নৌকা হ'তে সবিস্ময়ে লোকে থম্‌কে দেখে, পথে যেতে যেতে পথিকের হয় পথ ভুল। ক্ষণিকের জন্য কি ভাবে না—কে এল এই নবীন বাউল? কিন্তু 'অচিনে গাছ' দেয় না চেনা।

এদিকে চলে কীর্ত্তন আনন্দ,—আর ওদিকে নহবতের বারাণ্ডায় জেগে থাকে তৃষিত দুটি সকরুণ আঁখি—লীলারস পানে বিভোর। যুগ যুগের বেদনা নিঙড়ানো দেবতার দর্শনপিপাসিত আঁখি মেলে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামার দুলালী, আর মনে মনে বুঝি জাগছে সাধ, "আহা আমি যদি অমনি ভক্ত হতুম তাহলে পারতুম ঐ লীলার

সায়রে ডুব দিতে। সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে এমনি করে দাঁড়িয়ে দেবদয়িতের কীর্ত্তনলীলা, আনন্দলীলা দর্শন মায়ের ছিল নিত্যকর্ম্মের মতই—সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হত অতিবাহিত কোন হুঁস নাই,—অপলক, দর্শন বিভোল দৃষ্টি মেলে দেখছেন জননী., আর আনন্দপরিপূরিত হচ্ছে হৃদয়-ঘট; স্বল্পে সন্তুষ্টা চিরআনন্দময়ী জননী আমার।

এদিকে নিত্য নূতন ভক্তের আগমনে জননীর কর্ম্মসমারোহ গেছে বেড়ে। কিন্তু কর্ম্মের আয়তন বাড়লেও ঘরের আয়তন বাড়ল না—ওই ছোট্ট নহবতটির ভেতরেই চলে সারাদিন সকলের সেবার বিরাট আয়োজন; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সর্ব্বকালেই সমভাবে। এখন আর শুধু ঠাকুর নয়, প্রত্যেকটি ভক্তের রুচিমত আহার জোগানো, আলাদা আলাদা করে পান সাজাই হত কত···। ক্ষণিক অবসর হলেই শ্রীঠাকুর এনে দিতেন প্রচুর পাট, কিনা আমার ছেলেদের খাবার রাখব—বিঁড়ে পাকিয়ে শিকে করে দাও। তবু মুখে নাই ক্লান্তির ছায়া, অনলস আনন্দে কর্ম্মময়ীরূপে করে চলেছেন কাজ, নীরব মৌন মুখে···শ্রীঠাকুরের ক্ষণিক সঙ্গও যে তাঁর কাছে পরম দান, তাতেই তো পরম আনন্দ...।

শুধু কি রন্ধনগৃহ,, জননীর শয়ন মন্দিরও যে ঐ নহবতটাই। তার ওপর কোন ভক্ত মেয়ের রাত্রিবাস যদি ঘটে যায় কোন কারণে, তাহলে ত' কথাই নাই—ঐ নহবতেই তারও শয়নের ব্যবস্থা করতে হয় মাকেই —প্রথম দিকে, শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব—দক্ষিণেশ্বর—আনন্দপরিপূর্ণ ···ভক্তদের অনেকেই এসে যোগ দেন পূণ্য আনন্দদিবসে—পঞ্চাশ ষাট জন প্রসাদ পাবেন—সমস্ত রান্নাই করেন জননী আপন হাতে পরমানন্দে!

সারাদিন উৎসবান্তে যোগীনমা'র মত কোন কোন ভক্ত মেয়ে রয়ে গেছেন, ঠাকুর দেখে বলেন—"এত রাত্রে তোরা আর কোথা যাবি?" আর শোবার জায়গাই বা কোথা হবে? আমার ঘরের পাশে ঐ ঘেরা বারান্দায় শুয়ে থাক।" যোগীনমা যান মার কাছে ঠাকুরের কথা জানাতে,—গিয়ে দেখেন তাঁদের উপস্থিতি জানাবার আগেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জননী ছোট্ট ঘরখানিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে শয্যা প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন ভক্ত মেয়ের জন্য। জননীর দেহঘট থাকতো নহবতের কর্ম্ম মন্দিরে, কিন্তু মন থাকতো শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে। বহুবার তার প্রমাণ গেছে পাওয়া—। শ্রীঠাকুরের বালক সেবক সারদাপ্রসন্ন, পরবর্ত্তী কালে যিনি স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে পরিচিত, তাঁর ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। অভিভাবকের কড়া নজর এড়িয়ে তিনি পালিয়ে আসতেন চুপি চুপি দক্ষিণেশ্বরে, সেবকের অবস্থা বুঝে ঠাকুরও প্রায়ই তাকে সেবারের গাড়ীর ভাড়াটি দিয়ে দিতেন।

একদিন জানিনা কি ভেবে ঠাকুর তাঁকে বল্লেন "যা নহবত থেকে চারটি পয়সা চেয়ে নিয়ে যা"। হয়তো চাইলেন সন্তানকে জগৎজননীর স্বরূপের কিছু আভাস বুঝিয়ে দিতে। যেমন নরেনকে পাঠিয়ে ছিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে সাংসারিক স্বচ্ছলতার প্রার্থনা জানাতে। দুই মাই যে এক। সারদাপ্রসন্ন শ্রীঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করে—নহবতে এসে দেখেন তিনি আসবার পূর্ব্বেই ঘরের বাহিরে ঠিক চারিটি পয়সা রাখা আছে। বালক বিস্ময়াভিভূত হয়ে তুলে নেয়, আর বুঝি প্রণাম জানায় অন্তরের অন্তর লুটিয়ে দিয়ে অলখচারিণী অন্তর্য্যামিনী জননীর উদ্দেশ্যে। আবার কোন দিন হয়তো শ্রীঠাকুর খেতে বলেছেন তাঁর আদরের নরেনকে, কিন্তু সেইকথা নহবতের অন্নপূর্ণাস্বরূপিনীকে জানাতে এসে দেখেন তাঁর বলবার পূর্ব্বে আপনার হাতেই দেবী তাঁর সন্তানতুল্য

নরেনের প্রিয় খাদ্য ছোলার ডাল উনুনে বসিয়ে দিয়ে ময়দা ঠাসছেন ব্যস্তভাবে রুটীর জন্য। এই অন্তরে অন্তরে গোপন লীলা যে কত প্রকাশিত হয়েছে তখন বুঝেও যেন কেউ বোঝেনি।

জননীর নিজের কথা, "আমি নহবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও আমার মন সর্ব্বদা ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকতো, অ... থেকে খুব আস্তে আস্তে বল্লেও আমি সব কথা শুনতে পেতুম।"

অপরূপ ঠাকুরের লীলা—অপরূপা তাঁর লীলাময়ী লীলাসঙ্গিনী··· কখনও দেখি অত নিকটে থেকেও হয়তো সুদীর্ঘ দুটি মাস গেছে কেটে, জননী পান নাই শ্রীঠাকুরের ক্ষণিকদর্শন···জানিনা অদর্শনব্যথা বেজেছিল কিনা জননীর প্রাণে, কিন্তু দেখি সদাসন্তুষ্টা জননী—মনকে দিচ্ছেন সান্ত্বনা, "মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস, যে রোজ তাঁর দর্শন পাবি?"

কখনও দেখি ঠাকুরের ইচ্ছায় স্বহস্তে শ্রীঠাকুরের ভোগপাত্র নিয়ে আসা আর বসে খাওয়ানোটুকু পর্য্যন্ত গেছে উঠে এবং সে কাজটি তুলে দিতে হয়েছে কন্যাশোকসন্তপ্তা ভক্ত মেয়ে গোলাপ...র হাতে—তাকে শান্ত করতে। ক্ষণিক অভিমান এসে আঘাত করলে ...শিরে মেনে নিয়েছেন জননী তাঁর পরম দেবতার কল্যাণময়ী ইচ্ছা ...আত্ম-নিবেদনে উন্মুখ। আবার অপরদিকে দেখি জননীর দেবদে... সুস্থ অসুস্থতার প্রতি শ্রীঠাকুরের সজাগ দৃষ্টি। প্রচ্ছায়শীতল ...বটি গহিনে ধ্যানমগ্ন লাটু, বালক-সেবক সহসা শোনেন শ্রীঠাকুরের মৃদুমন্দ ভর্ৎসনাবাণী "যার ধ্যান কচ্ছিস সে নহবতে রুটী বেলছে" ত্রস্তে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান লাটু। ঠাকুর তাকে ডেকে নিয়ে আসেন নহবতে। কর্ম্মনিরতা জননীকে আহ্বান করে বলেন "এ ছেলেটি বেশ. তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।" দ্বিধামাত্র না করে সেইদিন

থেকেই লাটু লেগে যায় জননীর প্রয়োজনীয় ফাইফরমাস খাটতে। সেদিনের বালক সেবক লাটু তাই পরবর্তী কালেও মার কাছে চিরদিনের বালক লাটু, একান্ত স্নেহের পাত্র, আর লাটু মহারাজের কাছেও, "মা আমার দক্ষিণাপানী দক্ষিণেশ্বরী মা।'

তাই মার দেওয়া কাপড়খানি সযত্নে বাঁধছেন মাথায়......... .. কখন মার আঙিনার বসে প্রসাদ খেতে খেতে চোখ দুটি উঠেছে জলভরে, আবার কখন বা মার হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে চপল শিশুর মত পালাচ্ছেন ছুটে। আর চপল ছেলের কাণ্ড দেখে মায়ের খিল খিল করে হাসি, কলকণ্ঠের কাকলিতে সারা ঘর উঠেছে ভরে......।

সারাটি দিন ছোট্ট নহবতের সীমাটুকুর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তনলীলা দর্শন—দীর্ঘদিন এমনিভাবে কাটানোর ফলে কোমল দেবতনু যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—জননীর দেব দেহেও হয় বাতব্যাধির সৃষ্টি। শ্রীঠাকুর তাও পারেন জানতে, রহস্যচ্ছলে বলেন, "বুনো পাখী খাঁচায় থাকলে বেতে যায়—মাঝে মাঝে বেড়াবে।" লজ্জাশীলা জননী শ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশও নেন মাথা পেতে—দ্বিপ্রহরের শান্ত অবসরে...সকলেই যখন বিশ্রামরত, তখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের খিড়কি দিয়ে যেতেন বাইরে আর নিকটে জনৈকা পাঁড়েগিন্নীর বাড়ী ছিল তাঁর ভ্রমণস্থল—এ ব্যবস্থাও ঠাকুরের

নির্দ্দেশক্রমে হয়েছিল। কিন্তু এটুকু ভ্রমণ শরীরের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। তাই আজীবন জননী দেহে সেই ব্যাধির কষ্ট সহ্য করেছিলেন নীরবে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরের বুকে ঘটল এক অভিনব ঘটনা—নহবতের ছোট্ট দেবালয়—জননী পূজায় সমাসীন—সম্মুখে শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি পূজার বেদীতে বিরাজিত, আর সামান্য পূজার আয়োজন···সহসা অ ধিতার নয়নসম্মুখে এসে দর্শন দেন দেবদেহধারী আরাধ্য,—স্বয়ং ঠাকুর। শ্রীমুখ জ্যোতিরঞ্জিত, "কি গো? কি হচ্ছে! বলতে বল সম্মুখ-স্থিত আপন শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পূজার উপচার দর্শনে হয়ে ওঠেন ভাব গরগর। পুষ্পথালা হতে তুলে নেন একটি ফুল আর আপন শ্রীপটমূর্ত্তিতে অর্ঘ্য দিয়ে বলেন, "এই মূর্ত্তি একদিন ঘরে ঘরে পূজিত হবে।" স্তম্ভিত জননী সারদা—ছোট্ট ঘরখানি যেন থমথম করে ওঠে। সেদিন ঘটেছিল যে ঘটনা কলকাতার একটি অখ্যাত পল্লীপ্রান্তে; সারা বিশ্বের ভাগ্যাকাশে সে এক পরম লগ্ন···।"

আবার দূর থেকে দিব্য-রঙ্গটুকুও করতে ছাড়তেন না রঙ্গময় ঠাকুর, —দিব্যরঙ্গের ভিতরেও যেন চলত উভয়ের দেবলীলা।—

শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী "রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের লক্ষ্মীদিদি" ছিলেন গোপী-ভাবে ভাবিতা, কৃষ্ণপ্রেম সাধনায় উৎসর্গিতা; তাঁর সারাটি মনপ্রাণ, সারাটি জীবন—আজীবন জননী সারদার সঙ্গলাভে ধন্যা—তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনিও থাকতেন নহবতে। কোনদিন শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে এসেছে হয়তো ভবতারিণীর প্রসাদ। শ্রীঠাকুর আনন্দে বালক ভক্তদের মাঝে করছেন বিতরণ···আনন্দের ধূম লেগে গেছে লীলাপার্ষদদের মাঝে। সকলে পরমানন্দে পাচ্ছে শ্রীঠাকুরের দেওয়া প্রসাদ—তাদের বিতরণের পর দেখা গেল কিছু প্রসাদ রয়েছে

অবশিষ্ট,...মধুর রঙ্গভরা হাস্যে ঠাকুর রামলালের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "যা খাঁচায় শুকশারি আছে দিয়ে আয়গে।" রামলালও হাসতে হাসতে চলে যান। উভয়ের মাঝে কি রঙ্গ হয়ে গেল কেউ বোঝে না। সকলে ভাবে সত্যিই বুঝি খাঁচায় আছে বাঁধা দুটি পাখি—শুক আর সারি। রামলাল সেগুলি নিয়ে যান যথাস্থানে—যেখানে বদ্ধ-নহবতের কর্ম্মসাধনায় ডুবে আছেন জননী আর সঙ্গে আছেন সঙ্গিনী লক্ষ্মীদিদি। ঠাকুর প্রসাদ পাঠিয়েছেন,—তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। এমনি আরো কত যে রঙ্গ হ'ত তার সংবাদ কে রাখে...।

আর একটি দিনের কথা...দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের চরণে পরম আকুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে জনৈকা রমণী। তাঁর সংসারে নাকি দেখা দিয়েছে এক বিষম অশান্তি—যার সুরাহা করা সকলের পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে অসম্ভব।

গোপন নটবরের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরমহংস বা ভক্ত সাধু-খ্যাতি ছড়িয়েছিল তখনকার কলকাতার ঘরে ঘরে। সেই সরল বিশ্বাস নিয়ে রমণী নতশিরে অশ্রুসরস চক্ষে জানায় মিনতি শ্রীঠাকুরকে। জানায়—তাঁর সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা একমাত্র শ্রীঠাকুরেরই আছে। অন্য সময় এইরূপ্ বাসনা পরিতৃপ্তির আশায় কেউ কাছে এলে ঠাকুর তাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করেই চলতেন। কখন দূর থেকে দেখেই দিতেন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করে। কখন তাদের কাছে অচেনা হয়ে তাদের দিতেন গোলকধাঁধায় ফেলে। পরে ত' কতবার বলেছেন, "রাজার কাছে গিয়ে কি কেউ লাউকুমড়ো ভিক্ষে করে?" কিন্তু বিশ্বাসের গভীরতায় কখনও কখনও তাঁর আসন টলে উঠেছে,—ক্ষুদ্র বাসনার পরিপূর্ত্তিও তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু সে কচিৎ কখনও।

যাই হোক, সেদিনের রমণীর অটল সরল বিশ্বাসকে ঠাকুর দূরে ঠেলে দিতে পারলেন না। রঙ্গভরা অথচ অভয় হাসি হেসে বললেন,—নহবতের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, "ঐখানে যাও—ঐখানে যিনি আছেন তিনিই একমাত্র পারবেন তোমার অশান্তি দূর করতে। তাঁর মন্ত্র ঔষধ সবই ভাল রকম জানা আছে। আমি কিছুই জানি না—তিনি যে আমারও উপরে।"

সরলা রমণী ছুটে আসেন নহবতে—জননী তখন পূজায় সমাসীন। চরণতলে লুটিয়ে পড়ে আকুতি জানায় আর্ত্ত ভক্তটী, জানায় শ্রীঠাকুরের এই কথা :—

"পুরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে—
আমি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে।"
—শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

রঙ্গময়ীর বুঝতে আর বাকী থাকে না রঙ্গময়ের লীলাটুকু। একটু-খানি মধুর হেসে তিনিও দেন তাঁর উত্তর। "ওগো, ঔষধজ্ঞ তিনিই, আমি কি জানি বল? শীগ্‌গির যাও, তাঁকেই ধর গিয়ে।"

স্ত্রীভক্তটীর তখন বিভ্রান্ত অবস্থা। শ্রীঠাকুর যেমন বলছেন কর্ম্মহীন কেরাণীর ব্যাকুল অবস্থার কথা। অথবা স্বাতী নক্ষত্রের জলের আশায় পুত্রগতপ্রাণা জননীর ব্যাকুলতার কথা—ভক্তটি আবার ছুটে আসে—শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে মিনতিভরে জানায় মা'র কথা—"তিনি ঔষধও, আমি কিছু নাহি জানি।" আর প্রার্থনা করেন ঔষধের জন্য। কিন্তু লীলায় হার মানতে শ্রীঠাকুর আজ নারাজ। উচ্ছল হাসিতে শ্রীমুখ ওঠে ভরে, বলেন নানাভাবে বুঝিয়ে সেই একই কথা,—"এখানে আসা তোমার অকারণ। সেইখানে যাও, তোমার আশা মিটবেই

মিটবে।"—বুকভরা আকুলতা নিয়ে আবার ছুটে আসে আর্ত্ত মেয়েটি জননীর চরণতলে, বারবার জানায় প্রার্থনা—বিশ্বার্ত্তিহারিণীর হৃদয় বুঝি এবার ওঠে দুলে, করুণায় আর্দ্র হয়ে তার হাতে তুলে দেন সদ্যপূজিত একটি প্রসাদী বিল্বপত্র। বল্লেন, "এই নিয়ে যাও—বাসনা তোমার পূর্ণ হবে।"

ছোট্ট একটুখানি রঙ্গভরা দেবলীলা, কিন্তু এক একটী বিলাসে যেন মেলে ভবিষ্যতের নিরিখ। অদূর ভবিষ্যতে জননীর কোলে ভিড়ে আসবে বিশ্বের আর্ত্ত সন্তানদল—তাদের শত হাসি-কান্নায়, শত আব্দারে জড়িয়ে থাকবে তাঁর করুণ অধরের স্মিতরুচির হাসি—আর সারা যুগের বুকে ছড়িয়ে পড়বে এক নূতন আশার আলো। আর ঠাকুর চিরদিনের মায়ের দুলাল—আপন ভোলা শিশু···যেমন বলতেন—আমি খাই দাই আর থাকি, আর সব মা জানেন।

আবার যেদিন কিছু বেশী পরিমাণ ফলমিষ্টি ভক্তদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য যখন ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, তার জন্য মা যখন অভিমানভরে সামনে থেকে চলে গেছেন, সেদিনও শুনি ঠাকুরের কণ্ঠে কি অনুতাপভরা বাণী—রামলালকে বলছেন, "ওরে তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।" এই ভয় একদিন জেগেছিল ভোলা মহেশেরও প্রাণে, উমামহেশ্বরীর রুষ্টরূপে। একমাত্র মহাকালই যে জানেন মহাকালীর মর্ম্ম।

স্মৃতিতীর্থে জেগে ওঠে একটি দুটি টুকরো কথা। দক্ষিণেশ্বর··· সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে নেমে—সন্ধ্যার পর···ভোগপাত্র হাতে এসেছেন মা সারদা শ্রীঠাকুরের মন্দিরে। ঠাকুর তখন ক্লান্তভাবে শয্যায় শায়িত ···চক্ষু দুটি মুদ্রিত···ভাবলেন বুঝি লক্ষ্মী এসেছে খাবার দিতে, ভেবে বলে উঠলেন, "দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস!" "হ্যাঁ বন্ধ কল্লুম" জননীর

কণ্ঠ চিনে চমকে উঠলেন ঠাকুর; সঙ্কোচভরা কণ্ঠে বললেন, "আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী—কিছু মনে কোরোনি।" পরদিন আবার যান নহবতে। এতখানি অনুশোচনা যে সারাটি রাত পারেননি নিদ্রা যেতে। সেই কথা তুলে বল্লেন, "ছাখোগো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে ভেবে, কেন এমন রুক্ষ কথা বলে ফেল্লুম। যেখানে যত আপন, মর্য্যাদার আসনখানিও সেখানে আকাশ ছোঁওয়া। আর যুগের যিনি অধিকর্ত্তা, মাতৃভাবের সাধনায় পূজারীরূপে, আপনি আচরি বিশ্বকে দিয়ে গেলেন এই শিক্ষা—বিশ্বেশ্বরীর প্রতিচ্ছবিজ্ঞানে সমগ্র মাতৃজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার শিক্ষা।

আত্মায় আত্মায় কি অপূর্ব্ব সংমিলন। ইচ্ছা, স্বাতন্ত্র, ব্যক্তিত্ব, যা নিয়ে গ'ড়ে ওঠে পরস্পরের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, জননী সারদা তার কোনটাই যেন রাখেননি আপন বলতে। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝেই পেয়েছিলেন আপনার পরিপূর্ণতা··· ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ কিনা? এই অভেদ সত্ত্বাই যে সমস্ত ভেদের উৎস।

ভক্ত লছমীনারায়ণ দানশীল মাড়োয়ারী, শ্রীঠাকুরের সেবার জন্য দিতে এসেছেন দশহাজার টাকা। মায়ের একান্ত শিশু তিনি ঠাকুর, মা ছাড়া আর কিছু জানেন না। অর্থ দেখে ভয়ে হন যেন আকুল, ভক্ত মথুরের ইচ্ছা সত্ত্বেও মথুরের সেবা ব্যতীত ভবিষ্যতের জন্য কোন আর্থিক সাহায্যই যিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি মাড়োয়ারীদের বাসনাদিগ্ধ কোন দ্রব্যই গ্রহণ করতেন না, অর্থ ত' দূরের কথা। তাই লছমীর শত আকুতি সত্ত্বেও ঠাকুর তার অর্থ করেন প্রত্যাখ্যান। চতুর ভক্ত তখন শ্রীশ্রীমার নামে ঐ অর্থ লিখে দিতে হন দৃঢ়সঙ্কল্প—লীলাময়ের লীলার রাজ্য—এইবার স্বয়ং মহা-

মায়াকেও দিতে হয় মায়ারাজ্যের পরীক্ষা।—শ্রীঠাকুর ডেকে বলেন, "ওগো এই টাকা দিতে চাচ্ছে, আমি ত' নিতে পারবো না—এই বলায় তোমার নামে দিতে চাচ্ছে—তুমি নাওনা কেন—কি বল ?—"শ্রবণমাত্র উত্তর দিতে জননীর বিন্দুমাত্র হয় না বিলম্ব। বলেন এবং দৃঢ়কণ্ঠেই বলে ওঠেন, "তা কেমন করে হবে ?… আমি নিলে ঐ টাকা তোমারই নেওয়া হবে। কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় না করে থাকতে পারব না। টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।" এর পরের কথাগুলি শ্রীঠাকুরের মুখে "ওর ঐ কথা শুনে আমি হাঁপ ফেলে বাঁচি।"

আবার সেদিন পেনেটির মহোৎসবে শ্রীঠাকুরের সঙ্গে যেতে ভক্ত-প্রাণ উঠেছে আনন্দে উল্লাসে নৃত্য করে…১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। পেনেটির উৎসবের ছিল একটু বিশেষত্ব। দক্ষিণেশ্বরের নব গৌরচন্দ্রের শুভাগমনে পেনেটির ধুলায় জেগে উঠত নদীয়ার আনন্দ, হরিনামরঞ্জিত আকাশ, নামউল্লসিত কল্লোলিনী সুরধনী, শ্রীঠাকুরের চরণ চুম্বনে, তাঁর কনকনিন্দিত দেবতনুর অপরূপ ভাব বিলাসে, যেন হয়ে উঠত আর এক আনন্দতীর্থ, দূরাগত—নিকটস্থ নানা ভক্তের সংঘট্টের বিপুল সমাগম……সেই ভক্তসাগরতীর্থে যখন নৃত্য করতেন ভক্ত হৃদয়রঞ্জন—প্রস্ফুটিত প্রেমশতদলের মত হিল্লোলিত হত বহু অঙ্গ—আর—ফুললাজবরিষণে ভরে উঠত ধূলি ধূসরিত ধক্কিম চরণ… অবিস্মরণীয় সে দর্শন, শুধু দর্শনে…আর অনুভূতিতেই দেয় ধরা…মুখে তা বলা যায় না। সেই আনন্দতীর্থ দর্শনে যাবে সকলেই, চারখানি পান্‌সি ঠিক হয়েছে। স্ত্রী ভক্তেরা যাচ্ছে অনেকেই—সকলেই প্রস্তুত—জননী সারদা তখনও পেনেটি যাত্রার কোন সিদ্ধান্ত করেন নি। তাঁর ইচ্ছা যে নির্ভর করছে শ্রীঠাকুরের উপর। কোন

স্ত্রীভক্তের দ্বারা তাই তাঁরই ইচ্ছা জানতে পাঠান। স্ত্রীভক্তটি জিজ্ঞাসা করতেই শ্রীঠাকুর বলেন "তোমরা ত' যাচ্ছ, ওর ইচ্ছা হয় ত' চলুক। শুধু এইটুকু—জননীর কাছে এসে জানান স্ত্রীভক্তটি। শ্রবণমাত্র বোধস্বরূপিনী বুঝে নেন শ্রীঠাকুরের প্রকৃত ইচ্ছাটুকু। বুঝতে পারেন পূর্ণ অনুমতির কথা এ'নয়। অনিচ্ছার আভাস রয়েছে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দলীলা দর্শনের সমস্ত ইচ্ছা নিঃশেষে ফেলেন মুছে। মুখে জানান ভক্তদের—"অনেক লোক সঙ্গে যাচ্ছে, সেখানেও ভিড়, অত ভিড়ে উৎসব দেখা আমার হবে না, আমি যাব না।" ভক্তরা শ্রীঠাকুরের সঙ্গে যাত্রা করেন উৎসব মেলায়—আর জননী একলা থাকেন সেই নিত্যদিনের নিভৃতে। পরে সত্যসত্যই শ্রীঠাকুরের মুখে জানা যায় তাঁর পূর্ণ ইচ্ছাটুকু কি ছিল, "অত ভিড়, তার ওপর ভাব-সমাধির জন্য আমাকে সকলেই লক্ষ্য করছিল, ও সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছে, ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে ব'লত, 'হংস-হংসী' এসেছে। ও খুব বুদ্ধিমতী।"

পেনেটির মহোৎসবের পরেই শ্রীঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত—ধরণীর পুঞ্জীভূত পাপভার আপন শ্রীঅঙ্গে টেনে নিয়েছিলেন, তারই ফলস্বরূপ এই কঠিন রোগযন্ত্রণা···যুগে যুগে ক্রুশবিদ্ধ হতেই যেন তাঁর নেমে আসা।

যাই হোক, চিকিৎসার সুবিধার জন্য ভক্তদের চেষ্টায় শ্রীঠাকুরকে আনা হল শ্যামপুকুরের একটি ভাড়া বাটীতে। চিরগোপনবাস অভ্যস্থা জননীও এলেন এই বাড়ীতে—কোন অন্দরমহল না থাকা সত্ত্বেও। ছোট্ট সিঁড়ির পাশের একটি চাতালে নিলেন একটুখানি স্থান করে। এখানেও চলে গোপন সেবা। কখন যে স্নান সেরে উঠে যান কেউ জানতে পারে না। দিনের পর দিন ভক্ত সমাগমে পূর্ণ বাড়ীটিতে শতকর্ম্মের মাঝেও কেমন করে যে রাখেন আপন অবস্থিতিটুকু গোপন, ভাবতেও যেন লাগে বিস্ময়···শ্রীঠাকুরের গোপন ভাবে ভাবিতা জননীর পক্ষেই এ যেন সম্ভব। চিকিৎসার এখানেও হয়না সুবিধা···এর পর ভক্তেরা শ্রীঠাকুরকে নিয়ে আসেন কাশীপুরের বাগানবাটী। অবিশ্রাম উপদেশেরও ঘটে না বিরতি, এদিকে রোগ উপশমেরও কোন লক্ষণ যায়না পাওয়া···বালক অন্তরঙ্গদল গ্রহণ করেন সেবার ভার। চিকিৎসাও চলে যথারীতি। কিন্তু নিরাশার অন্ধকারই আসে ঘনিয়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী—শ্রীরামকৃষ্ণ-জগতে একটি স্মরণীয় দিবস···কাশীপুর বাগানবাটীর বিস্তীর্ণ উদ্যানে শ্রীঠাকুর সেদিন এসেছেন নেমে, বহু ভক্তের হয়েছে সমাবেশ...ক্ষণিকের আশার আলোয় সকলের হৃদয় যেন আজ উঠেছে দুলে ; ভক্তদের চোখে মুখে তারি মধুর দীপ্তি—আবার বুঝি ফিরে এল সেই দখিণাপুরের আনন্দচঞ্চল দিনগুলি। সহসা ঠাকুর করেন প্রশ্ন ভক্তবীর গিরিশ-চন্দ্রকে—"গিরিশ এটাকে তোমার কি মনে হয় ?" পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসভরা কণ্ঠে ভক্তবর দেন উত্তর···"বেদবেদান্ত যাঁর কথা বলে শেষ করেন নি আমি মুখে কেমন করে তাঁর কথা বলব, ভক্তের অপার বিশ্বাসের আবেগভরা কথায় করুণা বিগ্রহের নয়নে জেগে ওঠে কি এক গভীর প্রমাদদৃষ্টি, শ্রীহস্ত ভক্তবক্ষে অর্পণ করে শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন,

"চৈতন্য হোক"···চৈতন্যময়ের নিজ মুখের সেই চিন্ময় বাণী—ভক্তপ্রাণের সুপ্ত চেতনাকে তোলে উদ্বুদ্ধ করে···একে একে সকলেই পায় সেই করুণার পরসাদ। একটি ভক্তের বিশ্বাসের মহিমায় শ্রীরামকৃষ্ণকল্পবৃক্ষ-মূলে অমৃতফল লাভে সেদিন সকলেই হয়েছিলেন ধন্য···শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু নিত্য আর নিত্য, চিরসত্য ভক্তের অন্তরের খাঁটি বিশ্বাস।...

শ্রীঠাকুরের এই অপরূপ করুণার দানলীলার অব্যবহিত পরেই গলরোগ পুনরায় প্রবল আকার ধারণ করল—তার সঙ্গে ভক্তপ্রাণের ক্ষীণ আশাদীপটীও যেন হল নির্ব্বানোন্মুখ।

সর্ব্বংসহা অপার ধৈর্য্যময়ীর ধৈর্য্যের বাঁধ এবার আর থাকে না··· ছুটে আসেন শ্রীতারকেশ্বরে···বিশ্বনাথের দুয়ারে বিরহ সন্ত্রাসে এসে লুটিয়ে পড়েন চোখের জলে, দেবাদিদেবের কৃপা সম্ভাবনায়। নিরম্বু উপবাসে খিন্ন···শুষ্কতনু, যেন তপস্বিনী উমার তপশীর্ণ প্রতিমূর্ত্তি, অন্তরে একটি মাত্র প্রার্থনা—শ্রীঠাকুরের দেবদেহের সকল জ্বালা যাক দূরে। অবিশ্রান্ত অশ্রুধারে প্রার্থনাও চলে বিরামবিহীন। সে বিধুর দর্শনে পাষাণও বুঝি হয় বিগলিত! পর পর দুটি দিন এমনি ভাবে কেটে যায়···কোমল দেহলতা গেছে শুকিয়ে, যেন কৃষ্ণা একাদশীর চন্দ্রলেখা—পড়ে আছেন সমভাবে। সেদিন সারাটি দিন কেটে গেছে, ঘনিয়ে আসে গভীর রাত্রি···দুর্ব্বলতায় প্রার্থনার গভীরতায় জননীর দেহমন তখন আবেশে অবসন্ন...সহসা অন্ধকারের মোহজাল ভেদ করে জাগে এক তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ...জননী হয়ে ওঠেন সচকিত...যেন কতকগুলি মৃন্ময় পাত্র আঘাতে হল চূর্ণ বিচূর্ণ...গভীর বিস্ময়ের কথা যে, সেই শব্দটী হওয়ামাত্র মায়ের হল এক অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর... জননীরই শ্রীমুখের কথা···"রাত্রে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল, এজগতে কে কার স্বামী?

এ সংসারে কে কার? কার জন্যে আমি প্রাণ হত্যা করতে বসেছি! একেবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে—" "ঈশ্বরীয় ভাবের ইতি করা যায় না।" দক্ষিণেশ্বরঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা, তাহ'লে তাঁর ভাবের ইতি করা কেমন করে যাবে—সাধারণ বুদ্ধির মাপকাটীতে? ব্রহ্মস্বরূপিনী—কালস্বরূপিনী যিনি নিজের সৃষ্টি নিজেই প্রয়োজনে গ্রাস করতে সক্ষম···লীলা অবসানের প্রত্যাসন্নক্ষণে তার 'বিরাট মনে যে এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাবের উদয় হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরক্ষণেই মহামায়ার মন নেমে আসে ভাবাতীত রাজ্য থেকে। আস্তে আস্তে কোনরূপে উঠে মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল মুখে চোখে দিয়ে যেন একটু সুস্থ হন। পরের দিন জননী ফিরে এলেন শ্রীঠাকুরের সকাশে, সেই কাশীপুরের দেবালয়ে... প্রত্যাগত জননীকে দেখে শ্রীপ্রভুর মুখচন্দ্র মৃদুহাস্যে হয়ে ওঠে রঞ্জিত "কি গো কিছু হল?" জননীর মৌন মুখের পানে চেয়ে পরক্ষণেই বলেন তেমনি হাসি হেসে "কিছুই না।" কে বুঝবে এর অর্থ। চির-রহস্যাচ্ছন্ন এই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা লীলা......।

এর পরের কথা বলতে গিয়ে ভাষা হয়ে যায় মূক। জননীর সেই গভীর বিরহের কথা বলতে গেলে শুধু মরমী কবির কথাই মনে পড়ে:—

"বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশদিশ বিরহ হুতাস,
সহজে যমুনা জল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দ দাস।

জননীর যুগে যুগে সঞ্চিত এই অসীম বিরহের এক কণাও মানুষ পারে না ধারণা করতে...বহন করাত সুদূর পরাহত।

আর সে বিরহের সুরুই হল বাদল ভরা দিনে...এমাস যেন বিরহেরই মাস। শ্রীঠাকুর নিত্যলোকের স্বর্ণদেউলে, আর শ্রীঠাকুরের অদর্শনে ধরণীর শূন্য মন্দিরে বিরহব্যাকুলা জননীকে দেখে মনে হয় শ্যাম-বিরহিণীর কথা... "এ সখী হমারি দুখের নাহি ওর
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"
—বিদ্যাপতি

জননীরই মুখের কথা "আমি ঠাকুরের অদর্শনে পাগলের মত হয়ে গিছলুম।"

কিন্তু বিরহ অনন্ত এবং নিত্য হলেও, অনন্ত মিলন—নিত্য মিলনও যে অতি বড় সত্য...বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাব সম্মিলনই তার প্রমাণ। তাই যখন শ্রীরামকৃষ্ণবিচ্ছেদ-বেদনায় মুহ্যমানা মা সারদা লোকপ্রথা অনুসারে আপন শ্রীকরের কঙ্কন দুটি করেছেন উন্মোচন...সহসা ঠাকুরের প্রকাশ...জননীর হাত দুটি ধরে বললেন "আমি কি কোথাও গেছি গা? এ যেমন এঘর থেকে ওঘর।"

আবার বিচ্ছেদ বেদনার প্রবলতায় যখন জননীর দেহত্যাগের সঙ্কল্প হয়ে উঠেছে দৃঢ়

"পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব
বিরহ অনল দাহ তনু তেয়াগিব।

তখনও শ্রীঠাকুর দর্শনদানে তৃপ্ত করে বললেন, না "তুমি থাক, অনেক কাজ বাকী আছে।" তাই পরবর্ত্তী কালে মায়ের শ্রীমুখে "শেষে দেখলুম তাইতো অনেক কাজ বাকী...মর্ত্তের চিরবিরহে অমর্ত্তের চিরমিলন......।

এই কথায় মনে পড়ে যায় বহুদিনের কথা শ্রীঠাকুর আপনমনে গাইছেন আপন ভাব বিলাসে—

'এসে পড়েছি যে দায়ে, সে দায় বলব কায়
যার দায় সে আপনি জানে পর কি জানে পরের দায়।"

পরক্ষণেই মা সারদার দিকে চেয়ে বলেছেন "শুধু কি আমার দায় ? তোমারও দায়।" বুঝেছিলেন তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় তদ্‌গতপ্রাণা জননী সারদার দেহধারণের ইচ্ছা হবে চিরলুপ্ত। তারি জন্যে নানা ছলে নানা ভাবে গীতিছন্দে জানাতেন শত অনুরোধ, জননীকে ধরে রাখতে...এই অসীম আকুতি একি বিশ্বের দায় না নিজেরই দায়— না দুয়ে এক।

বলতেন, "কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল্ কচ্ছে, তুমি তাদের দেখবে।—আমি কি করেছি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী কর্ত্তে হবে।" এই বিরাট প্রয়োজনই ধরে রাখলো জননীকে মাটীর বুকে।

ঠাকুর নিত্যলোকে শুভাগমনের পরও শত সন্তানের আর্ত্তি, জননীর বিদায় পথের হলো যেন শত বাধা। ধুলার ছেলের ধুলা মুছিয়ে দিতে শ্রীঠাকুরের বিচ্ছেদবেদনার মাঝেও থাকতে হলো... তা নইলে বিশ্বার্ত্তিহারিণী নাম কেন ? জগদ্ধাত্রী ছাড়া জগৎকে আর কে ধরে রাখবে ?

তবু বুকের জ্বালা কি নেভে নি ? কোথা সেই দখিণাপুরের

চাঁদের হাট? আর কোথায় সেই ভাব গরগর তুনু গদাধরচন্দ্র বিনা এই শূন্য নগরী...

মন যেন আর টিকতে চায়না কোনমতে শূন্য লাগে হৃদয় দেউল শূন্য লাগে বাহির ভুবন...

তাই অসহ বেদনা বুকে নিয়ে, সর্ব্বত্যাগী কয়েকটি সেবকের সঙ্গে জননী করলেন শুভ তীর্থযাত্রা—বৃন্দাবনের পথে...। ছেলেদের বুকেও তখন জ্বলছে আগুন—তারা যেন আজ দিশাহারা তরণী। তাই জননীর সঙ্গে তীর্থপথে তারাও দিলে পাড়ি...বৈরাগ্যের দহন জ্বালাই হল যেন আঁধার পথের আলোর শিখা...।

মধ্যপথে দেওঘর হয়ে কাশীধামে নামলেন ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী। মর্ত্তের শিবলোকে চরণ পড়তেই শিবাণীর দেহমনে জেগে ওঠে দিব্য ভাবাবেশ...। বিরাট দেবতনু দেবাদিদেবের মহান্ আরতিদর্শন শেষে যখন ফিরে আসেন জননী আপন আলয়ে, তখন ভাবাবেশে টলমল অঙ্গ...সজোরে বিপুল পদক্ষেপে চলেছেন স্বর্ণ-কাশীর পথে সোনা ছড়িয়ে, ফিরে এসে তেমনি আবেশে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়লেন শুয়ে। বহুক্ষণ অতীত হলে ভাবলোক হতে মন সহজাবস্থায় আসে ফিরে। সহসা ভাব উদ্দীপনের কারণগুলি জননীর শ্রীমুখে, "ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।" বারাণসী যেন বিরাট ভাবের রাজ্য তাই শিবস্বরূপ ঠাকুরও সেখানে বিরাট...আর সেই ভাবে ভাবময় হয়ে জননীর চরণেরও জেগে উঠেছিল বিরাটের ছন্দ...মা যে আমার কালের বুকে নৃত্যপরা মহা-কালী। এর পর আবার যখন রামলীলাভূমি অযোধ্যা নগরী দর্শনান্তে মা ভক্তসঙ্গে যাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাতীর্থে...তখনও বিরহ ব্যাকুল অন্তরে পেলেন সান্ত্বনার প্রলেপ শ্রীঠাকুরের চিন্ময় দর্শনে...

শ্রীঠাকুরের হাতের ইষ্টকবচখানি, ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সেটি ছিল মায়ের হাতে...শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর সেটি জননী আপন হাতেই রাখলেন পরম যত্নে···সুরু করলেন নিত্য পূজা—সেদিন যখন শ্রীবৃন্দাবনের পথে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে গাড়ী··· জননী পথশ্রমে ক্লান্ত শয়ননিসন্ন অবস্থায় হাতখানি রেখেছেন গাড়ীর জানলায়, সহসা চকিত দর্শন···সেই জানলাতেই দেখেন শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখকান্তি··· বলছেন, "ওগো হাতে সোনার ইষ্টকবচ এমনকরে রেখেছ কেন? ওযে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।" চকিত দর্শনেও বুক ভরে ওঠে...তাড়াতাড়ি উঠে মা ইষ্টকবচ খুলে রাখেন—শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তির সাথে···। তখন থেকে সে কবচ হলো পূজার সামগ্রী......।

এরপর কল্পলোকে ভেসে ওঠে কানুহারা শ্রীবৃন্দাবন···চিরবিরহিনী রাধা আর বিচ্ছেদদগ্ধ তপ্তদীর্ঘশ্বাসে পরিপূরিত নিধুবন···আর উছলিত যমুনা—যেন অশ্রুজলের উজান···। সেই শূন্য ব্রজভূমি দর্শনমাত্র যেন জননীর শ্রীরামকৃষ্ণবিরহ নবরূপায়নে হয়ে ওঠে আকুলোচ্ছন্দ··· লীলাসঙ্গিনী যোগীনমা তখন বৃন্দাবনবাসিনী···তাঁর কণ্ঠ আকুল বাহুতে বেষ্টন করে সুরু হল মার বুকভাঙ্গা ক্রন্দন···যেমন করে একদিন কৃষ্ণচন্দ্রের বিরহে ললিতা বিশাখার কণ্ঠলগ্ন হয়ে করেছেন অজস্র বিরহাশ্রু মোচন...। আজও বুঝি তারি পুনরাবৃত্তি...দিন কাটে, কিন্তু বিরহের লীলাপীঠে এসে ক্রন্দনাবেগ যেন কোন মতেই হয়না প্রশমিত। অবশেষে আনন্দঘনতনু—শ্রীঠাকুরের ঘন ঘন দর্শন বিলাসে কিছু শান্ত হয় জননীর অন্তর। এখানে এসেও পুনরায় মা খুলতে হলেন উদ্যত শ্রীকরের সোনার বালাদু'টি—ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত সেই আভরন দু'টি। সীতার দর্শনকালে সেই মূর্ত্তির হাতে ছিল যেমন দু'টি বালা। ঠিক তার অনুরূপ বালাই শ্রীঠাকুর গাড়িয়ে দিয়েছিলেন জননীর হাতে। তা

হলেও আজ ঠাকুরের অদর্শনে কনককঙ্কন যেন মনে হয় শত বন্ধন··· কিন্তু খোলা আর হয় না...। চকিত জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দর্শনে শ্রীঠাকুর আবার তেমনি করেই নিষেধ করেন বালা খুলতে—বলেন, "তুমি হাতের বালা খুলোনা। গৌরদাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিও। কৃষ্ণ পতি যার তার বিধবা হওয়া নাই—সে চির সধবা।" মানসকন্যা গৌরীমা,—মুখে মুখে শাস্ত্র তাঁর। তিনি তখন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন —বৃন্দাবনেরই কোন নিভৃত স্থানে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎমাত্র জননী করেন প্রকাশ তাঁর দিব্যগভীর দর্শনের কথা···। জননীর মুখে এই অপরূপ দর্শনের কথা শুনে পরম আনন্দিত হয়ে গৌরমা প্রমাণ দেন মুখে মুখে বৈষ্ণবতন্ত্রের শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করে। তাঁরও মুখে শোনা যায় যে শ্রীঠাকুর তাঁকেও নাকি দিয়েছিলেন দর্শন এবং আদেশ দিয়েছিলেন জননী সারদাকে বৈষ্ণবতন্ত্র শ্রবণ করাতে।—

কি অপরূপ—যেমন ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ঠাকুর তেমনি তাঁর লীলা-সঙ্গিণী—সর্ব্বভাবে ভাবময়—। তাই এক এক তীর্থে দেখি এক এক ভাবের বিলাস। কখনও হয়তো চতুরাশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্টা জননী সকলের নয়ন অলক্ষ্যে চলে যাচ্ছেন নীল যমুনার ঘাটে। বহু অনুসন্ধানে তবে মিলছে যমুনার তীরে তাঁর দর্শন···সঙ্গিণীরা আনছেন ঘরে ফিরিয়ে। পরে কোন কোন ভক্তের কাছে তাঁর এই রূপের প্রকাশও করেছেন,—বলেছেন, "আমিই রাধা।"

কখনও আনন্দচঞ্চলা বালিকার মতই ঘুরেছেন বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণদর্শনে আনন্দে বিভোর···কখনও বা নিধুবন সান্নিকটস্থ রাধারমণের শ্রীমন্দিরে রাধারমণের চিন্ময়দর্শনে হয়ে পড়েছেন আবেশে আকুল···আর ভাবনেত্রে দর্শন কচ্ছের্ন, কোন ভক্ত মেয়ে যেন চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে ব্যাজনের দ্বারা করছেন সেবা···এই দেব-বিগ্রহের

নিকটেই জননী জানিয়েছেন প্রার্থনা—অদোষদর্শিতার জন্য…যেমন করে দখিণাপুরে চাঁদের পানে চেয়ে জানাতেন নিদাগ হবার প্রার্থনা। একি অপূর্ব্ব দীনতা…দীনাবতারের লীলাসঙ্গিনী…তাই দীনভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখি জননীরও জীবনে।

পরবর্ত্তী কালে সন্তানগণ দেখেছেন যে কতখানি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতেন বৃথা পরনিন্দা পরচর্চ্চায়…জননীর সম্মুখে তো দূরের কথা পাশের ঘরেও যদি শুনেছেন পরের সমালোচনা—তীব্রকণ্ঠে তীব্র ভৎর্সনায় তা প্রতিবাদ করেছেন,—ছিদ্রানুসন্ধানকারীর কথা বলছেন, "লোকে কাপড় ময়লা করে, ধোপা সেই কাপড় সাফ ক'রে দেয়। লোকে খারাপ কাজ করে, আর যারা সেই কাজের চর্চ্চা করে তারাই তাদের পাপের ভাগী হয়।"

এইবার সুরু হল জননীর গুরুভাবের বিকাশ—এই পুণ্য ব্রজধামেই খুলে গেল জননীর প্রধান লীলার একটা দিক। অফুরন্ত কৃপার ধারায় বিশ্বকে অমৃতায়িত, পরিপূরিত করবার ঐ এক নূতন লীলা… যে লীলা হয়নি কোন অবতারে, এমন কি শ্রীঠাকুরও যে লীলা রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন আকারে। মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের কথা, "আমি কি করেছি, তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।"

তখনও জননী অবগুণ্ঠনবতী। দু'একটি বালক সেবক ব্যতীত

কোন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানের সঙ্গে তখনও হত না কোনরূপ বাক্যালাপ …সহসা শ্রীঠাকুরের দর্শন…জননীর প্রতি গভীর নির্দ্দেশ বালক যোগেনকে দিতে হবে দীক্ষা। এমনকি ইষ্ট নির্দ্দেশ করে দেন।… প্রথমেই জননী হন না রাজী। ক্রমাগত তিনদিন ধরে ঠাকুরকে দিতে হয় দর্শন এবং আদেশ দুই-ই। তিনদিন পর সহসা সেদিন জননী পূজার আসনে উপবিষ্টা…ক্রমে পূজা করতে করতে হয় এক অদ্ভুত ভাবাবেশ ভাবমগ্ন অবস্থায় সন্তান যোগেনকে করলেন দীক্ষিত। শোনা যায় পাশের ঘর থেকে নাকি তাঁর ভাবে উদ্বেলিত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ গিয়েছিল শোনা…। স্বামী ত্রিগুণাতীত—স্বামী যোগানন্দ মা সারদার প্রথম দীক্ষিত সন্তান।

তার মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীতই সর্ব্বপ্রথম শ্রীঠাকুরের লীলাকালেই তাঁরই নির্দ্দেশে জননী দিলেন তাঁকে দীক্ষা…তখন তার পরিচয় বালক সারদাপ্রসন্ন…বিস্ময়ের কথা—দীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু গুরু-শিষ্যের মধ্যে হয়নি চাক্ষুষ সাক্ষাৎ…নহবতের নিবিড় অন্তর থেকে ভেসে এসেছিল মা'র মন্ত্রোচ্চারিত মৃদুকণ্ঠ আর বাহিরের কৃপাপ্রার্থী বালকের মর্ম্মে মর্ম্মে, আত্মায় আত্মায় তা হয়েছিল গ্রথিত। করজপের সময় শুধু জননীর বরদ হস্তখানি দেখেছিলেন বালক ত্রিগুণাতীত। আর আজ মার চরণাশ্রিত সন্তানরূপে পরিগণিত হলেন মা তাঁর এক সেবক সন্তান—আদরের ছেলে যোগীন। মার কথা, "শরৎ আর যোগীন—এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।" কোমলস্বভাব যোগানন্দ মা'র কাছে তাঁর ছিল একটি অদ্ভুত আব্দার—"মা আমি তোমার মেয়ে—তুমি আমাকে যোগা যোগা বলে ডাকবে।"

শুদ্ধসত্ত্বময়ী জননী ভক্ত ছেলেদের কাছ হতে চিরদিন নিজেকে রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন ক'রে—লোকশিক্ষা ব্রতে। বলতেন, "বাবা মানুষের

ছাল তো।" তাই চিরশুদ্ধ সন্তানও বুঝি নিজেকে প্রকৃতি ভাবে রেখে জীবনভোর করেছিলেন মাতৃদেবীর সেবা।

গুরুভাবে অধিষ্ঠিতা হয়েও সন্তানের কল্যাণের প্রয়োজন ব্যতীত কোনদিন মা কোন ভক্তসেবক, দীক্ষিত সন্তানকেও আদেশের ভঙ্গীতেও বলেননি কোন কথা···সন্তানদের দীক্ষা দান কালে শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তির পানে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বলেছেন, "ঐ উনিই গুরু" শ্রীরামকৃষ্ণময়ী সারদা।

বৃন্দাবনে সেদিন প্রভাতে জননী গভীরভাবে সমাধিস্থ। ভক্ত মেয়ে যোগীনমা শোনাতে সুরু করেন নাম...কিন্তু সমাধি আর ভাঙ্গে না··· লীলায় মন আর নামে না—অবশেষে আসেন স্বামী যোগানন্দ—তাঁর আকুল কণ্ঠের অমৃতময় নাম বুঝি পশে জননীর শ্রবণে···ধীরে ধীরে দেহে আসে যেন বাহ্য চেতনার আভাস···তখনও ভাবে বিলসিত তনুমন —আধো—আধো বুলি। সহসা একি! বলে উঠলেন, "খাব"। সকলে চমকে ওঠে—এ কার আধো ফোটা বুলি? চিরদিনের চেনাকণ্ঠ এ যে ঠাকুরের কণ্ঠ মনে হয়—। সেবক নিয়ে আসে ভোগ এবং জলপাত্র···ধরে দেয় ভাব গরগর শ্রীমুখে···বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে দেখে সকলে জননী গ্রহণ করছেন অন্নাদি, যেমন ভাবাবেগে গ্রহণ করতেন ঠাকুর নিজে। পানের অপর দিক দাঁতে কেটে নিচ্ছেন পান; পান খাবার এই রীতিও ছিল শ্রীঠাকুরের চিরদিনের—ভক্তদল পরমানন্দে বিভোর···স্বামী যোগানন্দ করেন কয়েকটী প্রশ্ন—সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরও মেলে আবেশ বিভোর জননীর কণ্ঠে—যেমন করে ঠাকুর দিতেন উত্তর·· কইতেন কথা—ঠিক তেমনি করেই। ধীরে ধীরে আবেশ যায় কেটে। সকলেই বোঝে আর জননীও প্রকাশ করেন সেই কথা··· মা সারদা সর্ব্বকালেই শ্রীরামকৃষ্ণময়···তবু মাঝে মাঝে ভক্তদের চক্ষে

বিচ্ছুরিত শক্তির মত বাহিরে হয় তার ক্ষণপ্রকাশ···। মনে পড়ে মায়ের মুখে যুগাবতারের বেদগাথা শ্রবণে কোন ভক্ত হয়ে উঠেছেন দর্শন ব্যাকুল···গভীর আক্ষেপের সঙ্গে ব্যথা জানান, “মা ঠাকুর শরীর ধারণ ক'রে জগতে এলেন, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম না।” সন্তানের আকুলতায় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলেন জননী, আপন দেবদেহের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, “এর ভিতর তিনি সূক্ষ্ম-দেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছিলেন,—“আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।” শ্রীঠাকুরময় জননীর শ্রীমুখের এই বাণীটির মাঝেও ফুটে উঠেছে যেন শ্রীঠাকুরেরই কথনভঙ্গী,—“এর ভিতর তিনি”—অনুরূপ বাণীগুলি শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে বহুবার শোনা গেছে।

বৃন্দাবনে পায়ে হেঁটে পঞ্চকোশী পরিক্রমা—হরিদ্বার, জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনও জননী করেছেন ভক্তসঙ্গে। পরে বৃন্দাবন হয়ে দীর্ঘ একটী বৎসর অন্তে ফিরে এলেন কলকাতায়—শ্রীবলরাম মন্দিরে।

তিল তিল করে জ্বালিয়ে দেওয়া যে আগুন জ্বলেছে জীবনকুণ্ডে, নিত্যদিনের দুঃখকে বরণ করে জননী এবার যেন যোগালেন তাতে সমিধরাশি···সাধ করে স্বেচ্ছায় উমামহেশ্বরী যেন জ্বাললেন তপস্যার আগুন—জ্বলবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায়···। কলকাতা হতে চলে এলেন কামারপুকুরে···শ্রীঠাকুরের লীলাবিজড়িত স্মৃতির তীর্থে···সঙ্গে ছেলে যোগেন আর সঙ্গিনী গোলাপ-মা। কিছু রেলপথে এসে হ'ল অর্থের অনটন···তখন সুরু পদব্রজে তীর্থযাত্রা···এমন যাত্রায় চির অভ্যস্থা ছিলেন আমাদের সর্ব্বংসহা জননী।

কামারপুকুরে মাকে দেব-মন্দিরে রেখে স্বামী যোগানন্দ পাড়ি দিলেন তীর্থের আদিশ পথে···বুকভরা তপস্যার আকাঙ্ক্ষায়। এদিকে তিতিক্ষার প্রতিমূর্ত্তি···

মায়েরও সুরু হ'ল দুঃখের তপস্যা। রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্য নাথ···মাসে মাত্র সাতটি করে টাকা দিতেন, সেটীও স্থানীয় কর্ম্মচারী খাজাঞ্চির ঈর্ষায় বিয়োধিতায় হ'ল বন্ধ···খবর পৌছয় গিয়ে ঠাকুরের নরেনের কানে...ছুটে আসেন নরেন্দ্রনাথ···শত অনুরোধ জানান বীর সন্ন্যাসী নিজে,—মাত্র একটী টাকা যাতে বন্ধ করা না হয়। কিন্তু প্রখর অনল এই ঈর্ষানল। মানুষের সমস্ত মনুষত্বকে করে ফেলে ভস্মীভূত···। তাই নরেন্দ্রনাথের কথা কাণে তোলে না কেউই।

মায়ের শ্রবণ গোচর হয় সে কথা—কোন ক্ষোভের আভাস যায়না পাওয়া···শুধু বলেন, "বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আর আমি কি করব।" মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের কথা—বলেছিলেন, "হরিনাম করবে, শাক বুনবে আর খাবে।" রঙ্গচ্ছলে যেন অতি সহজ পথের কথাই বলেছিলেন—জননীর নয়নে বুঝি ভেসে উঠেছিল ভবিষ্যতের এই করুণ চিত্র-খানি·· কিন্তু তাতে কোন চিন্তা নেই···কোন ক্ষোভ নেই, জগতের সবরকম দুঃখকে সহজভাবে বরণ করে নিতেই যেন এবার আসা ...এখন থেকে শুধু শাকান্নই হ'ল নিত্য দিনের আহার···কোনদিন বা নূনটুকুও জোটেনা—শুধু অন্ন। এ দুঃখ মনে হয় না দুঃখ... অসহ ব্যথা হয়ে বাজে শুধু শ্রীঠাকুরের অদর্শন···মাঝে মাঝে নয়ন দর্শনতৃপ্তও যে হয় না তা নয়···। কোনদিন শিশুসুন্দর বেশে এসে আব্দার ধরেন ঠাকুর খিচুরী রেঁধে দেবার জন্য···পরম পরি-তৃপ্তির আনন্দে জননী ঠাকুরের সে আব্দার করেন পূরণ, কোনদিন বা বলেন কত গভীর উপদেশের কথা···। আবার যেদিন পল্লী-বাসীর নানা মন্তব্যপূর্ণ আলোচনায় মা খুলেই ফেললেন শ্রীকরের কঙ্কন দুটি···এবার আর সহজভাবে বাধা এল না—এল অন্যভাবে।

তাঁর থাকত করুণ নয়ন নিত্য সজল। আজ তাঁর চোখের অশ্রু আর বুঝি বাধা মানে না···কেঁদে প্রার্থনা জানান—তোমার ছেলেরা ঘুরবে পথে পথে···পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আশ্রয় নেবার মত একটি ঠাঁইও তাদের মিলবে না ঠাকুর। সে প্রার্থনা হয়েছিল সফল। পরে বলেছেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হলো।" আজ রামকৃষ্ণ কল্পতরু অগণিত পথ-চারীদের কলগুঞ্জনে নিত্য মুখরিত।

সেখান হতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাটীতে হলো তাঁর স্বল্পকাল স্থিতি সেখানে সারদা, গৌরী, জয়া, বিজয়া, যোগীনমা, গোলাপমার সাহায্যে কাঠোর তপোশ্চর্য্যায় কাটান দিবানিশি। কোনদিন গভীর সমাধি ভঙ্গে জননী সঙ্গিনীদ্বয়কে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, "ও যোগীন আমার হাত কই, পা কই"।—লীলা সঙ্গিনী শ্রীচরণ শ্রীকর কমলে স্পর্শ করে ভাঙ্গেন জননীর সমাধির দিব্য আবেশ। সে ভাবের আকুল আবেশ জড়িয়ে থাকে তনুমনে সর্ব্বক্ষণ একাধিক দিবস ধরে। দেখতেন যেন নানাবর্ণের জ্যোতিতে ঘিরে আছে নিজের কাঞ্চন তনু।

কিছুদিন পর আবার তীর্থের পথে দেখি জননীকে—সাঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে পুরীর দিকে যাত্রা করেছেন। তখন ১৯২৫ সালের শীতার্ত্ত অগ্রহায়ণ। শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের পথ তখন অতীব দুর্গম। তখনও রেলপথ হয়নি···। কিছুদূর ষ্টীমারে যাত্রা করে গরুর গাড়ীতে পথ অতিক্রম করতে হলো। আজীবন মাতৃসেবক সারদাসন্তান—সারদানন্দ, সারাটি রাত ধরে ইন মার গাড়ীর চালক। গাড়ী হাঁকিয়ে নিশান্তের প্রথম আলোয় এলে জননীকে পৌঁছে দেন শত তীর্থের লীলাভূমী ভারতের অন্যতম তীর্থে, শ্রীশ্রীপুরীধামে।

উষার প্রথম আলোয় দর্শন হলো জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ। পরে ভক্ত বলরামের ক্ষেত্রবাসীর মঠ খানি হলো জননীর কিছুদিনের বাস-

ভবন। অপূর্ব্ব দর্শন হয় ভাবনেত্রে। শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে মুক্তি দাত্রী আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছেন, শত শত সন্তানের মুক্তির কল্পনায় বলেছেন, "যখন রথের সময় পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করি, এত লোক জগন্নাথ দর্শন করছে দেখে আনন্দে—কাঁদলুম—। ভাবলুম আহা, বেশ, এত লোক মুক্ত হবে।" পরক্ষণেই বুঝি দিব্য দৃষ্টি ছুটে যায়, সেই দর্শন ব্যাকুল তীর্থযাত্রীদের গভীর মানস রাজ্যে যেখানে স্তরে স্তরে জমে আছে—বাসনার গহিন আঁধার-মুক্তির আলো সেখানে তো প্রবেশ পথ পায়না খুঁজে। তাই বলেন শেষে দেখি, "যে না, যারা বাসনা শূন্য সেই এক আধটিই মুক্ত হবে।"...শ্রীজগন্নাথকে দেখেন যেন শিবসয়ম্ভু—দেবাদিদেব—হিমধবলকান্তি। লক্ষ শালগ্রামের বেদীর উপর উপবিষ্ট দেবাদিদেব। বলেন ভক্তদের, "জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ—রত্নবেদীতে বসে আছেন। আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা ক'রছি। রূপময়ী কমলার রম্যরূপ পুরুষোত্তমের চরণ-নন্দিতা জননীর এরূপ ত' নিত্যলোকের রূপ। এখানে প্রকাশিত হয় এক আকুল করা ভাব বিলাস...জগন্নাথের দেবায়তনে বিগ্রহ দর্শনার্থে বক্ষাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে এসেছেন যেন কার চিন্ময় চিত্র... শ্রীঠাকুরের দিব্য প্রতিকৃতি। শ্রীঠাকুরের সর্বতীর্থ দর্শন হয়েছিল, বাকী ছিল শ্রীজগন্নাথ আর গয়া...তাই জননী নিয়ে এসেছেন দেবদয়িতের চিত্রখানি বিগ্রহ দর্শনার্থে..."ঘটপট ছায়া কায়া সমান কিনা।" দেব মানব ভাবের অপূর্ব্ব সংমিলন...।

চারটি মাস শ্রীক্ষেত্রে দেবদর্শনে অতিবাহিত করে, মা অন্তরঙ্গ সন্তান সাথে ফিরে এলেন কলকাতায়। সেখান থেকে আবার শ্রীঠাকুরের লীলা তীর্থ কামারপুকুরে। এধামে সুদীর্ঘ একটি বৎসর কাটিয়ে এলেন ভক্ত বলরাম মন্দিরে—এই বৎসরেই বৈশাখের প্রথম দিবসে মা'র

শ্রীচরণ প্রান্তে মাথা রেখে ভক্ত বলরাম বিদায় নিলেন ধূলার ধরণী থেকে…শ্রীরামকৃষ্ণ লোকের মহাপ্রস্থানে। শ্রীঠাকুরের ভক্ত রসদ্দার —একান্ত কৃপার পাত্র। তার প্রমাণ পাই শ্রীঠাকুরের, স্নেহের অপূর্ব্ব প্রকাশে, শ্রীঠাকুর তখন দেহে…ভক্ত বলরামের সহধর্ম্মিনী অসুস্থা… ঠাকুর চির অবগুণ্ঠিতা জননীকে করেন আদেশ, "যাও দেখে এসোগে।" মা জানান জনবহুল রাজ্যে কেমন করে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে শোনেন ভক্তের প্রতি গভীর দরদ ভরা বাণী, "আমার বলরামের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে আর তুমি যাবেনা! হেঁটে যাবে, হেঁটে যাও।" সেবার পাল্কী পাওয়া গেলেও শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে তিনি আবার যখন অসুস্থ হন তখন জননী সকল দ্বিধার আড়াল ঠেলে ছুটে এসেছিলেম ভক্ত মেয়ের রোগশয্যায়।

…ভক্ত ভবনে সেদিন সন্ধ্যায়—মা অন্তরঙ্গ সঙ্গে ধ্যান-মগ্না…সে ধ্যানের পরিণতি হয় সুগভীর সমাধিতে…সে সমাধি যেন আলোর দেশে জননীর রূপাভিসার। সেখানে স্বরূপ হয় দর্শন—নিজেকে দেখেন যেন অপরূপা রূপময়ী…পরম সোহাগে আদরিনী মেয়ের মত তাঁকে সকলে সেখানে যেন বসাচ্ছে গদাধরসুন্দরের পাশে…নারায়নী বলেন, "সে যে কি আনন্দ বলতে পারিনি, একটু হুঁস হ'তে দেখি শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি কি ক'রে এই শরীরটার ভেতর ঢুকব? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছা হাচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁস এল।"

এর পর জৈষ্ঠ্যমাসে বেলুড়ে মুস্তুরীর বাড়ীতে হয় অবস্থান… জননীর বিশ্বজয়ী সন্তান, বিবেকানন্দ, এইখানে একদিন এসে হলেন উপস্থিত কারণ পরিব্রাজকের বেশে তিনি চলেছেন দূর পাশ্চাত্যে, জয় যাত্রায়।…বিদায়ের আগে মা'র চরণে অঞ্জলি দিয়ে গেলেন তাঁর

সুমধুর আত্মভোলা কণ্ঠের সঙ্গীত অর্ঘ্য···আর পাথেয় নিলেন মায়ের বুক ভরা আশীষ···।

কিছুদিন পর এখানে থেকেও মা সারদাকে স'রে যেতে হয় বরানগরে···সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াবাটীতে ; দেবদেহ তখন অসুস্থ··· সেখানে সেদিন ঘটল এক অপূর্ব্ব লীলা—ভক্তবর গিরীশের সেদিন প্রথম মাতৃচরণ দর্শন।···ভক্তবর কম্পিতকলেবর, অশ্রুসজল নেত্রে মাতৃচরণে হয়েছেন সাষ্টাঙ্গ প্রণতঃ···নিকটে তিন বৎসরের মূক শিশুপুত্র ···ভক্তিতে, ভাববিহ্বলতায় জড়িতকণ্ঠে বলেন, "মা গো! এই ছেলের জন্যই আজ অভাগার ভাগ্যে ঘটল শ্রীচরণ দুটির দর্শন।"

পুত্রটীর জীবনের আছে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস···জানিনা তা কতখানি সত্য।···গিরীশচন্দ্র একদিন প্রভুসকাশে জানান সকরুণ আবেদন, "তোমায় আবার আসতে হবে, আমার পুত্র রূপে···তোমায় চাই আমি আপন করে পেতে ; চাই তোমায় প্রাণভরে সেবা করতে ; —ঠাকুর হন না রাজী···পরে যেন হয়ে যান মৌনগম্ভীর ; কিন্তু লীলাবসানের কিছুপরেই গিরীশচন্দ্র লাভ করেন একটি দিব্যপুত্র···"পাঁচসিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস" দিয়ে গিরীশচন্দ্র করেন তার অকুণ্ঠসেবা··· কিন্তু মাত্র চারটি বছরেই শিশু শেষ করে ধরণীর লীলা—সেই শিশুরত্নই সেদিন গিরীশচন্দ্রের মাতৃদর্শনের উপলক্ষ্য···মায়ের শ্রীমুখে শুনি, "সেই ছেলে কেবল কাপড় ধরে টানে আর ওপর দিকে আঙ্গুল দেখায়।" তারি ব্যাকুল ইশারায়, আব্দারে গিরীশচন্দ্র না এসে পারেন না···কি জানি, শিশুরূপে কে দুদিনের লীলা ক'রে গেলেন দিব্য-চেতনাটুকু নিয়ে, ভক্ত না ভগবান?···'

১৩০০ সালের কথা···তখন জননী নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বেলুড়ে—সুরধুনীর শ্যামতীরেই মা'র এই বাসভবনটী।··· সেদিন হল এক অপূর্ব্ব দর্শন, দুকূলপ্লাবী জাহ্নবীর গৈরিক বন্যায় শ্রীঠাকুর যেন চকিত দর্শন দিয়ে নেমে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কনক-তনু স্বর্ণপ্লাবনে গলিত হয়ে, হয়ে গেল একাকার···কোথা হতে এসে দাঁড়ালেন সপ্তলোকের ঋষি নরেন্দ্র নাথ—বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি ভ'রে সেই মুক্তির মুক্তাধারা ছড়িয়ে দিলেন চতুর্দ্দিকে, আর কূলস্থিত অসংখ্য মুক্তিকামী মানব যেন সেই পূতস্পর্শে সদ্য মুক্তির আনন্দে চলে যায় অমৃত লোকের দিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অমৃত বিলিয়ে দেবার ভার যে ছিল তাঁর ওপর, সপ্ত-লোকের ঋষি তাইতো নেমে এসেছিলেন সাতসায়র সেঁচা সমাধির সুখ ছেড়ে। কিন্তু এই অপরূপ দিব্যদর্শনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে মা'র মন...রাঙাচরণ আর চলেনা গঙ্গার বুকে...এত' শুধু গঙ্গা নয়··· এ যে হরির শ্রীঅঙ্গ সঙ্গায় হয়েছে হরিময়—বিগলিত গদাধর এ যে তাঁর রূপ জাহ্নবী—

সেদিন এলেন ভক্তচূড়ামণি শ্রীনাগমহাশয়, দীনাবতারের দীন ভক্ত, দীনতার মূর্ত্ত আদর্শ...শোনা যায় সেদিন দর্শনের পূর্ব্বে সারাটি দিন শুধু বালকের মত অশ্রুসরস কণ্ঠে মা মা বলে ডেকেছিলেন—সেদিন শ্রীচরণে নিবেদন করিতে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কিছু মিষ্টান্ন আর সরু

লাল পাড় ধুতি···তাদের নিয়ে ছোট্ট তরণীখানি এসে লাগল উদ্বো-ধনের ঘাটে; মায়ের চরণচিহ্নিত তীর্থঘাটে এসেই ভক্তচরণ যেন ধুলায় আর পড়েনা। বেপথু ভাববিকম্পিত শীর্ণ দেহ যেন হয়ে প'ড়ে আবেশে অক্ষম। যেন একান্ত মার কোলের শিশু...মুখের সব কথা যায় হারিয়ে···আবেগে বাষ্পাচ্ছন্নকণ্ঠে "শুধু জয় মা—জয় মা" নয়ন অশ্রু-অন্ধ...চলবে কে? ছুটে আসেন স্বামী প্রেমানন্দ, ঠাকুরের দরদী বাবুরাম; আবেশে অবশ দেহখানি তুলে ধ'রে ধ'রে নিয়ে আসেন জননীর দেউলতটে···তখনও দূর হতেই জানায় ছেলেরা মা'র চরণে প্রণাম, নাগমহাশয়ও সে নিয়মের করলেন না ব্যতিক্রম। দেউল সোপানে সুরু করলেন মাথা খুঁড়তে...বাধা দিতে ক্রটী করেন না সন্ন্যাসীবৃন্দ—কিন্তু ভাবোন্মাদকে নিরস্ত করবে কে? আপন মনে নাগমহাশয় করে চলেছেন নিজের কাজ···মন্দিরের দাসী এসে জানায়, "মা নাগমহাশয় কে? তিনি প্রণাম করেছেন—কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন মনে হয় রক্ত বেরুবে। পাগল না কি মা?" দাসী বলেছিল ঠিকই। ভাবোন্মত্ত নাগমহাশয়কে বাহিরের দৃষ্টিতে উন্মাদগ্রস্ত দেখা ছাড়া আর কেই বা বুঝবে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মা—"ওগো শরৎকে বল এখানে পাঠিয়ে দিতে।"—ধ'রে ধ'রে আনেন শরৎ মহারাজ। সে এক অদ্ভুত রূপ., সে রূপের বর্ণনাখানি দেন মা নিজেই, "শরৎ নিজেই ধ'রে নিয়ে এল, দেখি কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, হেথায় পা ফেলতে হোথায় পড়ে, হোথায় পা ফেলতে হেথায় পড়ে। চোখের জলে আমায় দেখতে পাচ্ছেনা। আমি ধ'রে বসালুম। কেবল মা মা শব্দ—যেন পাগল অথচ শান্ত, ধীর স্থির···।"···সে এক অপরূপ দর্শন আপনহারা ছেলে পেয়েছে মায়ের দুখ জুড়ানো কোল, মা'র সোহাগে গর গর···

নাগমহাশয়ের সেকি আকুলতা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের সঙ্গে অজস্র প্রেমাশ্রু-ধারে জননীর চরণ কমল হয়ে ওঠে শিশিরসিক্ত, সযত্নে তুলে বসান, মা মুছিয়ে দেন, স্নেহাঞ্চলে সন্তানের অশ্রুরাশি···এদিকে নিবেদনের বস্তুগুলি বুঝি আর হয় না বিধিমত নিবেদন করা···সকল বিধির পারে যে ঠাঁই, সেখানে বিধিই যে হয় বন্ধন, তাই তাঁর সযত্নে আনা মিষ্টি··· মা স্বয়ং করেন গ্রহণ আর সোহাগ ভরে তুলে তুলে প্রসাদ দেন ভাবপাগল ছেলের মুখে···সে এক আরো অপরূপ দৃশ্য···জানিনা কোন্ অলকার শোভায় আছে এত সুষমা···স্নেহব্যাকুলা জননী খাইয়ে দিচ্ছেন তাঁর সন্তানকে।

আর মায়ের আদরে নাগমহাশয়ের সে ভাবঘোর আর ভাঙ্গেনা··· আনন্দে আত্মহারা···। খেতে আর পারেন না, শুধু মায়ের শ্রীচরণ দুটিতে হাত দিয়ে বসে আছেন আর বলছেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।" মা দিলেন একখানি কাপড়··· ভক্তমাথে সেটি হয় শিরোভূষণ। সেদিনকার মত বহুক্ষণ পরে সেই আধোভাঙা ভাবাবেশেই বিদায় গ্রহণ করেন নাগমহাশয়...সেদিনকার মত সারা হয় বাৎসল্যের অপরূপ মিলন লীলা। নাগমহাশয় বিদায় মুখে শুধু বলে গেলেন তাঁর সারা জীবনের সাধনবাণী "নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ আমি কিছু নই" সব তুমি, অতি অপরূপ···এই দীনবেশধারী মহাপুরুষের কথায় জননীর শ্রীমুখে শুনি, "কত ভক্তই তো আসছে এমনটি আর দেখিনি।"

কোনদিন বা এসেছেন নাগমহাশয় আমের টুকরি মাথায় নিয়ে, কিনা, মাকে নিজে বসে খাওয়াবেন···অথচ বলবেন না কিছু মুখে, বলবেই বা কে? ভক্তির চরম অবস্থায় যার দিব্য প্রকাশ, সেই ভাব-তন্ময়তায় চিরপ্রতিষ্ঠিত নাগমহাশয়ের বাহ্যজ্ঞান অধিকাংশ সময়েই

থাকত না বললেই চলে…তারপর মাতৃনামে, ঠাকুরের নামে, দর্শনে আরো যেন হয়ে পড়তেন আপনহারা…জলভরা প্রেমচক্ষুদুটি দেখলে বোঝা যেত প্রেমের ঠাকুরের প্রেমিক ভক্তই বটেন…মার কথায়, "আহা কি প্রেমচক্ষুই ছিল তার—রক্তাভ চোখ, সর্ব্বদাই জল পড়তো।" সেদিন এসে আকুল হয়ে শুধু ঘুরছেন মৌন নির্ব্বাক হয়ে। মা'র কথায় যেন "কাঙাল হয়ে" ঘুরছেন…কারো কথার কোন উত্তর আর দেন না। অবশেষে আসে মার আহ্বান। নাগমহাশয়কে পাঠিয়ে দেবার আদেশ দেন মা, সারদানন্দ মহারাজকে…তখনও একেবারে বিহ্বল নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রু, আর মুখে মা—মা…ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হল সেই আম, মাও নিলেন পাগল ছেলের নৈবেদ্য… তারপর ঘটনা শুনি মার মুখে "পাতা দেওয়া হলে পাত থেকে প্রসাদ উঠিয়ে বললুম খাও। কে খাবে? তার শরীরে হুশ নেই—হাত যেন অবশ। আমি ধ'রে বলতে বলতে খেলে ত' নাই একখানা আমনিয়ে মাথায় ঘসতে লগলো।—আমি শরৎকে বলে পাঠাতেই সে লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেল। প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলিয়ে দিলে অন্নপ্রসাদ আর নিলে না। কিছু বাদে হুঁস হতেই নাকি চলে গেছে খবর পেলাম।"

ভক্তের চোখের জলে ভেজে কমল চরণ কিন্তু বুকের জ্বালা সে যেন নিভতে চায় না কোনমতে, সে জ্বালা যেন তুঁষের আগুণের মত…।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিরহব্যাকুলা মা আমার, বুকভরা জ্বালা তাঁর নিত্য সাথী তাই বুঝি ফেরেন তীর্থের পথে পথেই একান্ত উদাসীন…কিন্তু সাত সমুদ্র মেটাতে পারেনা চাতকের তৃষ্ণা। মার সে জ্বালা যেন বোঝেন মেয়ে যোগীন; তাঁরও জ্বালা কম নয়—তাই মাকে দেন পরামর্শ "মা চল আমরা পঞ্চতপা করি তবেই মনের আগুন নিভবে।—"

জননীর স্মৃতিপটে যেন ভেসে ওঠে কিছুদিন পূর্ব্বের একটি দর্শন স্মৃতি…কিশোরী এক সন্ন্যাসিনী…গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত অঙ্গাবরণ…রুক্ষ এলায়িত কেশপাশ…কণ্ঠে দোদুল্যমান রুদ্রাক্ষের মালা—কুমারী যোগেশ্বরী মূর্ত্তি…সাথে সাথে ফিরছে আর দিচ্ছে যেন কিছু করবার ইঙ্গিত। আর মার দিব্য চেতন সত্ত্বায় উঠছে একটি গভীর বাণী "পঞ্চতপা"। আজন্ম সরলা মা সারদেশ্বরী জেনেও যেন জানেন না—এ বাণীর অর্থ…তাই বলেন, "পঞ্চতপা কি জানতুম না, যোগেনকে বললুম পঞ্চতপা কি ?" সেই পঞ্চতপাই আজ করতে বলেন যোগীনমা…মনের আগুন নিভাতে ধূধূ করে জ্বলে ওঠে……বাহিরে সপ্তজিহ্বা অগ্নিরদীপ্ত শিখা…অন্তরের আগুন বাহিরের সঙ্গে যায় একাকার হয়ে মনে হয় শিবসুন্দরের ধ্যানঘোর ভাঙতে দৃঢ়ব্রতী…তপোময়ী শিবাণী…চারিদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড আর মাথার উপর গগনের হোমকুণ্ডে সদ্য জলে উঠেছে প্রভাতী অরুণের রক্তিমশিখা…প্রথম দর্শনেই মানবী দেবীর মনে যেন জাগে ভয়ের আভাস। তাই বলেন, "প্রাণে বড় ভয় হ'ল কি করে এর ভেতর যাব আর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বসে থাকব।'—যোগীন মা দেন অভয়, "এস মা কোন ভয় নাই,"

কোমলা বালিকার মত অভয়া পেয়েছেন ভয় আর অভয় দিচ্ছেন ভক্ত…দেহ ধারণ করলে সবই মানতে হয় কিনা…আর "থিয়েটারে যে রাজা সেজেছে সে রাজার মত ব্যবহার করবে"—এও যে যুগদেবতার

বাণী—। যাহোক যোগেনমার অভয়েই যেন আশ্বস্তা মা, প্রবেশ করেন সেই দহনলোকে বলেন, "মনে মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে ঢুকে দেখলুম আগুনের কোন তাপ নাই।"

ক্রমান্বয়ে পঞ্চদিবস ধরে চলল এই উদয়াস্ত প্রচণ্ড তপঃলীলা··· মনে পড়ে কবি কালিদাসের ঃ কাব্যলোকে গৌরীর দহন সাধন—

"শুচৌ চতুর্ণাং জলতাং শুচিস্মিতা
হবির্ভূর্জাং মধ্যগতা সুমধ্যত।"

কোমল তনুর কমনীয়তাকেও অস্বীকার করে চলেছিল এই কঠোর তপশ্চর্য্যা···।

"তদানপেক্ষ্য স্বশারীরং মার্দ্দবং
তপো মহৎ সা চরিতং প্রচক্রমে···"

তপস্যার অন্তে জানিনা নির্ব্বাপিত হয়েছিল কি না মার অসহ জ্বালা···কিন্তু সোনার ভগিমাখানির কথা বলতে গিয়ে নিজেই বলেছিলেন, "পাঁচ পাঁচদিন এই রকমে কাজ করায় শরীর যেন পোরাকাঠ হয়েছিল।"

"সোনার বরণ হইল শ্যাম ;
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম"—

স্বতঃই মনে ওঠে মরমী কবির—এই দুটি পদ।

অনুষ্ঠানের পর দিব্যনেত্রে দেখেলেন মা,—যেন সেই কিশোরী ভৈরবী মিলিয়ে গেল তাঁর দেব তনুতে।···দহন যোগ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনের জন্যই বুঝি মা'র অঙ্গসম্ভূতা যোগিনী মূর্ত্তির হয়েছিল প্রকাশ। কার্য্যান্তে আবার হল লয়···এর প্রয়োজন কেন বলতে, ভক্তসকাশে শুনি মা'র নিজেরই কথা···"পঞ্চতপাটপা এসব করে শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া? পার্ব্বতীও শিবের জন্য করেছিলেন।—

এসব করা লোকের জন্য। না হলে লোকে বলবে, কই সাধারণের মত খায় দায়, আছে। আর পঞ্চতপাটপা মেয়েলি···যেমন ব্রত সব করেনা”···।

বিশ্বের তপোবন এই ভারতের এক প্রান্তে সহজ মেয়েলি ব্রতরূপে যে অগ্নিব্রত সাধন করে গেলেন স্বয়ং অশিবনাশিনী সে ছোঁওয়া কবে লাগবে ভারতের মেয়ের বুকে বুকে, কবে হবে তার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ, ···তাদের তপস্যায় প্রবৃত্তি—তপঃশক্তি রূপে? কবে জাগবেন ধ্যান নিথরিত শিব সুন্দর—?

১৩০৫ সালের কথা। তার পূর্ব্বে কত হাসিকান্নায় ভরা দিনগুলি গেছে কেটে; ভক্ত সঙ্গে মা'র তীর্থ ভ্রমণও আরও কিছু হয়েছে জননী শ্যামাসুন্দরীর সাথে। হয়েছে শ্রীব্রজভূমি সন্দর্শন এবং তিনমাস বাস—তারপর আবার কলকাতায়···বৃন্দাবন হতে মা এনেছিলেন একটি ছোট্ট সুন্দর গোপাল মূর্ত্তি কিন্তু গোপালজীকে বসানো হয়নি পূজার বেদীতে ···জননীর সোহাগ হ'তে বুঝি বঞ্চিত হয়ে গোপালজীর জাগে অভিমান ···তাই সেদিন চপল নীলমনি টলমল চরণে অভিমান ভরা কালো ডাগর চোখ দুটি মেলে এসে দাঁড়ান মা'র দিব্য আঁখির সম্মুখে···আব্দার ধরেন, “তুমি আমাকে এনে ফেলে রেখেছ—তুমি আমাকে খেতে দাওনি, পূজো করনি—তুমি পূজো না কল্লে আমাকে কেউ পূজো করবে না।” বুঝি ব্যথায় দুলে ওঠে মা'র বুক···পরদিনই আর

অপেক্ষা না ক'রে ছোট্ট ঠাকুরটিকে বের করেন পেঁটরার ভেতর থেকে জননীর সস্নেহ চুম্বনে ভরে ওঠে নন্দলালের শ্যামল শোভন মুখখানি একদিন যেমন ভরে উঠেছিল কোমল দুটি অধর দশভুজার স্নেহের পীযুষে সেই ব্রজবিপিনের মধুর খেলায়। তারপর দেখা যায় গোপালজী তাঁর আসন খানি পেতেছেন মা'র নিত্যদিনের আরাধিত দেবতার পাশে।

১০২ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে সেদিন মা'র চরণ প্রান্তে প্রণত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামীপাদের কণ্ঠে তখন দুলছে বিশ্বদেউলের জয় মাল্য...শ্রীঠাকুরের নাম, ভাব, আদর্শের জয় ধ্বজা বহন ক'রে সুদূর পাশ্চাত্যের গগনকেও গৌরবমণ্ডিত ক'রে মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন মায়ের বীর সন্তান...এসে জানাছেন সে কত অভিমান। কত ব্যথায়—কাঁটার পথে, কত দুখে সাগরপার হ'য়ে দেশ দেশান্তে পৌঁছে দিতে হয়েছে জীবনের ধ্রুবতারার আলোখানি···জানান কোন ফকিরের অভিসম্পাতে দেহ নাকি হয়ে পড়েছিল অসুস্থ···আর সে স্থান তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল তারই অভিসম্পাতে। কারণ ফকিরের চেলা তার গুরুরচেয়ে অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছিল স্বামিজী মহারাজের দেবপ্রভাবে...বিশ্বজয়ী প্রতিভায়।

তাই অভিমানের সুরে বলেন সামান্য একটা ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না? ক্ষুব্ধ শিশুকে স্নেহময়ী জননী করেন শান্ত—"বাবা! শঙ্করাচার্য্যও তো শুনতে পাই এমনি ক'রে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। তোমার শরীরে আসতে দেওয়া আর তাঁর নিজের শরীরে আসতে দেওয়া একুই কথা। তিনি তো ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। সবই বিদ্যা, বিদ্যাকে তো মান্য করা চাই। তিনি তো হাঁচি টিকটিকি পর্য্যন্ত মেনে গেছেন।"—

অশান্ত শিশুর অভিমান আর যায় না বলেন, "তুমি যাই বলনা,

কেন, আমি মানি না।" স্মিতহাস্যে করুণাময়ী দেন উত্তর, "না মেনে থাকবার কি যো আছে? তোমার টিকি যে বাঁধা।" জমাট বাঁধা অভিমান যায় গ'লে বিশাল দুটি আঁখি হ'য়ে ওঠে অশ্রু উছল, শিশুর মত আঁকড়ে ধরেন মায়ের চরণ দুটি। আর অবুঝ শিশুর মাথায় হাত খানি রেখে মা দেন সান্ত্বনার প্রলেপ…।

আবার অভিমানী সন্তানের কণ্ঠেই শুনি আর এক সুর,—মা'র প্রতি সে কি গভীর শ্রদ্ধা। নির্ব্বানের বন্ধনহীন পথে ছুটে যাওয়া… ব্যাকুলতা নিয়ে আর একদিন এসে উপস্থিত বেদান্তকেশরী। উদাস সুরে বলেন, "মা আজকাল আমার সবই যেন উড়ে যাচ্ছে।"… বিশ্বেশ্বরী—হেসে বলেন, "দেখো দেখো আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।" সঙ্গে সঙ্গে ভাবদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আয়ত অরুণ আঁখি…শরণ নত শিরে বলেন, "মা তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরু পাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান।" ভরে ওঠে মা'র বুক।—আর করুণাক্ষরা নয়ন হ'তে ঝরে পরে আশীষ ধারা।

শ্যামাপূজার দিন মার শ্রীচরণ স্পর্শে হয় বেলুড়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সেদিন মাকে পেয়ে ছেলের দলে সে কি আনন্দ, পরমোৎসাহে সারা মঠ ভূমিখানি মাকে ঘুরে ঘুরে দেখান হল…মায়ের নরেনই হ'ল তাতে অগ্রণী বলেন, "মা তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।"

তারপর সেদিন আবার জননী আপন হাতে করেন পূজার যোগাড়, শ্রীঠাকুরের পূজা সবই করেন নিষ্পন্ন…সে এক আনন্দ সুন্দর মুহূর্ত… পূজার আসনে ব'সে আত্মারামের কৌটাখানি আপন বক্ষতলে রেখে দর বিগলিত অশ্রুজলে হয় অভিষেক, হৃদয় রতনকে হৃদয়ের পূজা নিবেদন।—বাহিরের জগৎ যায় হারিয়ে…মনে পড়ে শ্যাম পাগলিনী শ্রীরাধার উক্তি

"হরি যব আওবএ মঝু গেহে
মঙ্গল যতলু করব মঝু দেহে।"

এদিকে ছেলের দলে তখন আনন্দের কোলাকুলি…মঠের বৃক্ষ ঘিরে ঘিরে সে কি আনন্দ নৃত্য—খোল করতাল কণ্ঠনাদ…সুরধুনীর উথল পাথল আনন্দের ঢেউ লেগেছে তখন দিক দিশায়।—

তারপর অপরাহ্ণে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসব—সেখানেও হ'ল মার শুভাগমন। মুখর হয়ে ওঠে ছোট্ট স্কুল বাড়ীখানি…আইরীশ দুহিতা নিবেদিতা যেন সুরভিত হোমাগ্নির মতই স্নিগ্ধ প্রোজ্জ্বল… পবিত্রতায়, ত্যাগে মূর্ত্তিমতি বেদকন্যা…তাই হয়েছিলেন গুরু ইষ্টের একান্ত করুণার অধিকারিণী…আর তাঁরও শ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী, সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতের প্রতি সে কি মরমী প্রাণের অনুরাগ…কি শরণে নত শ্রদ্ধা—তাই তিনি যখন এলেন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিসর্জ্জন দিয়ে, তাঁর স্বদেশ আইরীশ জননীর কোল ছেড়ে দরিদ্র ভারতের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে…সেদিন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতের হিন্দুয়ানীর কথা স্মরণ করে স্বামিজী হয়ে পড়লেন বেশই চিন্তাকুল…কোথায় রাখবেন বিদেশিনীকে। কিন্তু সে চিন্তাভার যেন দখিন হাওয়ায় গেল মিলিয়ে—সিষ্টার এসে যখন নত হলেন জননীর চরণ তলে…তখন এই ভারতের মেয়ে মা আমার পবিত্র বাহুর বন্ধনে

কোলের কাছে টেনে নিলেন, এই বিদেশিনী-মেয়েটিকে—আর নিবেদিতা, তাঁরও তখন সোহাগ বিগলিত অবস্থা—নিজেকে মনে করে নিলেন, যেন মার কোলের ছোট্ট দুলালী। মনে হল যেন বিদেশিনী নয়, বিদেশ হতে বহুদিন পরে ফিরল ঘরের মেয়ে—আর ফিরল একেবারে মায়ের কোলে। সে কথা বলেছেনও বারে বারে "মা আমরা আর জন্মে হিঁদু ছিলাম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই আমরা ওদেশে জন্মেছি। তা দেখো এমন বাঙ্গালী হয়ে যাব যে একেবারে ঠিক ঠিক।"

শিশুর মতন হতেন আনন্দে পাগল, মায়ের ক্ষণিক দর্শনে ভুলে যেতেন নিজের জাতি গৌরব—মানসম্ভ্রম। সোহাগী মেয়ের মত বসতেন মার কাছে পাদু'টি ছড়িয়ে—দ্বিধা সঙ্কোচের বালাই নেই···সরল হেঁসে বলতেন, "মা ভারতের সব শিখলাম কিন্তু ভারতের মত পা'মুড়ে বসাটা আর কিছুতেই হ'ল না।" আবার সন্ধ্যাবেলা মাতৃদর্শনে এসে যত্ন করে লণ্ঠনের কাঁচে জড়িয়ে দিচ্ছেন কাগজ—যাতে মা'র চোখে আলো না লাগে···মায়ের দরদী মেয়ে কিনা···মনে পড়ে আর একটি সন্ধ্যা—এসেছেন নিবেদিতা সঙ্গে সহকর্মিনী কৃষ্টিন্। ছোট্ট মেয়ে যেন প্রথম শিখেছে বাংলা...মায়ের সদ্য শেখানো আধো আধো বুলি —"এ মাটৃদেবী আ-প-নি হ-ন আ-মা-ডি-গে-র কালী।" সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টিন করে সেই কথার পুনরুক্তি "Oh! Holy Mother is our Kali—yes"—মায়ের মুখে তৃপ্তিভরা হাসি—"না বাপু আমি কালী টালী হ'তে পারবোনি। জিভ বার করেই থাকতে হবে তাহ'লে।" মায়ের কথা তাদের বুঝিয়ে দিলে একমুখ হেসে বলেন দুজনে সে কত আদর ভরা কথা—তাঁদের ভাষাতে বলেন, "মাকে এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে না।—আমরাই দেখব মাকে কালীরূপে—কারণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে আমাদের মহাদেব।" হেসে বলেন মা "তা না হয়

দেখা যাবে।" তবু মেয়েদের জাগে ভয়, আব্দার ভরা স্বরে বলেন—"She admits" (উনি স্বীকৃতা)

স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। পরমানন্দে চরণ ধূলি মাথায় নেন তুলে। এইবলে—"হে জননী তবে আমরা তোমার পবিত্র চরণধূলি গ্রহণ করি।"

একটু আলো এসে পড়তে না পড়তে, যেন তার বুক জুড়ে ঘনিয়ে আসে একখণ্ড কালো মেঘ। দীর্ঘদ্বাদশবর্ষ ব্যাপী মা'র সেবাই ছিল যাঁর তপোময় জীবনের তপস্যা···একান্ত সাধনা···মা'র অন্তরের বস্তু প্রথম দীক্ষিত সন্তান, স্বামী যোগানন্দ—দীর্ঘদিনের রোগশয্যায়। পিছনে রেখে দিলেন চিরবিদায়—ধূলি মলিন ধরণীর কোল থেকে—১৩০৫ সালের ১৫ই মাঘ। তার স্মৃতি বলতে রইল শুধু তাঁর জীবনভোর জননীর প্রতি দরদভরা আকুতি, আর অকুণ্ঠ সেবা। আর রইল মা'র চোখের ব্যথার অশ্রু···মা'র দরদী সেবক দরদী সন্তান যেদিন বিদায় নিবেন, তারপূর্বে ভক্ত এসে দেখেন গণ্ডপ্লাবি অশ্রুধারায় জননী উপবিষ্টা···ভক্ত দিতে গিয়েছেন সান্ত্বনা, "সে কি মা! সেরে যাবে।" অশ্রু উদ্বেলিতা বলে উঠেছিলেন "আমি যে দেখলুম বাবা, ঠাকুর নিতে এসেছিলেন।" তারপর সান্ত্বনাহীন অশ্রুধারায় হয়ে উঠেছিলেন একান্ত আকুল···ভক্ত নতশিরে ফেলেছিলেন, শুধু অশ্রুবারি তাঁর মুখে যোগায়নি কোন সান্ত্বনারভাষা জননীর দর্শনই হল সত্য; ভক্তদের

শত আকুতি, ধরে রাখবার শত প্রচেষ্টা, মায়ের চোখের জল সব কিছু কে বিফল করে চলে গেলেন স্বামী যোগানন্দ। তখন গভীর বেদনার হাহাকারের মাঝে জননী বলেছিলেন "বাড়ীর একখানা ইঁট খসল—এবার সব যাবে।" সন্তান বিচ্ছেদের ব্যথা মা অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারেননি কোনদিন। মায়ের স্মৃতির তীর্থে যেন চির অমর হয়ে বেঁচে ছিলেন ছেলে যোগীন। মায়ের স্মৃতির ঝাঁপিতে চিরদিন তোলা ছিল তাঁর সারা জীবনের চিহ্নিত যা কিছু…।

শরৎ আর যোগীন এদু'টি আমার অন্তরঙ্গ "…তাই পরবর্ত্তী সেবকরূপে দেখি শ্রীশরৎ মহারাজকে, অপরূপ নীরব সেবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত…জননী সারদার সেবাই যেন ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দ—তাই সগৌরবে বহন করেছেন মা'র নামাঙ্কিত সন্ন্যাসের নাম সারদানন্দ… তাঁর পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য সেবাভার গ্রহণ করেছিলেন মায়ের আর একটি কৃতী সন্তান, স্বামী ত্রিগুণাতীত…তাঁরও পূর্ব্বাশ্রমের নামটি ছিল আবার মা'র শ্রীনাম চিহ্নিত "শ্রী সারদা চরণ"—বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠ প্রাণের অধিকারী ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। তাঁর সেবায়, তপস্যায় জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পাওয়া যেত তারি বিস্ময়পূর্ণ প্রকাশ।

গভীর রজনী, বর্দ্ধমানের পথ হয়ে জয়রামবাটীর পথে চলেছে একখানি গরুর গাড়ী—পল্লীর আঁকাবাঁকা অসমতল পথ, তারি বুকে কোন রকমে মন্থর গতিতে তাল রেখে সে চলেছিল আঁধারের আড়াল ঠেলতে ঠেলতে…এই আমাদের দীন জননী সারদার চিরদিনের রথ। পল্লী লক্ষ্মী মা আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শয়ন নিমগ্ন হয়ে চলেছেন পিত্রালয়ে—সঙ্গে সেবক সন্তান ত্রিগুণাতীত মহারাজ—তিনি চলেছেন পদব্রজে মা'র গাড়ীর পিছনে পিছনে—মা'র পাহারাদারের মত। শিবগেহিনীর পিত্রালয়াভিমুখে…মা'র সাথে সেবক নন্দী।…

রাতের আকাশ ফিকে হ'য়ে আসে, পূর্ব্বাচলে জ্বল জ্বল করে শুকতারা—কি যেন পড়ে চোখে, সর্ব্বনাশ। আর ত দেরী করা চলে না—ছুটে যান ত্রিগুণাতীত—সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বীর বলিষ্ঠ দেহখানি লুটিয়ে পড়েছে মার রথের সম্মুখের পথরেখায়—কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, পথের বুকে এক গভীর গর্ত্ত, অবিস্তীর্ণ পথের সীমা—তাই গাড়ীর চাকা পড়বেই সেই গর্ত্তের মুখে, ফলে এক গভীর ঝাঁকুনির আঘাতে জননীর নিদ্রার ব্যাঘাত ত হবেই, কোমল তনুখানিও যে আহত না হবে তা বলা যায় না···তাই দরদী বীর সেই ধরণীর অসমতা পূর্ণ করে মার পথের আঘাতটুকু নিতে চাইলেন আপন দেহে!···কিন্তু কি আশ্চর্য্য—এদিকে জেগে ওঠে নাড়ীর টান...রাত্রিশেষে হঠাৎ কেমন আচমকা যেন মার তন্দ্রাবেস যায় টুটে···কি ভেবে আকুল হয়ে উঠে বসেন··· সহসা পথের পানে চেয়ে শিহরিত হয়ে ওঠে সর্ব্বদেহ···কি সর্ব্বনাশ!... একি কাণ্ড!···চকিতকণ্ঠে চালককে আদেশ করেন, "গাড়ী থামাও।" তারপর ব্যাকুল পদক্ষেপে গাড়ী থেকে নেমে ছুটে আসেন সন্তানের পাশে, সযত্নে তাঁকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে ধরেন ছোট্ট শিশুর মত···তারপর মৃদু তিরস্কার...কিন্তু সেকি তিরস্কার, সে যে শত-সোহাগের গুঞ্জন...পরে কত সপ্রশংস মনে উল্লেখ করেছেন সেবকের অতুলনীয় সেবার কথা······

"দিদি একপেটে জন্মেছি—আমাদের কি হবে?" দিদি সারদার আদরে পালিত ভাই প্রসন্নকুমার করেন প্রশ্ন—জননী দেন উত্তর...

"তাতো তো বটেই, তোদের ভয় কি?" সেদিন খবর এল মার আদরের ছোট্ট ভাইটি কলেরা রোগে মুমূর্ষু...ছোট্ট শিশু থেকে বুক দিয়ে মানুষ করা সেই অভয় চরণ···মার বুক যেন নিঙরে ওঠে—ছুটে আসেন অভয়ের পাশে...সোহাগ ভরে কোলে তুলে নেন তার শিয়র—আর অভয় আজ অভয়ার পায়ে সব সমর্পন করে পরম নিশ্চিন্তের আশ্বাসে শান্ত নির্ভীক।...পরম নির্ভরতায় শুধু বলেন, "এদের তুমি দেখো" মার চরণে অর্পিত হয়ে যায় চিরদিনের জন্য তাঁর পিছনের যত দায়। মায়ের শ্যামশীতল ক্রোড়েই মুক্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি নেন চিরদিনের ছুটী। অভয়ের প্রয়াণে স্নেহাতুর মা'র বুকে যেন বাজে আর একটি গভীর ব্যথা—সে ব্যথা জড়িয়ে ধরে সুদৃঢ় বন্ধন হয়ে···মহামায়া আপন মায়ার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে সুরু করেন মাতৃলীলা···নরলীলা আর দেবলীলার দিব্যসমন্বয়।

অভয়ের ছোট্ট শিশুকন্যা; শোকে উন্মাদগ্রস্তা জননীর অযত্নে পালিতা সেই শিশুকন্যা—সহসা জননী দিব্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেন শ্রীঠাকুর চিন্ময় দেহে দণ্ডায়মান—ইঙ্গিতে যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন "ঐ তোমার ধরণীর বন্ধন—ওর মায়া পাশে আপনাকে জড়িয়ে পূর্ণ কর তোমার লীলা"—মনে পড়ে কিছুদিন পূর্ব্বের রুক্ষ কেশে, জীর্ণ মলিন বেশে সেই কুমারী মূর্ত্তি যেন ফিরছে সঙ্গে সঙ্গে। মহামায়াকে বাঁধতে যোগমায়ার প্রকাশ—তার পরেই ত' হ'ল অভয়ের এই একটুকরো মেয়ে। তার জন্মের আগে এবং পরে শোক দুঃখে জরাজীর্ণ অভয়ের সহধর্ম্মিনী সুরবালার মস্তিষ্কের ঘটল বিকৃতি, আর তাই তার পক্ষে শিশুপালন হ'ল অসম্ভব। অদ্ভুত যোগাযোগ। কলকাতায় সুরবালাকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে তাকে পাঠিয়ে দিলেন স্বদেশে...সঙ্গে সেই শিশুকন্যা রাধু। ভক্তদের আকুতিতে মায়ের হয়না যাওয়া, কিন্তু

লীলার পরিকল্পনা যে হয়ে আছে আগে থেকেই তাই সেদিন সন্ধ্যায় মা মৌন জপে সমাহিতা···সহসা চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ান, "ও যোগীন আমার জয়রামবাটী না গেলে চলবেনি—পাগলীর হাতে মেয়েকে দিয়ে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারবোনি।" ভাব সমাহিত নেত্রের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে জয়রামবাটীর চিত্রখানি...অবোধ শিশুর প্রতি বিকৃত মস্তিষ্ক জননীর অবাধ অত্যাচার, অযত্ন প্রতিপালন। ...নয়ন মন প্লাবিত করে নামে মমতার নির্ঝরিণী...আর কলকাতায় থাকা হয় না—শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত···লীলার পূর্ণতা সাধন। ভক্তের আকুতিকে পিছনে ফেলে মা চলে এলেন জয়রামবাটীতে...। অধরা মেয়ে এতদিনে যেন সাধ করে পড়ল ধরার বাঁধন। সেকি যত্ন...সে কি স্নেহ...রাধু মানুষ হতে লাগল, প্রতিপালিত হতে লাগল জননীর স্নেহচ্ছায়ে...সকলে বিস্ময়ে আকুল...বিশ্বেশ্বরীর অনন্ত মুখে উৎসারিত স্নেহকরুণা যখন বিশেষ ভাবে ঝ'রে প'ড়ে একটি আধারে তখন তাতে ফুটে ওঠে আর একটি রূপ···সে স্নেহ ব্যাকুলতার গভীরতা হয় যেন অতল ছোঁওয়া, তার কোমল মাধুরী রাখবার ঠাঁই যেন হয়না ধরণীর পাত্রে···। তবু দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্রে ফুটে ওঠে তার এক নব নব প্রকাশ···তাই রাধুর প্রতি মা'র সেই গভীর মমতা—মায়ের আকুতি নিয়ে যত্ন, প্রতিপালনকে কোন কোন ভক্ত দেখে মায়ের মায়াময়ীরূপ। ···মুখেও প্রকাশ করতে সঙ্কোচ জাগেনা—"রাধুর উপর আপনার ভারি আসক্তি—অবুঝ ছেলের ধৃষ্টতা রূঢ় কথায়, হয় তো উত্তর দেন "কি করব বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের এই রকমই।" সহজ পল্লীর সরল মায়ের কথা—কিন্তু শেষে একদিন এই কথায় জেগে ওঠে—জননীর মহিমময়ী মূর্ত্তি, তেজোদ্দীপ্তকণ্ঠে বলেন সন্তানকে, "তুমি এসব কি বুঝবে? যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন শার্শিতে চমকায়,

কিন্তু খড়খড়িতে কিছু হয় না। যাদের ঈশ্বর চিন্তা করে মন শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তাঁরা যখন যে জিনিষটি ধরে তাতেই ষোল আনা মন দেয়—তুমি আমার মত একটি খুঁজে বার কর দেখি?" সন্তান নতমস্তকে শুধু জানায় নীরব নতি—আবার আর এক দৃষ্টিতে জননীর এলীলা ধরা পড়ে এবং বিরাট আসক্তির মাঝে গভীর অনাসক্তির আদর্শ···মহামায়া সাধকরে মায়ার বাঁধনে থেকেও যেন বাঁধন হারা, একান্ত উদাসীন।

এদিকে লীলার পাত্র ওঠে ভরে—মা'র কোলে ভিড়ে আসে বহুযুগের মাতৃহারা সন্তানদল। আর দিনে দিনে রাতুল চরণ দুটি ভরে ওঠে শত ভক্তের ফুল গন্ধ নিবেদনে আবার ব্যথার কাঁটাও থাকে সে ফুলে...নিত্য নব নব ভক্তের মেলা আর যাদের সাধ গেছেমিটে··· মার, লীলার মাঝে, যাদের প্রয়োজন হয়েছে সারা তারা নেয় বিদায়। পুরানো সেই ছোট্ট খেলা ঘরের স্নেহের কাঙাল খুড়ো নীলমাধব তিনিও একদিন নিলেন ছুটী। মহাকায়ার সেদিন এক মায়ামায়ীরূপ— আকুল হয়ে অবুঝ মেয়ের মত—চোখের পাহারা দিয়ে আগলে বসে আছেন-খুল্লতাতের শেষ শয্যাখানি...বুঝি সেই ছোট্টবেলার সাকুর মত। আজ মরণের কাছ থেকেও ছিনিয়ে নেবেন তাঁর আদরের খুল্লতাতকে— দুটী হাত আঁকড়ে ধরবেন তাঁয় পালিয়ে যাওয়া প্রানটিকে। ওদিকে মরণ এসে হানা দিয়েছে জীবনের দ্বারে—তার আগমনের স্পষ্ট আভাস ফুটে উঠতে লাগল নীলমাধবের চোখে মুখে, মা কিন্তু তখনও অবোধ বালিকার মত শুধু শুধাচ্ছেন নিকটস্থ সন্তানকে "এখন কেমন দেখছ?" ভক্ত দেন সান্ত্বনা—"ভাল হয়ে যাবেন বোধ হয় ভাবনা নেই।" আর জননীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার করেন চেষ্টা···কিন্তু নীলমাধবের ··· ··· ··· কোন মতেই তখন সরান যায় না···কি জানি

স'রে গেলেই যদি নয়নের নিধি পালায়। এদিকে ভক্তেরা জানায় আকুতি, একটু কিছু খেয়ে আসতে...ছোট্ট মেয়েটির মত ভুলিয়ে দেন আশ্বাস···দেন নীলমাধবের জীবনের আশা। বহুক্ষণ পরে একটু কিছু মুখে দিতে জননী এলেন বাইরে...ওদিকে স্নেহের শিকল আলগা পেয়ে দেহ পিঞ্জর ছেড়ে পাখীও দেয় ফাঁকি। একটি বাঁধনই ত' বেঁধে রেখেছিল তার সারাটি দেহমন। সেই ছোট্ট শ্যামার নন্দিনী—যাকে একদিন কোলে পিঠে করে গড়ে তুলেছেন সে যে কত আদরে কত ব্যথায় তা কি বলা যায়? আর আজ বৃদ্ধ বয়সে পেলেন শিশুর সোহাগ···তাঁরি স্নেহাঞ্চলে, সেই পাথেয়টুকু সম্বল করেই নীলমাধব পাড়ি দিলেন অচিন দেশের পানে।

ওদিকে হৃদয় তন্ত্রীতে বাজে টান...কোন রকমে ভক্তের কথা রেখে ছুটে আসেন জননী···তখন ক্ষীণ প্রদীপ গেছে নিভে...সেইটুকু আলোর অভাবেই যেন সারা ঘর আঁধারে থমথম করে উঠেছে···"তবে কি খুড়ো নেই?" নীরব মৌন ভক্তের দল···"কি আমাকে ছাই পাঁশ খেতে পাঠালে, খাওয়াটাই কি বড় হল? খুড়োকে একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুমনি···। বিস্ফারিত হয়ে ওঠে আঁখি, রক্তিম শ্রীমুখ, উত্তেজনায় অধরোষ্ঠ বিকম্পিত...সে এক রুদ্রসুন্দর রূপ···এদিকে নয়ন হ'তে আবরণ স'রে পড়ছে অশ্রুধারা—ভীত স্তম্ভিত ভক্ত আছেন নির্ব্বাক হয়ে বসে...ধীরে ধীরে ভক্তের নীরব প্রার্থনায় বুঝি জননী ফিরে আসেন সহজাবস্থায়···তখন আর এক রূপ—অশ্রুমুখী বালিকার মত শান্ত হয়ে করছেন পিতৃব্যের শেষকৃত্য যথোচিত নিয়মে। ভক্ত করেন ক্ষমা প্রার্থনা দোষ যদি হয়ে থাকে মা সে কেবল আমারই—ক্ষমা সুন্দর মুখে তখন রুদ্ররূপের কোন আভাসই নেই, শুধু অবুঝ আকুল কান্না ছাড়া...স্নেহের দুলালীই ত' আজ মমতাময়ী জননী।

এবার বিদায়ের পালা এল জননী শ্যামাসুন্দরীর। এখন শ্যামা মা আদরিণী দুলালীর গরবে আনন্দে আত্মহারা। অস্বচ্ছল সংসারে স্বচ্ছলতা ফুটিয়ে তোলার আকুলতা এখন বেড়ে গেছে দশগুণ··· টুকিটাকি প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই করেন সঞ্চয়···লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত সদাই ভ'রে রাখতে চান তাঁর একরত্তি ভাঁড়ার খানি···কেনই বা না হবে ? আজ তো শুধু নিজের সেই অবোধ অবুঝ শিশুগুলি নয়··· আজ যে তাঁর 'সারুর' বিশ্বজোড়া ছেলের দল তাঁর ভাঙা কুঁড়ে ভ'রে ভিড় করেছে···তা'রা যে আরও অবুঝ, তাদের আব্দার আরো বেশী— তাই গর্ব্বভরা কণ্ঠে বলেন, "আমার ভক্ত ভগবানের সংসার—আমার সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) হয়ত কখন আসবে, যোগীন আসবে— এসব দরকার। বিশ্বের মানুষ দেবতা সবাই এখন ঘরের জন তাই বলছেন পুত্রবধূদের, "আমি যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন, সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোরা কি যত্ন করতে পারবি ? আমার ভক্ত ভগবানের সংসার।" কত দরদ, মা'র চরণে প্রণাম জানিয়ে মা'র ছেলে "শরৎ" এসেছেন বিদায় নিতে পাড়ি দেবেন সাগর পারে...ঠাকুরের নামের জয়ধ্বনি তুলতে হবে, তাই নরেন' ভাইএর ডাক এসেছে...তাঁর আদেশ মাথায় করে তাই অনুগত গুরুভাইয়ের দল এক এক করে ছুটে যাচ্ছে তাঁর পাশে। সন্তান শুভপথে চলেছেন, জননীর বুক ভরা মঙ্গল আশীষ ঝরে পড়ে... "কোন ভয় নাই—ঠাকুর তোমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করছেন—এই টুকুই ত সম্বল"। শরৎ মহারাজ মহানন্দে করেন যাত্রা···মা পাঠালেন ছেলেকে, কিন্তু কোমলা ঠাকুমা শ্যামাসুন্দরী তা'র অন্তর সভয় স্নেহে ওঠে ভরে...অনুযোগের সুরে বলেন, "হ্যাঁ মা সারু তুই মা হয়ে কোন প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্র তের নদী দূরে পাঠালি ?—তোর প্রাণ কি কঠিন—"

সেদিন এল তাঁর ওপারের ডাক, সেদিন সকাল থেকেই শ্যামাসুন্দরীর কেমন যেন একটা আনন্দ চঞ্চল ভাব। আজ যেন সেই পূর্ব্বের ধীর গম্ভীর শ্যামাসুন্দরী রূপায়িত হয়েছেন শিশু স্বভাব ঠাকুরমা রূপে... বাড়ীর জন্য কিনতে এসেছেন কিছু শাক সব্জী···কিনে পাড়ার যত চপল ছেলেদের নিয়ে সেকি আনন্দ কলরব। শিশু আর বৃদ্ধায় পার্থক্য যায় হারিয়ে। নৃত্যগীতে জয়রামবাটীর ভাঙাবাট হয়ে ওঠে আনন্দচঞ্চল। পড়শীদের লাগে বিস্ময় বোঝে না। সহসা শ্যামাসুন্দরীর এ ভাবান্তর কেন? বহুক্ষণ নৃত্যগীত রঙ্গ দোলায় কাটিয়ে—বাড়ী আসছেন··· ছেলেদের কিন্তু সাধ মেটেনি···আবার তাঁর উৎসাহ জাগাতে পিছনে পিছনে ছোটে আর ডাকে, "ঠাকুমা ও ঠাকুমা" একটুখানি মৃদু হেসে রঙ্গ করে বলেন শ্যামাসুন্দরী,—"কি বলবি বলনা, আর আমার দাঁড়াবার সময় নাই—আমার বেহারা হবি?" স্পষ্টই বোঝা যায় বুঝেছিলেন সত্যই আর দাঁড়াবার সময় নাই—মহাসিন্ধুর ওপার থেকে এসেছে ডাক··· এখন জগতে প্রয়োজন শুধু বেহারারই। যাই হোক, বাড়ী এসে অসমাপ্ত কাজে সাহায্য ক'রে সে কাজ শেষ করেন। এই সঙ্গেই অবসান হয় তাঁর শান্ত অনাড়ম্বর দিব্যজীবনের...তারপরেই হয়ে পড়েন অসুস্থ··· আর পূর্ণজ্ঞানে দেবকন্যার সঙ্গে শেষপ্রসঙ্গ করে তাঁরি হাতের ব্রহ্মবারি গঙ্গাজল পান করে বিদায় নিলেন মর জগৎ থেকে—জেগে রইল শুধু দেবনন্দিনীর বুক নিঙরানো ক্রন্দন। মাতৃঋণের পরিশোধ করতে অশ্রুর তর্পন। মা'র জীবনে যেন "একে একে নিভিছে দেউটি"।

যুগে যুগে অধরাকে যাঁরা টেনে আনেন ধরণীর বুকে দীপান্বিতা আনতে···তাঁরাও যে যুগের বহু সাধনার ধন···চিরবাঞ্ছিত চির-দুর্ল্লভ···তাঁদের বিদায়ে আঁধারের বধির যবনিকা...তাঁরাই তো আলোর উৎস।—

এরপর একটি বৎসর গেছে পার হয়ে...১৩-৪ সালের বাদল শেষে একরাশ অশ্রুহাসির মুক্ত ছড়িয়ে এসে দাঁড়ালো শরৎ...ধরার অঙিনায় বোধন তলায় কারো বাজে ব্যথার বাঁশী, কারো বা হাসির, আলোয় আলো। তবু সবাই বরণ করে নেয় বছরের পরে জননীর চরণে আলতা রাঙা এই সোণার শরৎকে। ভক্তবর গিরিশচন্দ্র নিষ্ঠায়, বিশ্বাসে একান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জন, চিরবিক্রীত শরণাগত দাস, আর কিছু জানেন না···শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। জানিনা লীলাময়ীর কি ইচ্ছা সেদিন সুষুপ্তির দুয়ার ঠেলে নিদ্রাগত গিরীশচন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা বিশ্বজননী· দশপ্রহরণ ধারিণী বিগলিত কাঞ্চনবর্ণা জ্যোতির্ম্ময়ী···দেবীর প্রত্যাদেশ হ'ল গিরীশচন্দ্রের প্রতি—এবৎসর যেন তাঁর পূজার আয়োজন করা হয়—তিনি আসবেন...ভক্তের চণ্ডীমণ্ডপে মনের মনিমণ্ডপে, কৃপা করতে, ধন্য করতে। এদিকে গিরীশচন্দ্র ভৈরবের অবতার—শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী···বিশ্বেশ্বরীর এক কথায় তিনি ত' রাজী হবার পাত্র নন দুর্গাপূজার ইচ্ছা তাঁর মনের কোণে যে একটুও নেই···হয়তো নিষ্ঠার প্রাবল্যেই···কিন্তু সে কথা কি শোনে রঙ্গময়ী, সে অনিচ্ছায় কর্ণপাতও না ক'রে আপনি দশদিক আলোয় আলো ক'রে বসেন গিরীশচন্দ্রের চণ্ডীমণ্ডপে। দুরন্ত শিশু মাকে দুহাতে দেয় ঠেলে···মা কিন্তু তাকেই আঁকড়ে ধরে টেনে নেন বুকে তা না হলো মা কেন ? ভক্ত ভগবানের দ্বন্দ্বে ভগবানের হ'ল জয়। সেবার সত্য সত্যই গিরীশচন্দ্রের মন্দির ভ'রে ওঠে প্রতিমার দিব্য বিভায়...বিশ্বাসী প্রাণের

পূজায় হেসে উঠেছেন প্রাণময়ী ঈশানী···কিন্তু নিষ্ঠার এতটুকু ত্রুটী হয় না...সাক্ষাৎ জীবন্ত প্রতিমার পূজাও চলে সমভাবে···নিকটেই বলরাম মন্দিরটীও আলোয় ভ'রে এসেছেন মা সারদা। আর এসেছেন গিরীশচন্দ্রেরই সাগ্রহ আহ্বানে।

কিন্তু আনন্দের মাঝে দুঃখের ছায়া একটু যেন থাকবেই—দেশ থেকে মা এসেছেন শরীরের অসুস্থতা নিয়ে···সে অসুস্থতা কাটেনি তখনও, তবু করুণাময়ী সাড়া দিয়ে এসেছেন ভক্তের আবাহনে। সপ্তমীর পূজা, অষ্টমীর পূজায় শ্রীচরণ ভরে গ্রহণ করেছেন শত ভক্তের ভক্তির অঞ্জলি...কিন্তু অষ্টমীর পূজা গ্রহণ করার পর আবার মা'র শ্রীঅঙ্গে দেখা যায় জ্বরভাব, সন্ধ্যায় সন্ধিপূজায় আসার আশাটুকু যায় চুকে···ভক্তেরাও করে অনিচ্ছা প্রকাশ—ছোট্ট বালিকার মত মাও মেনে নেন তাদের ইচ্ছা···এদিকে সন্ধিক্ষণ সমাগত...ভীত সন্ত্রস্ত ভক্তদল, শ্রদ্ধায় আকুতিতে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দণ্ডায়মান · মন্দির পরিপূর্ণ··· বেদমন্থিত উজ্জ্বল গাম্ভীর্য্যে দেবীমূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত। সকলেই উপস্থিত এক গৃহকর্ত্তা ছাড়া···বিশেষ প্রকাশের সন্ধিক্ষণেই যদি এলেন না চিন্ময়ী দেবী তবে কিসের সন্ধিক্ষণ···। একপাশে জ্বলে ওঠে ১০৮ ঘিয়ের প্রদীপ···। সহসা খিড়কীর দুয়ারে চকিত করাঘাত, "আমি এসেছি।" সকলে ওঠে চমকে...যাগদীপের আলোয় বুঝি জাগে লক্ষদীপের ঝলক, দেখা যায় ধীর পদবিক্ষেপে মৃন্ময়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন চিন্ময়ী সচল প্রতিমা···সন্ধিক্ষণের সে স্তব্ধ মৌনতা যেন আনন্দের জয়নাদে পড়ে ভেঙে, "ওরে মা এসেছেন" সারা পড়ে যায়। শুধু কানে বাজে না, এ সাড়া গিরীশচন্দ্রের প্রাণেও বাজে ···গহিণ অভিমানের দ্বার ঠেলে বাজে, "ওরে মা এসেছেন।" অভিমানী শিশুর অভিমান হয় আনন্দে রূপায়িত...ছুটে আসেন নেমে। তখন

পূজা হয়ে গেছে সুরু—রাশি রাশি পুষ্প বিল্বদলের মাঝে মা সারদা দণ্ডায়মান, মৃন্ময়ীর নয়নে চিন্ময়ীর নয়ন…করুণা নিবিড় সে দৃষ্টি…স্ফুরিত সে অধরে—অলকার সুষমা…কে বলবে জ্বরকাতর দেবতনু…সমাধি সায়রে যেন স্বর্ণশতদল…গিরীশচন্দ্র অঞ্জলি ভ'রে দেন পুষ্প আর দেন অশ্রুর চন্দন—অভিমানে না অনন্দে কে জানে…পরে বলেন—ভাব বিকম্পিত গদগদ কণ্ঠে, "আমি ভাবলুম বুঝি আমার পূজাই হল না—এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলছেন, "আমি এসেছি"—ভগবান ঈশামসির বাণী 'দুয়ারে ধাক্কা দাও দুয়ার যাবে খুলে'…এ দুয়ার হৃদয় দুয়ার, আবার বাইরের দুয়ারও বটে।…সত্যই অভিমানী শিশুর সে ব্যথা বুঝেছিলেন অন্তর্য্যামিনী, তাই সন্ধিপূজার একটু আগে হয়ে উঠেছিলেন চঞ্চল। ছেলে যে কাতর হয়ে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে একান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়েও সঙ্গিনীর সাথে পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ান ভক্তভবনে… শাস্ত্রবাণী হ'ল সত্য…সন্ধিক্ষণ যে দেবীর বিশেষ প্রকাশের ক্ষণ…তাইত' স্থূলেও এসে দাঁড়ালেন চিন্ময়ী মা।

এরপর আরো দুটি বছর যায় কেটে। ১৩১৫ সালে মা'র উপস্থিতিতে, দিব্য লীলাপীঠ কামারপুকুরে হল শ্রীঠাকুরের জন্মবার্ষিকী… সুষ্ঠু, সুচারু, আনন্দপূর্ণ ভাবেই সারা হল শুভ জন্মবাসরের উৎসব। তারো এক বছর পরের কথা ১৩১৬ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় বাগবাজারে জননীর শ্রীমন্দির উদ্বোধনের হল শুভ উদ্বোধনী। এই মন্দিরের অনুতে অনুতে জড়িয়ে রইল মাতৃগত প্রাণ স্বামী সারদানন্দের তিল তিল করে আত্মদানের সাধনা…অপার মাতৃভক্তির মূর্ত্তরূপ এই উদ্বোধন মন্দির। এগার হাজার টাকা হল ব্যয়; রিক্ত সন্ন্যাসী আপনি বহন করলেন সে ব্যয়ভার। ঠাকুরের অদর্শনের পর সুদীর্ঘ ২৩টী বছর ধরে কলকাতায় জননীর হয়নি একটি স্থায়ী মন্দির। কত

অস্বচ্ছলতায়·· কত অসুবিধায় গেছে দিন···একদিকে মা'র অসীম তিতিক্ষা আর অন্যদিকে সন্তানের বুকের গভীর ব্যথা...পুরো ২৩টি বছরের মৌন সাধনায় গড়ে উঠেছিল মা'র এই উদ্বোধন···মা সারদার ক্ষুদ্র দেবায়তন। —আজ যাঁদের নামে বিলাসের লীলাভূমি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যের দিক দেশান্তে গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে গগনচুম্বী দেবায়তন—দিব্য সম্ভারে সমৃদ্ধ...গভীর তপস্যায় মাটীর মন্দিরে, তাঁরাই কাটিয়েছিলেন দীর্ঘদিন···আর সে তপস্যার অমৃত ফল লাভ করল···ধন্য হল তাঁদের ভবিষ্যতের সন্তান গোষ্ঠী।

জননীকে দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করে সারদানন্দের আনন্দ যেন ধরে না।...আপন উপাধি আপনিই গ্রহণ করেন, "আমি মা'র বাড়ীর দ্বারোয়ান।" তাইতো বলেন মা "শরৎ আমার দ্বারী।"

মা'র সাথে নিতে হয় তাঁর বিপুল ভক্তগোষ্ঠীর ভার,—নিতে হয় মা'র ঝঞ্ঝাটের অংশ···মায়ের সেবায় মায়ের অংশস্বরূপ, স্বামীপাদ যেন লাভ করেছিলেন মাতৃসত্ত্বা। তদাকারকারিত। মায়ের, চিন্তায় মায়ের সেবার মাতৃময়···ধৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, সহিষ্ণুতায়, কোমলতায়, স্নেহে, সর্ব্ব-প্রকারে...। তাই মা ও ছেলে উভয়েই উভয়কে মর্য্যাদা দিতে সম-সচেষ্ট···। দীক্ষা নিতে এসেছে ভক্ত—মা'র শরীর অসুস্থ—ভক্ত কিন্তু ছাড়বেনা—মা নিরুপায় বলেন, "আচ্ছা শরতের কাছে যাও,—সে যা ব্যবস্থা করবে, তাই হবে।" বলেন ভক্ত, "আমরা আর কাকেও জানিনা" মা বলেন, "বল কি? শরৎ আমার মাথার মণি! সে যা করবে তাই হবে।"

নির্ব্বাক স্থৈর্য্যে সব শোনেন শরৎ মহারাজ, কি বলবেন, মূক হয়ে গেছে ভাষা...করুণাময়ীর এই অপার করুণায়—শুধু বলেন, "মা এই কথা বলেছেন?" তারপর দেন দীক্ষা দিবসের একটি নির্দ্দেশ।

আবার আর একদিকে অপূর্ব্ব দৈন্যের চিত্র···বসে আছেন উদ্বোধনের কার্য্যালয়ের প্রধানের গৌরব আসনে···সম্মুখে লীলাপ্রসঙ্গের পাণ্ডুলিপি। ভক্ত এসে জানায় সাষ্টাঙ্গ নতি···স্বভাব শান্ত ধীর সন্ন্যাসী ···স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপে শুধু জিজ্ঞাসা করেন, "আমাকে যে এতবড় প্রণামটা করছ, এর মানে কি বল তো?" ভক্ত বিস্মিত বলে—"সে কি মহারাজ আপনাকে করবনা তো কাকে করব?" মাতৃসেবক দীন কণ্ঠে বলেন, "তুমি যাঁর কাছে যাও ও যাঁর কৃপা পেয়েছ আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে, তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।" শুধু একটি দিনের মুখের কথা নয়—সারা জীবনে প্রতি পদক্ষেপে চলেছিলো এরই মহাসাধনা।

এরই দুই বছর পর—১৩১৮ সালের কথা—জয়রামবাটীর দুই ক্রোশ দূরে ছোট্ট একটুকরো গ্রাম—নাম কোয়ালপাড়া—তারই বুকে একদিন জেগে উঠল সুন্দর একটি দেবারাম—১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণে জননীর শুভাগমনে সমাপন হল তার সঞ্চার উৎসব···আপন হাতে স্বীয় চিন্ময় চিত্র—শ্রীঠাকুরের দেব প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করে, মা করলেন পূজা···এরপূর্ব্বে ১৩১৩ সালেই হয়েছিল এর সূচনা। পাশ্চাত্য হতে প্রত্যাগত স্বামী নির্ম্মলানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ চলেছেন জয়রামবাটী মাতৃদর্শনে।···মাঝে পড়ল এই ছোট্ট গ্রামখানি। পথে দেখা হয় স্থানীয় স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে নাম কেদার দত্ত। পথের পরিচয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন সন্ন্যাসীবৃন্দের সাথে। কল্মীলতার দল এসে জুটলেন জননীর সন্তানগোষ্ঠীর দলে...মার অজস্র কৃপা—মার চরণাশ্রয় লাভে হলেন ধন্য। সেদিন বিদায় কালে মা দিলেন উপহার শ্রীঠাকুরের আর স্বামিজীর দুটি প্রতিকৃতি···সর্ব্বজয়ার নিজের হাতে পেলেন জয় পত্রিকা ...লোক-কল্যাণ ব্রতে কেদার দত্ত পেলেন দীক্ষা...

তাঁর সঙ্গে যোগ দিল স্থানীয় উৎসাহী তরুণদল···তাদের সকলের সমপ্রচেষ্টায় ভক্ত কেদার দত্ত গড়ে তুললেন একটি ক্ষুদ্র তাঁতশালা··· এই সূত্রে ধীরে ধীরে এল মঠের পরিকল্পনা। যার অপূর্ব্ব পরিণতি বর্ত্তমান কোয়ালপাড়া মঠ। কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে—কেদার দত্ত এবং আরও অনেকে নিলেন বেদনির্ণীত পথ—সন্ন্যাস মার্গ···এই সর্ব্বত্যাগের পথ অবলম্বনে সকলেই হয়ে রইলেন ঠাকুরের চিহ্নিত সেবক···এই কেদার দত্তই পরবর্ত্তীকালের স্বামী কেশবানন্দ মহারাজ···

মনে পড়ে ঠাকুরের অভিনব দর্শনের কথা আর বাণী :—"একটি ছেলে চাচ্ছ, এই সব রত্নছেলে তোমায় দিয়ে গেলুম।" তার সঙ্গে আরো বল্লেন, "কালে কত লোকে তোমাকে মা মা বলে ডাকবে।" ডাকলোও তাই। বিশ্বের ছেলে এসে ডাক দিলো মায়ের আঙিনায় ···মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে—শান্ত, অশান্ত, অবুঝ ছেলের দল বুক ভরা ক্ষুধা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আজ মায়ের দ্বারে।···

এতো দুদিনের মা নয় এযে চিরদিনের মা তাই গিরীশচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি রকম মা ?" সঙ্গে সঙ্গে মা'র কণ্ঠে জেগে ওঠে চিরদিনের উত্তর, "আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী নয়, পাতান মা নয়, কথার কথা মা নয়,—আমি সত্যি জননী।" "মা না হ'লে এমন কথা বলো কে বলে।"

তাই যেদিন ভক্তবর—গিরিশ. গোপনে স্বচক্ষে দেখলেন তাঁর ব্যবহৃত শয্যাদ্রব্য মা নিজে নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলি পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে; সেদিন দরদী ছেলের ব্যথাও যেমন জেগে উঠেছিল দুচোখ ভ'রে— আবার অন্তরে ভ'রে উঠেছিল অপার আনন্দের প্লাবন। স্নেহের পরিচয় সে যে বড় মধুর· ·গহন হতেও গহিন—"আমি সত্যি মা"...

ভক্তছেলে বহুদূর হতে ছুটে এসেছে বুকে ব্যাকুলতা...পথক্লান্ত দেহ

ঘর্ম্মাক্ত...ছুটে এলেন মা, হাতে পাখা—স্নেহানিলে জুড়িয়ে দিলেন দেহ—তার সঙ্গে জুড়াল মন...সন্তানের শত নিষেধ তাঁকে রোধ করতে পারে না।—খেতে দিলেন প্রসাদী দুধভাত...সহসা আজন্ম মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হৃদয়ে স্নেহের বুভুক্ষা ওঠে জেগে আব্দার ভরা কণ্ঠে ছোট্ট শিশুর মত বলে, "নাঃ খাইয়ে না দিলে খাব না।" আবার মায়ের মতই হবে খাওয়াতে—এ প্রার্থনাও ভক্ত করে আকুতি দিয়ে···সে আকুতি হয় পূর্ণ। অবগুণ্ঠনের আড়াল ঠেলে মা খাওয়াতে বসেন ঠিক মায়েরই মত পিঁড়িখানি পেতে।

আবার সদ্য দীক্ষিত সন্তান খেতে বসেছে মায়ের সাথে। অপরূপ স্নেহ, শ্রীমুখে যেটি ভাল লাগে সেইটিই তুলে দেন ছেলের হাতে... আহার শেষে গুরুস্থানজ্ঞানে, সন্তান আপন উচ্ছিষ্ট তুলে নিতে হয় উদ্যত, তখন মায়ের মত হাত ধরে দেন বাধা স্নেহের তিরস্কারে, "ওকি ক'রছ ?" গুরুজ্ঞানে ভক্ত জানায়, "আপনি যে নিলে আমার অকল্যাণ হবে। মমতায় গলিত কণ্ঠে···বলেন জননী "মা'র কোল ছেলে কত অপরিষ্কার করে, আমি তোমাদের কি করতে পেরেছি বাছা ?"···আবার কোন ভক্তকে হয়তো বলেছেন, "তোমরা তো সব বড় হ'য়ে আমার কাছে এসেছ—আমি কি দোষ করেছি যে তোমাদের এই সামান্য যত্নটুকু করতে পারব না"...এ পাতানো মা নয়—গুরুপত্নী নয়—এযে চিরদিনের আপন মা···এখানে শুধু মা আর ছেলে, সব সম্বন্ধের হয়েছে এখানে অবসান...উঁচু-নীচু, জাতি-কুল এখানে সবই যে যায় হারিয়ে —তাই যখন জাতির বাঁধাকে দূরে সরিয়ে রেখে মা ভক্ত ছেলের সেবায় রত তখন অন্যান্য ভক্ত স্বজনের দিক থেকে আসে প্রবল আপত্তি, "তুমি বামুনের মেয়ে, গুরু—তুমি ওদের এঁটো নাও কেন ? এতে যে ওদের অমঙ্গল হবে, স্মিত অভয় হাস্যে অভয়ার মুখ ওঠে ভ'রে—

"আমি যে মা গো, মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?" "আমি যে মা গো" এতো শুধু কথার পরিচয় নয়, এ যেন অবুঝ শিশুর মুখে জননীর নিবিড় স্নেহের চুম্বন। অথচ সামাজিকতার নিয়মটুকুও নিয়েছেন মেনে। কিন্তু ভক্ত ভগবান, জননী আর সন্তানের রাজ্যে সবাই যে ভিন্ন আইন, "ভক্তের ত' জাতি নাই"...

কোন নিম্নজাতি ভক্তের হয়তো জেগে উঠেছে সঙ্কোচ, কেমন করে তিনি অপর উচ্চবর্ণের ভক্তদের সাথে করবেন একত্র প্রসাদ গ্রহণ...জননীর মুখে ফুটে ওঠে অভয়—দেন আশ্বাস, "তুমি কি যুগী বলে সঙ্কোচ বোধ কর—তাতে কি বাছা, তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ"—জানিনা সান্ত্বনায়, মায়ের গরবে ছেলের বুক কতখানি উঠেছিল ভ'রে।

শতশত দীক্ষিত সন্তানের শ্রীগুরু আসনে অধিষ্ঠিতা জননীর গুরু ভাবকে অতিক্রম করে যেন বিকশিত হয়েছিল শত মাধুরীর মাধুর্য্য মথিত এই মাতৃভাব, মাতৃরূপ...

দীক্ষা প্রদান সমাপ্ত করেই ত্রস্ত ব্যস্তে সন্তানের আহারের আয়োজনে হন রত ...মধ্যাহ্নে আপন হাতে মূর্ত্তিমতী কমলার মত যখন পরিবেশন করছেন প্রসাদ...অপার্থিব করুণার পরসাদে শ্রীমুখ অরুণায়িত...মৌন মুখে সকলেই প্রসাদ গ্রহণে রত কিন্তু আনন্দে বিস্ময়ে সকলেই লক্ষ্য করছে প্রত্যেকেরই প্রিয়বস্তুটি প্রত্যেকেই লাভ করছে অপ্রত্যাশিত ভাবে...। শুধু তাই নয় এমন অপূর্ব্ব অনুভূতি ভরা দিন গেছে, যেদিন প্রত্যেকটী সন্তান অন্তরে অন্তরে করেছে অনুভব যেন জননীর বিপুল স্নেহের অধিকারী সেই সবচাইতে বেশী—তাকেই মা অধিক স্নেহে দিচ্ছেন কৃপার পরসাদ। অনুভবে জাগে সঙ্কোচভরা লজ্জা যে অপর ভাইগুলি হয়তো লক্ষ্য করছে মা'র এই পক্ষপাতিত্ব

কিন্তু পরে পরস্পরের আলাপে হয় প্রকাশ ঐ একই অনুভূতিতে সকলেরই চিত্ত উঠেছিল ভ'রে আনন্দে ও সঙ্কোচে···এমনি মহামায়ার মায়া···।

ভক্ত নিয়ে এসেছেন দীন উপচার, কিন্তু সেটুকুও কেবল ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য একটু গ্রহণ করে বাকী সবটুকুই বিলিয়ে দিয়েছেন ভক্ত ছেলের সেবায়। অনুযোগ করলে বলেছেন, "তোমরা না খেলে কি আমি খেতে পারি?" কেউ সামান্য চিঁড়ে করে নিয়ে এসেছে সে না খেয়েই গেছে চলে—জননীর হয় দুঃখ চিঁড়ে তুলে রাখেন সন্তানের উদ্দেশে। পাছে স্বজনকুল হয় বিরক্ত, তার জন্য বলেছেন বার বার —"আমার ছেলেদের কোন জ্বালা নাই···"সময় অসময়ে ভক্ত আগমনে উত্যক্ত অন্তরঙ্গ মেয়ে করেন বিরক্তি প্রকাশ—তাকেও জননী করেন নিরুত্তর, "ওরাই আমার সব" বলেন, "এমন ছেলে যেন আমার জন্মে জন্মে হয়।"

কত সহজ করে দিয়েছেন সন্তানের চলার পথ। দীক্ষান্তে ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন নিজের অক্ষমতা জানিয়ে, "মা আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়ার অভ্যাস কি হবে?"

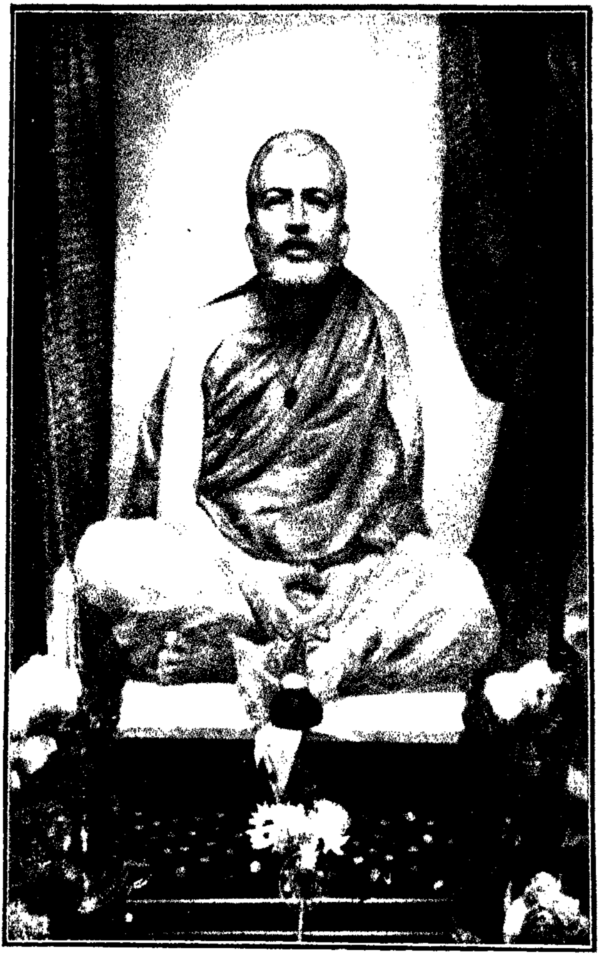
বোঝেন জননী সন্তানের কোথায় অক্ষমতা—স্নেহপূরিত কণ্ঠে বলেন, "বাবা, মা কি কখনও সৎমা হয়? তোমার যেমন খুসী, আগে খেয়ে নিয়ে তারপরে জপ ধ্যান করবে।" শুধু কি তাই, ছেলেদের চায়ের অভ্যাসটুকু পূরণ করতে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেড়িয়েছেন একটুখানি দুধের খোঁজে। দূরাগত সন্তান এসে দাঁড়িয়েছে, ধূলাপায়েই, সে করবে মা'র শ্রীচরণ পূজা—তাই কর্ম্মমন্দির থেকে ছুটে এসে দাঁড়াতে হয় দেবীর আসনে। তখন কে বলবে সেই কর্ম্মচঞ্চলা কমলা···ধীর সমাহিত দেবীমূর্ত্তি স্বর্ণপ্রতিমার মত দণ্ডায়মান পিঁড়ির

উপর, আর শ্রীচরণে ভক্তের অশ্রুসিক্ত ভক্তি অর্ঘ্য...তারপর আবার চঞ্চলা মা...ছুট্‌লেন সেই ছেলেরই আহার যোগাতে। পূজ্যের আসনে দাঁড়িয়ে নিচ্ছেন যাঁদের পূজা তাঁদেরই আহারের জন্য ঝুড়ি মাথায় যাচ্ছেন হাটে বাজারে......"যোগ ক্ষেম বহাম্যহম্" শাস্ত্রবাণীকে অতিক্রম করে যায় জননীর এই তিল তিল ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার লীলা...প্রতিদিন...প্রতি মুহূর্ত্তে...

বহুদূর থেকে আসছেন ভক্ত জগজ্জননী দর্শন মানসে...জননীকে কোন সংবাদ না দিয়ে। তিনদিনের পথ, পথের দিশা অজানা...শুধু ব্যাকুলতার দিশাটুকু সম্বল ক'রে ভক্ত যাত্রা করেছে অদিশপথে, কিন্তু অন্তরের দেবতা রয়েছেন অন্তরেই...তিনি যে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, দিশারী হ'য়ে, শুধু সবটুকু ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়ারই অপেক্ষা... এক্ষেত্রেও ঘটল তাই। ভক্ত যাত্রা করে নিতান্তই একা, অসহায় কিন্তু বিস্ময়ে দেখে একজন না একজন পথের সঙ্গে এসে সঙ্গ নেয় আর অচিন পথ দেয় চিনিয়ে, দেব প্রেরিতের মত অপূর্ব্ব স্নেহ যত্নে তাকে নিয়ে চলে সঙ্গে...রেঁধে খাওয়ায়, তৃপ্ত করে...। অবশেষে পথের শেষে শ্রান্ত বালক এসে দাঁড়ায় মা'র দ্বারে...দর্শনও মেলে আর মেলে অসীম করুণা। যেন কতদিনের চেনা—জাগে কত ব্যথা, সন্তানের এতদূর ছুটে আসায় বলেন, "এই কাঠ ফাটা রোদে এত পথ এলে অসুখ হতে পারে"...তারপর যত্নের কথা আর না বল্লেও চলে...

এই চির পরিচিতের ব্যবহার মার যেন ছিল সাধা···তাই ত' বলেছেন "আমি আপন মা"···তাই বিশ্বের ছেলে সবাই যে তাঁর চির চেনা... তাদের আগমনের পূর্ব্বেই পেরেছেন জানতে···আর তার পথের ব্যথা নিয়েছেন আপন অঙ্গে···ব্যবস্থা করছেন তার আপ্যায়নের। পূর্ব্বোক্ত সন্তানই বিদায় নিলেন মা'র শ্রীচরণবন্দনান্তে চললেন স্বদেশাভিমুখে...কিন্তু অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করতে না করতে হয় ভাবান্তর ···অদর্শন ব্যাকুলতা যেন ছেয়ে ফেলে অন্তরের অন্তস্তল...। আর দেশের পথে পা চলে না...চলার গতি ফিরে যায় মা'র লীলাতীর্থের পানে। ভক্ত আবার ছুটে চলে...খর গ্রীষ্মে ধরণী তখন দাবদগ্ধ... এদিকে অন্তর্য্যামিনী মা পারেন জানতে ছেলে আসছে ফিরে, তাঁরও যে শরীর জ্বলে যাচ্ছে অসহ দাবদাহে...ভক্ত অঙ্গে লেগেছে তাপ···শতগুণ হয়ে সে তাপ এসে স্পর্শ করেছে তাঁর কোমল অঙ্গ...এমন সময় অশ্রু কাতর চোখে দাঁড়ায় এসে ভক্ত···মার অন্তরঙ্গ ভক্তদল আসে ছুটে বলে, "তুমি মাকে বড় কষ্ট দিয়েছ, রোদে রোদে আসছ বলে মা আগে থেকেই বলছেন তাঁর শরীর তাপে জ্বলে যাচ্ছে!"

শীতল ব্যজনে কেউবা করে ভক্ত অঙ্গ শীতল তা না হলে মার জ্বালা ত' জুড়াবেনা। ভক্ত শুনলেন তাঁরই অপেক্ষায় সকলে এখনও পর্য্যন্ত প্রসাদ গ্রহণে বিরত আছেন। কিন্তু উপায় কি! অন্তরের জ্বালা অসহ্য হয়ে ওঠে। মাতৃদর্শনের পূর্ব্বে খেতে কোন মতেই মন ওঠে না। সে কথা প্রকাশও করে, কিন্তু সকলের সাগ্রহ অনুরোধে বসতে হয় প্রসাদ পেতে। এমন সময় আবির্ভূতা জননী...মা ত' জানে ছেলে কি চায়, তাই বলেন,—"ভয় কি, তোমার চিন্তা নাই খাও, তুমি শান্তি পাবে।" এতক্ষণ যে অশ্রুচাপা ছিল···সে যেন পথ পায় স্নেহের পরশে তার উচ্ছ্বাস আর থামে না। কোনরকমে তখনকার মত শান্ত



শ্রীশ্রীঠাকুর

করেছেন মা অবুঝ ছেলেকে। অপরাহ্নে আবার নিজের কাছে ডেকে সে কত কথা, কত আশ্বাস, সান্ত্বনা…

পরদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ভক্ত নেবে বিদায়…ভাবে দূর হ'তে প্রণাম করেই যাই চলে মা'র যে কষ্ট হ'বে। ভাবতেই দেখেন করুণাময়ী দ্বার ধ'রে আছেন দাঁড়িয়ে চরণ ধূলি দিতে…আবার যেদিন চাকরীর গোলমালে কারাবাসের সম্ভাবনা হ'য়ে ওঠে নিশ্চিত, সেদিনও ভক্ত আকুল ক্রন্দনে জানায় সবকথা মা'র শ্রীচরণপ্রান্তে। অভয়া তখনও অভয়দানে সন্তানকে করেন রক্ষা "ভয় নাই কোন চিন্তা করো না।" মাতৃবলে বলীয়ান হৃদয় হ'তে ভয় যেন দূরে পালায়, বিপদেরও হয় অবসান…কৃপা যে দুকুল ভাঙ্গা তাতে আবার জগজ্জননীর কৃপা…

পরিব্রাজকের বেশে কোন সন্ন্যাসী ছেলে নিতে এসেছেন মা'র আশীষ ভরা অনুমতি…নিজের উদ্ধত ব্যবহারে নিজেই অনুতপ্ত। তিনি যেতে চান সঙ্ঘের বাইরে…কপর্দ্দকহীন অবস্থায়। ছেলের অনুতাপ ভরা ব্যথা মা'র প্রাণে বাজে বলেন, "আমি মা, আমি কি করে বলি বাবা তুমি যাও? আবার শুনছি তোমার হাতে পয়সা নাই, খিদে পেলে কে খেতে দেবে বাবা?" এযে আপন মায়ের কথা…স্নেহের আকুতি দুহাত দিয়ে দেয় বাধা…ঘরের ছেলে ঘরেই রয়ে যায়, যাওয়া আর হয় না।

আবার প্রয়োজন বোধে অনুমতিও যে দেন নাই তাও নয়…অশ্রু সজল চোখেই দিয়েছেন বিদায়,…"হেসে নেচে চলে যাও আমি আছি।" বলেছেন "আমায় ভুলো না বাবা"…আর দিয়েছেন আশ্বাস, "আমি মা, মা কি ভুলতে পারে ছেলেকে?" সন্তান পদে পদে পেয়েছেন তার প্রমাণ। ছেলেকে পাঠিয়েছেন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে আনতে; মাতৃআদেশ শিরোধার্য্য করেই এসেছেন ভক্ত…আদেশ মত সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করার পর এক মণ হয় সেই ক্রীত দ্রব্যের গুরু ভার। মাতৃ আদেশ

অক্ষরে অক্ষরে করতে চান পালন তাই কারও মাথায় তুলে দেন না সে বোঝা...মা তো দেননি আদেশ কোন কুলি নিতে—আপন মাথে তুলে নেন সেই বোঝা...অনভ্যস্ত দেহ, গুরুভার বহন করতে। তবু মাতৃআদেশ হবে না ব্যর্থ···সন্তান চলেছে, মাথায় সুরু হয় অসহ্য জ্বালা আর ব্যথা এদিকে আকাশ ভেঙ্গে নেমেছে বাদল ধারা···এক হাতে ছাতা ঝুড়ির ওপর ধরে আছে—পিচ্ছিল কর্দ্দমাবিল পল্লীর পথ ···স্খলিতপদে অতিক্রম করেন সে পথ ভক্ত অনাবিল বিশ্বাসে...কিন্তু বিস্ময় জেগে উঠল, যখন বর্ষার মেঘসম্পাতে ভেঙে পড়া একটি নীচু সংকীর্ণ জলপূর্ণ পথ পার হয়ে তাঁর মাথার বোঝা গেল সম্পূর্ণ হালকা হয়ে···গভীর বিস্ময় ছাড়া কোন কারণই গেল না পাওয়া... স্বচ্ছন্দ গতিতে—এসে উপনীত হন মা'র দ্বারে কিন্তু গৃহে প্রবেশ করেই নেত্র হয়ে যায় স্তম্ভিত, স্থির...চেয়ে দেখেন মা'র এক অদ্ভুত রূপ... তীব্র বেগে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ক্রমাগত বেড়াচ্ছেন ছুটে···শ্রীমুখে অগ্নির রক্ত আভা, সচঞ্চল বিস্ফারিত আঁখি, যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চায়—বলছেন, "আমি কেন একটা কুলি নিতে বল্লুম না?"

এতক্ষণে মেলে দিশা, মধ্যপথে সহসা কে তুলে নিয়েছিল গুরুভার···যাই হোক মাথার সে বোঝা নামালে মা'র সে ভাবের হল উপশম; শান্ত তিরস্কারে বলেন, "একটা কুলি নিতে হয়। আমি বলি নাই তাতে কি হয়েছে? এরকম করে কি আসতে হয়।" ইহ পরকালের সকল ভার যিনি নিয়েছেন মাথার মণি করে, সন্তানের মাথায় এই বোঝাটুকু তুলে দিয়ে তিনি কি থাকতে পারেন নিশ্চিন্তের স্বাচ্ছন্দে? তাই সে ব্যথাটুকুও নিতে হয় আপনদেহে।···

মাতৃদর্শন মানসে পল্লীর মাটীতে এসে কোন ছেলে হয়তো হ'য়ে

পড়েছে জ্বরাতুর...চিন্তা ভারাক্রান্ত হয় জননীর অন্তর পুত্রের অসুস্থতায়। কিন্তু সেই রাত্রে তাঁর দেহেও দেখা যায় জ্বরভাব। পরদিন ছেলে সম্পূর্ণ জ্বরমুক্ত হয়ে উঠে বসে। মা এসে কুশল প্রশ্ন করে ব্যবস্থা করলেন তার পথ্যের...এমনি কতবার কত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের আকুতিতে সর্ব্বমঙ্গলা আশ্বাস দিয়েছেন, "ভয় নাই ভাল হয়ে যাবে"। তারপর সেই জন্ম-জন্মার্জ্জিত দুস্তর ভোগ রাশি আকর্ষিত হয়েছে সেই করুণার জাহ্নবীতে।

মানস তনয়া গৌরীমা মায়ের কর্ম্মীমেয়ে তাই তাঁর দেহটি যেন মোহরের ঝাঁপি বলেই মনে হয় মা'র। সেবার কলকাতায় সংক্রামক ব্যাধি এল তার মরণবীজ ছড়িয়ে দিতে—ঘরে ঘরে বসন্তের প্রাদুর্ভাবে মৃত্যু সংখ্যা কম হল না...সে কি দুর্দ্দিন। গৌরীমা তখন বলরাম মন্দিরে ...সেদিন মধ্যাহ্নের রক্তআঁখি যেন প্রকৃতির বুকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সহসা দেখেন গৌরীমা ঝড়ের বেগে ঢুকলেন জননী স্থূলে না সূক্ষ্মে? কে জানে? চোখ দিয়ে তা যেন ধরা যায় না...এসেই গৌরীমার সমস্ত অঙ্গ যেন কল্যাণ হস্তে ঝেড়ে দিলেন—তার পর যেমন এসেছিলেন পাগ্‌লা ঝোড়ো হাওয়ার মত ঠিক তেমনি করেই গেলেন চ'লে। দুদিন যেতে নাযেতে দেখা গেল একদিকে উদ্বোধনের একটি গৃহ কোণে মা হয়েছেন শয্যালীন, নিষ্ঠুর বসন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁর অঙ্গে—আর একদিকে বলরাম মন্দিরে গৌরীমা বসন্তের তীব্র জ্বালায় শয়নলীন। সেবার তাঁর জীবনের আশাই ছিলনা, কিন্তু মায়ের মেয়ের কাজ যে এখন অনেক বাকী—তাই হয়না যাওয়া...মা তাঁর দেহস্থিত ভোগরাশির খানিক অংশ নিলেন আপন দেহে আকর্ষণ করে...এই নীলকণ্ঠের লীলাই তো এযুগের বিশেষত্ব।...দূর পাশ্চাত্যের অধিবাসিনী এসে সেদিন জানালেন প্রার্থনা,..."মা আমি বড় কাতর আছি। আমার একটি

মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, তার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই মা আপনার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিবেন, মেয়েটি যেন ভাল হয়।" বিলাসের লীলাভূমি হতে পাশ্চাত্যবাসিনী এসে দাঁড়িয়েছে ভারতলক্ষ্মী জননীর চরণান্তিকে...দীন আকুতি নিয়ে...তাঁর করুণা-ভিক্ষায় পূর্ণ করে নিয়ে যাচ্ছে রিক্ত ঝুলি···এ দৃশ্য বুঝি জগৎ দেখল এই প্রথম—বিশ্বজননীর নব আবির্ভাবে জননীর আশীর্ব্বাণী হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত··· "আমি প্রার্থনা করব তোমার মেয়ের জন্য, ভাল হবে।" আর কি ভাবনা ···আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বিদেশিনী—বলে, "তবে আর ভাবনা নাই, আপনি যখন বলিতেছেন ভাল হইবে তখন ভাল হইবেই নিশ্চয়—নিশ্চয় —নিশ্চয়।" বিশ্বাসের তড়িৎশিখায় দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তার মুখ, তার কণ্ঠ···

সদয়া জননী—গোলাপমাকে করেন আদেশ, "ঠাকুরের ফুল একটি একে দাও...একটি পদ্ম আন।" গোলাপ মা দিলেন জননীর হাতে... ফুলটি হাতে করে ফিরে চাইলেন মা ঠাকুরের পানে...মনে মনে কি যে কথা হ'ল বাইরে তা বুঝল না কেউই···তারপর সেই প্রসাদী কমলদল দিলেন তুলে আর্ত্ত মেয়ের হাতে, "তোমার মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দেবে।" সে কি কৃতার্থমন্য রূপ—কৃতজ্ঞতার ভারে সে যেন লুটিয়ে পড়বে মা'র চরণ ধূলায়···তারপর জোড় হাতে বলে, "ফুলটি নিয়ে কি করিব?" "কেন কি আর করবে, শুকিয়ে গেলে গঙ্গায় ফেলে দেবে?" চিরন্তন রীতিই দেখান গোলাপমা। কিন্তু বিদেশিনীর কাছে এ যে নূতন পাওয়া অমূল্য ধন—পরম প্রতিবাদের ভঙ্গীতে সে বলে ওঠে, "না না এ ভগবানের জিনিষ ফেলিয়া দিব? একটি নূতন কাপড়ের থলে করিয়া রাখিয়া দিব। সেই থলেটি মেয়ের গায়ে রোজ বুলিয়ে দিব।" সস্নেহ সম্মতি পান তিনি মা'র মুখে, "হ্যাঁ তাই কারো"...কি জ্বলন্ত বিশ্বাস। সে বলে তার অতীত জীবনের কাহিনী...ছোট্ট শিশু, আর

সেদিন সেও হয়েছিল রোগকাতর...সেদিনও সে এমনি আকুতি জানিয়েছিল তাদের অলখ দেবতা ঈশামসীর চরণতলে...সরস অশ্রুসিক্ত একটি রুমাল দিয়েছিল বিছিয়ে, যেমন করে কাঙাল পাতে তার ভিক্ষার ঝুলি··· কতক্ষণ চেয়েছিল জানিনা—বহুক্ষণ পরে সে যখন প্রার্থনা অন্তে চোখ মেলে চাইল, দেখল তিনটি কাঠী রয়েছে সেই রুমালের ভিতর। কি যে পেল সেই জানে। ছুটে নিয়ে এল তার রুগ্ন শিশুর শয্যা পাশে, বুলিয়ে দিল সেই তিনটি কাঠী তার অঙ্গে। কৃপার জিয়ন কাঠীর পরশ পেয়ে মৃত্যুমুখে এসে পড়ল নবজীবনের আলো—বল্‌তে বল্‌তে আর হয় না বলা—চোখ ভ'রে তার নামে অশ্রুগঙ্গা...তারপর আবার অন্তরের আকুতিটুকু জানিয়ে সে নেয় বিদায়। সম্বল করে নিয়ে যায় মায়ের প্রসন্ন আশীষ আর কৃপার আমন্ত্রণ—"তুমি মঙ্গলবারে এস।" ঠাকুরের কি মহিমা—এবারেও সে পেল বিশ্বাসের পুরস্কার—কন্যারত্ন তার উঠে বস্‌লো নীরোগ হয়ে, আর মঙ্গলবারে এসে সেও পেল মার করুণার দান ইষ্টমন্ত্র...।

সন্তানের কুশল চিন্তায় কত তন্দ্রাহীন রজনী যেত পার হয়ে··· একদিন নয় দিনের পর দিন; তাই গভীর রাতেও ভক্ত এসে পেয়েছে সমান আদর আপ্যায়ন···গভীর রাতে সন্তানের স্মৃতির তীর্থে মা'র স্নেহের পরশ হ'য়ে থাকে অম্লান, সে ভুলতে পারে না সে মমতামথিত কণ্ঠ, "তোমাদের আসতে এত দেরী হল? এস আগে ঠাকুরের প্রসাদ পাবে এস—আমি তোমাদের জন্য সব তুলে রেখে দিয়েছি···স্নেহমুগ্ধ সন্তান বলে আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে, "আমরা যে আসব আপনি কি করে জানলেন?" বলেন মা, "ঠাকুরকে ভোগ দেবার পরই বুঝতে পেরেছি তোমরা আসছ," সন্তানকে তৃপ্ত ক'রে তবে শান্তি···

ছেলে এসে ধরে আব্দার, "মা তোমার প্রসাদ শুকিয়ে নিয়ে যাব,

আমার দেশে—দূরদেশে গিয়েও তোমার প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হ'তে মন যেন কেমন্ ক'রে"—সস্মিত মুখে সম্মতি দেন জননী। ভোগ শেষে ছেলের হাতে দিলেন প্রসাদ...ছোট্ট একটি থালায় রোদ্দুরে শুষ্ক করতে দেওয়াও হ'ল—কিন্তু ছেলে ধ'রে রাখতে পারেনা সে আকুতি—মায়ের করুণার অসীমতা কিন্তু থেকে যায়। দেখা যায়—প্রসাদের কথা ভক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ বিস্মৃত, আর সারাটি দ্বিপ্রহর করুণাময়ী ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশটুকুতে বসে প্রহরারত...ভক্ত সন্তানের প্রসাদী অন্ন পাছে কেউ নষ্ট করে ফেলে...অপরাহ্নে স্মরণে জাগতেই—ছুটে আসে ভক্ত, দেখে মা তেমনি ভাবেই আছেন উপবিষ্টা। বিস্মিত ভক্ত বলেন, "মা তুমি বিশ্রাম করনি ?" সহজ শান্তকণ্ঠে আসে উত্তর, "বাবা তোমার ওটি পাছে নষ্ট হয় তাই বসে আছি"·· লেখনী বন্ধনীতে হয়তো ধরা আছে এমনি ছোট্ট দু একটি চিত্র···কিন্তু এমনি করে অলখ করুণার আলোয় তাঁকে প্রতিক্ষণে দেখেছিলেন তাঁর বিশ্বের ছেলেমেয়ে—অবহেলার পরিবর্তে তাঁরা হয়েছিলেন মা'র স্নেহের উত্তরাধিকারী। যখন যেমন ভাবে চেয়েছেন তেমনি ভাবে পেয়েছেন মা'র অনন্ত উৎসারিত কৃপার ধারা···পথে চলেছেন ভক্তদ্বয়, মনে মনে জাগে অভিলাষ, আর কিছু নয় শুধু একটু খানি সেবার অধিকার যদি পাই ধন্য হবে জীবন···পূর্ণ হবে আশা···কিন্তু দুজনের মনের কথা দুজনের মনেই থাকে গোপন···প্রকাশ আর হয় না···এদিকে মুখে অবিরত মাতৃনামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে মাতৃসকাশে পৌঁছে দেখেন ভক্ত, প্রসারিত শ্রীচরণে উপবিষ্টা অন্তর্য্যামিনী·· প্রতীক্ষারত দুটি আঁখি—স্নানে যাবেন তাই নিকটে ছোট্ট একটি বাটীতে তেল। কুশল প্রশ্নাদি সমাপনে ভক্তদ্বয় চরণ দুটি টেনে নিয়ে মাখিয়ে দেন তেল ; সাধ মিটল প্রসন্ন নয়নে বলেন মা—"এবার হয়েছে তো ?"

সেদিন দীন দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ এসেছেন বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে… চোখে মুখে দীনতার আকুলতা। একদিকে মাতৃদর্শনের আনন্দ উল্লাস, আর একদিকে রিক্ত প্রাণের ব্যর্থতায় যেন তার মনের অকুল কূলে চলে জোয়ার ভাটার খেলা। কপর্দ্দকহীন অবস্থা তবু মাতৃদর্শনে রিক্ত হাতে আসতে ঠেকে বাধা, তাই সঙ্গে এনেছেন এক পয়সার বাতাসা কয়েকখানি, অতিসঙ্গোপনে, চুপি চুপি, একান্ত রিক্তপ্রাণের নৈবেদ্য…মৌন নত চোখে ভাবেন কেমন করে তুলে দেব ঐ করকমলে এই সামান্য নৈবেদ্য …তবু তুলে দিতে হয়—দ্বিধা বিজড়িত কম্পিত হাতে। পরমানন্দময়ী জননী পরমানন্দে তখুনি ছোট্ট বালিকার মত মুখে দেন সেই বাতাসা। মনে পড়ে মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কাছে লজ্জিত সুদামার সেই সামান্য নিবেদন আর সুদামাসখার তাই মহানন্দে ভক্ষণ আর তারপর শ্রীমুখচ্যুত প্রসাদকণায় পরিতৃপ্ত কৃষ্ণমহিষী রুক্মিনী—যুগে যুগে একই লীলা নবরূপায়ণে।…সুদূর উড়িষ্যা দেশের অধিবাসী জনৈক ভক্ত এসেছেন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল উৎসবে…সাধ মাতৃচরণ রঞ্জিত করে দিবে আবির কুঙ্কুমে…কিন্তু দর্শনের আকুলতায় উদ্বেগে সঙ্গে আবির নিতে হল ভুল…যোজন পথ পার হয়ে দোল উৎসবের প্রভাতেই মিলল মাতৃচরণ দর্শন…জননী তখন কোয়ালপাড়া শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রমে অধিষ্ঠিতা।…বৈকালে আবার এল ডাক কিন্তু এডাক তার জন্যে নয়, আগন্তুক দর্শনার্থী, যাঁরা নাকি সকালে দর্শন পান নাই কেবলমাত্র তাঁদেরই মাতৃদর্শনে যাবার আছে আদেশ। বহুদিনের অতৃপ্ত আশা

যেন নির্ম্মম আঘাতে পড়ে ভেঙে, তবু ভক্ত এগিয়ে যায় কিন্তু অপর দিক থেকে আসে নিষেধ বাণী, "আপনার যাবার হুকুম নেই।" বহুদূর থেকে বহন করে আনা আশা হয় ব্যথা হত···ফিরে যাবার পথও নয়ন পথে যায় হারিয়ে···নির্ব্বাক নিশ্চল চোখে দাঁড়িয়ে থাকেন ভক্ত... এমন সময় আসে ডাক—"মা ডাকছেন"—নয়ন জলে ভক্ত এসে দাঁড়ায় মা'র দ্বারে···অপরূপা তখন বসে আছেন ছোট্ট বালিকার মত —সামনে অবির পরিপূরিত থালা···আনন্দময়ী ফুল্লকুসুমিত মুখে বলেন, "ওরে আজ যে দোলপূর্ণিমা, ফাগ দিতে হয়"...নয়ন জলের কুঙ্কুমে ভক্ত আবির মাখিয়ে দেয় শ্রীচরণে।···কোন ভক্ত হয়ত মনে মনে অন্ন নিবেদন করছেন, সহসা মা দিব্যভাবে আপনি তুলে নেন সে অন্ন, বলেন—"এতো ঠাকুরের প্রসাদ—এই দেখ আমি নিজেও প্রসাদ করে দিচ্ছি"···ভক্ত হয় ধন্য। সেদিন মা'র হাতে জলটুকুও যেন লাগে সুধার মত। একদিকে ভক্ত অফুরান তৃষ্ণায় পান করেই চলে আর জননী দিয়েই চলেছেন অকৃপণ হাতে···আর শ্রীঅধরে ফুটে উঠেছে অলকায় ফোটা দিব্য হাসি···বিস্মিত বিশ্রান্ত ভক্ত বলেন, "মাগো এযে সুধা।" তেমনি হাসি ভরা মুখেই বলেন মা, "তা হবে।"···

ভক্ত আসছেন কলিকাতা হ'তে জয়রামবাটী—সঙ্গে শরৎ মহারাজের প্রদত্ত কিছু পূজা উপহার—তাঁর আদেশ সেগুলি পৌঁছে দিতে হবে মাতৃমন্দিরে…। সহসা বেজে ওঠে মেঘ ডম্বরু, দিক দিক মুখরিত করে সুরু হয় ঝড় ঝঞ্ঝা আর প্রবল ধারাসার, আকুল হয়ে ওঠে ভক্ত …বুকে চেপে ধরে উপচারগুলি—ভাবে, হায়! বুঝি স্বামীপাদের আদেশ হয় লঙ্ঘন…এদিকে সন্তানের আগমন বার্ত্তা বেজে ওঠে নাড়ীর টানে, তার পথের ব্যথাটুকুও এসে ঘা দেয় মা'র হৃদয় দ্বারে—নিকটস্থিত ভক্তদল বোঝেনা কেন জননী চকিত চরণে দণ্ডে দণ্ডে আসছেন ঘরের বাহিরে আর তৃষিত নয়নে চাইছেন মেঠো পথের পানে —বলছেন, "বাছার আমার ঝড়বৃষ্টিতে না জানি কত কষ্টই হয়েছে।" মহামায়ার ইচ্ছায় শেষে পরাভূত হয় প্রকৃতির সেই রুদ্ররূপ। অশান্ত মেয়ে হ'ল শান্ত ভক্তও পৌঁছল নির্ব্বিঘ্নে মাতৃচরণে…প্রণাম নিবেদনের দেরীটুকুও যেন হয় অসহ্য…বলেন জননী আপনার ভুক্তাবশিষ্ট পাত্রে প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন সজ্জিত ক'রে—"বসে পড়ে বাবা, এ পাতে আমি খেয়েছি।" মূক বিস্ময়ে—ভাবেন ভক্ত—"তুমি কি মা শুনতে পাও সন্তানের মানসবাণী—তার শত অভিলাষে পূরিত মর্ম্মব্যথা ?…আমার যে বহুদিনের সঞ্চিত আশা তোমার ভোগ শেষে তোমার প্রসাদী পাত্রের প্রসাদে যেন অধিকারী হই…সে সাধ আমার এমন করে পূর্ণ করলে জননী।"…

কোয়ালপাড়া মঠে এসেছেন মা, কলিকাতা যাত্রার পথে—দলে দলে আসে অগণিত ভক্ত—একটু ক্ষণের জন্য মা'র করুণাভরা সঙ্গলাভ করতে⋯দুর্লভ মুহূর্তটুকুও হারাতে চায় না কেউ। আনন্দের কল-গুঞ্জনে ভরে উঠেছে ছোট মঠবাড়ীখানি। সকলের মুখে হাসি, কিন্তু একটুখানি চোখের জলের চন্দন না হ'লে বুঝি বিশ্বজননীর পূজা থেকে যায় অসম্পূর্ণ তাই দূর-মাঠে নীরবে অশ্রু ফেলে মা'র একটী কৃষক ভক্ত। কাজ সে করছে কিন্তু কাজে তার মন লাগে না, অশান্ত ব্যথিত মন তার মঠভূমির ধূলায় ধূলায় বুঝি আছড়ে কেঁদে ফিরছে⋯কোন কারণে সে বিতারিত হয়েছে মঠ থেকে। মঠের প্রবেশ দ্বার নাকি তার জন্য চিররুদ্ধ...বেদনায় মর্ম্মাহত হয়ে সে কাঁদছে এমন সময় কানে আসে সে কার ডাক "পদ মঠে আয়" চেয়ে দেখে ভক্ত—জনৈক মঠবাসী সন্ন্যাসী। বিস্মিত হয়ে সে জানায়, "কেমন করে যাব? সেখানে যেতে যে নিষেধ আছে প্রধানের"। "তিনিই ডাকছেন," জানান সন্ন্যাসী—। দীন কৃষক ভক্ত আসে ছুটে এসে শোনে মঠাধ্যক্ষ নয়, ডেকেছেন মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং...ডাক দিয়েছেন মা জননী নিজে। আনন্দে অশ্রুটলটল করে ওঠে ছেলের চোখ⋯দেহযষ্টি ভেঙ্গে পড়ে জননীর শ্রীচরণ প্রান্তে⋯তারপর মা'র হাতে একটুখানি প্রসাদ আর স্নেহসিঞ্চিত—সান্ত্বনা, "বাবা বাসনা পূর্ণ হয়েছে তো?" —ব্যথা আর ঠাঁই পায় না—অথৈ লাগে সুখের সায়র চোখের জলে —মায়ের সোহাগ, সে যে কত মধুর সে যে পেয়েছে সেই জানে

অশরণের শরণ—অনাথের নাথ। তাইতো দীনের তরে নিত্য খোলা মা'র করুণার দেউলখানি। মঠের সামান্য চাকর চুরি করার অপরাধে হয়েছে অপরাধী...মঠে তার স্থান হয়না; চোখের জলে সেও যখন জানায় তার ব্যথা···জানায় অভাবের তাড়নায় তার স্বভাব হয়েছে নষ্ট, তখনও দেখি শতস্ফূরিত করুণায় বিগলিতা মাতৃমূর্ত্তি তাকে আপন মন্দিরে স্থান দিয়ে স্নানাহারে পরিতৃপ্ত করছেন সযত্নে···আবার দরদী ছেলে বাবুরাম মাতৃদর্শনে এসেছে—অপরাধীর দিক নিয়েই তার প্রতি গভীর সহানুভূতিতে মা সর্ব্বত্যাগী সন্তানকে করেছেন আঘাত, "তোমরা সন্ন্যাসী—সংসারের যে কত জ্বালা তোমরা তো তার কিছু বোঝ না, লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" সভয়ে জানান বাবুরাম মহারাজ, "ফিরিয়ে নিয়ে গেলে নরেন ভাই যে হবে বিরক্ত"...দীপ্ত-কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আদেশ, "আমি বলছি নিয়ে যাও।" মাতৃ আদেশ হয় শিরোধার্য্য···মা'র দুঃখী সন্তান আবার মঠে আসে ফিরে। প্রথম দর্শন মাত্র বিরক্ত হয়ে ওঠেন স্বামিজী, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শোনেন স্বয়ং সংঘজননীর আদেশ, নম্রমাথা ফণীর মত নরেন মেনে নেন মা'র সেই আদেশ—।

কৈশোরের পাতানো ডাকাত বাবার মত এমন কত ডাকাত বাবার কলুষিত চিত্ত যে হয়েছে নিকষিত কাঞ্চন স্নেহের পরশমণিতে, তার ত হিসাব মেলে না ইতিহাসের পাতায়...মায়ের একদিকে যেমন 'কোর

আলোকরা ছিল শুদ্ধ সত্ত্ব সুপুত্রের দল তেমনি কুপুত্রেরও ছিল না অভাব। কিন্তু তারাও বঞ্চিত হয়নি—বিতাড়িত হয়নি, মা'র মমতার প্রাঙ্গন হ'তে—সে প্রাঙ্গনে সকলেই পেয়েছে শান্তি পাবার মত, জুড়োবার মত একটুখানি ঠাঁই—উপরন্তু যে নাকি সকলেরই হ'ত একান্ত উপেক্ষার পাত্র, মা'র সোহাগভরা পক্ষপাতিত্ব তাকে যেন শত বাহু-মেলে রাখতো ঘিরে, আর তারই অপরূপ ফল স্বরূপ দেখা যেত তার অসৎ প্রবৃত্তির স্থানে এসে ঠাঁই নিয়েছে এক বিচিত্র পরিবর্তন।—

মুসলমান ডাকাত আমজাদ, শিরোমণিপুরের বাসিন্দা, দস্যুবৃত্তিতে খ্যাতি তার ছিল বেশই। শুধু সে কেন, ঐ শিরোমণিপুরের বহু মুসলমানেরই এই হিংস্রবৃত্তিই ছিল উপজীব্য···গ্রামবাসীর কাছে তা'রা ছিল ভয়ের বস্তু। দিন মজুরীর কাজে তাই তা'রা কোনদিনই কোন গৃহ হতে ডাক পেত না। কিন্তু কি তাতে আসে যায়···অসীম করুণার প্রতিমা দয়াময়ী মা যে আছেন সবার তরে—তাই দেখি, সেই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান আমজাদের যখন হল কারাদণ্ড, তখন সম্বলহীন তার স্ত্রী পুত্রের অশ্রুজলে বিগলিতা মা সাহায্য করছেন চুপি চুপি...সান্ত্বনা দিচ্ছেন গভীর অনুকম্পায়; আমজাদ প্রভৃতি ডাকাতেরা অনেকে মা'র দেবীকুটীরেই পায় প্রথম কাজ···এমন কি মার আপন বাসঘরের বারান্দায় ঘরের ছেলের মত বসে খেতে। কিন্তু বিজাতীয়কে গৃহাঙ্গনে ঠাঁই দিয়ে তাকে আহার দিতে গৃহবাসীদের মন হয়ে ওঠে অপ্রসন্ন—শুধু

মাতৃ আদেশে দিতে হয় এই ঠাঁই, তাই ব্যবহারে ফুটে ওঠে অবহেলা-ভরা অযত্নের ভাব। মা'র সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেটুকুও ধরা পড়ে…মৃদু তিরস্কারে বলেন, "অমন ক'রে খেতে দিলে কি লোকের তৃপ্তি হয়, তোরা না পারিস আমি দিচ্ছি"…পরম যত্নে পরিতোষে খাওয়ান সকলের উপেক্ষিত সন্তানকে। তা না হ'লে বিশ্বজননী নামে যে কলঙ্ক লাগবে…। এ বুকের দরদ ছিল আকাশ ছোঁওয়া—সারা বিশ্ব তাইতো পড়েছিল ধরা —ধরা পড়েছিল সত্যি কিন্তু পারেনি ধরতে—বিশেষ ক'রে যা'রা ছিল লীলাপীঠের নিত্যবাসী…চর্ম্মচক্ষে নিত্য দেখছে দেবীর নর্ম্মলীলা—অথচ ছোট্ট আমোদরের মত তাদের গ্রামখানিকে ঘিরে বহেছিল জননীর কৃপার সুরধুনী…বুঝেও যেন পারেনি বুঝতে…হয়ত লীলার এও একটি দিক। তাইবুঝি শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজরাজের মথুরার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সত্বার প্রতি ছিল ব্রজের রাখাল ও গোপীরা চির বিমুখ। তা'রা চেয়েছিল তাদের প্রাণকমলে রাখাল কৃষ্ণকে, আর মানমিলনের রাসমঞ্চে কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধিকাকে তাদের নিত্য দিনের গোষ্ঠ মিলনের কুঞ্জকুটীরে—তাই যখন নিত্য সঙ্গলাভে ধন্য ভক্ত মাকে করেছে প্রশ্ন, "তোমায় দেখতে দূরাগত ভক্তের দল এসে নিত্য ভিড় করেছে তোমার দ্বারে, আর আমরা তোমায় দেখছি ঘরেরই একজন অতি সাধারণ রূপে? মাগো! তোমায় চিনতে কেন পারি না? বলেন জননী, "তোমার আমায় চিনে কাজ নেই বাবা তুমি বেশ আছ।"

আবার গ্রামবাসী কোন ভক্তের এমনিতর প্রশ্নেই দিয়েছেন ভাবমধুর উত্তর, "তা নাই বা বুঝলি; তোরা আমার সখা, আমার সখী।"

তা'রা যেন সত্যিই ছিল মায়ের ঘরের আপনজন—সুখে দুঃখে তারাও আসতো ছুটে, জগৎ জননী ব'লে নয়, তাদের মাটীর ঘরের মা ব'লে। সেবার হ'ল অনাবৃষ্টি। রুদ্রের নেত্রবহ্নির মত জ্বলে উঠল

গগন ললাট—ছোট্ট গ্রামখানির সরস বক্ষ সে জ্বালা পারে না সইতে তাই জ্বলে গেল সমস্ত শ্যাম শস্য...পল্লীচাষীর দল চিন্তায় আকুল···ছুটে আসে মা'র কাছে, "মাগো আর উপায় নাই, ছেলেপুলে নিয়ে এবারে না খেয়ে হবে মরতে।" দুলে ওঠে করুণা-বিগলিত হৃদয়খানি। ছুটে আসেন চাষী ছেলের সঙ্গে—তাদের দুঃখে দুঃখ মিলিয়ে এসে দাঁড়ান সেই দাবদগ্ধ রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে, যেন পল্লীছেলের মাঝে মূর্ত্তিমতী পল্লী-লক্ষ্মী। "চৌদ্দ-ভুবন সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।" ভক্ত কবির কাব্য হল মূর্ত্ত। জননী শুষ্কভূমির চতুর্দ্দিকে করুণ দৃষ্টিপাতে বলে ওঠেন, "হায় ঠাকুর! একি কল্লে, শেষটায় কি এরা না খেয়ে মরবে?" তারপর ফিরে এলেন আপন ঘরে...সারাদিন পরে রাত্রির আঁধারে সুরু হল মেঘের নাচন আর কি বৃষ্টি···কি আকুল কি উতল তার ধারা···কত বৎসর যেন বৃষ্টির মাঝে ছিলনা এমন প্রাণ উচ্ছলতা...মাঠ ভরে ওঠে সেবার শ্যামশস্যে···লক্ষ্মীর চরণ চুম্বনে করুণা সিঞ্চনে প্রচুর শস্য ফুটে উঠেছিল সেবার মাঠে। শ্যামশ্রী বহু বছরই যেন তেমনটী যায়নি দেখা।···মা'র নিজমুখের আশ্বাস বাণী স্বতঃই স্মরণে উদিত হয়—

> ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থানচাপদঃ
> ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্ট বিয়োজনম ॥
>
> —চণ্ডীমাহাত্ম্য

শুধু কি নিজের দেশের জন্য···কোথায় দূর পূর্ব্ববঙ্গ—কোথায় সুদূর পাঞ্জাব—সাধারণ এক পল্লীজননীর কাছে যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই সম্ভব নয় আর সেই পল্লীর সুখ দুঃখে কাটল যাঁর চিরটি দিন তাঁর চিন্তা, তাঁর ব্যথা জড়িয়ে ধরে সেই সুদূর বিদেশগুলিকেও, বলেন—"শুনছি পাঞ্জাবে নাকি ফসল হয়নি—আর আর জায়গায় নাকি হয়নি—হায় ঠাকুর! লোকের দশা কি হবে?"···

যখন দিকে দিকে চলেছে স্বদেশী হাঙ্গামার অভিযান তখন যেমন চিন্তা হয়েছে তাঁর পরাধীন ভারতসন্তানদের জন্য, কোমলা জননীর মত ভয়ে হয়েছেন ব্যাকুল, পাছে তাদের ঘটে কোন বিপদ...তেমনি একথাও তাঁর শ্রীমুখে উঠেছে ফুটে দূর পাশ্চাত্যের বিজয়ী সন্তানদের জন্য, "ওরাও তো বাবা আমারই ছেলে"...

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং।
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।

চণ্ডী গাথায় দেবতাদের সঙ্গে আমাদের মাথা নীচু হইয়া আসে।

স্মরণের মন্দিরে চির জাগরূক থাকে একটি শ্যামায়িত সন্ধ্যা...পূর্ব্ব আর পশ্চিমের সম্মিলনে মাতৃমন্দিরে হয়েছে সেদিন সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা...পাশ্চাত্য হতে এসেছেন ডাঃ হ্বালক্ আর মিস্ গ্রে, আর একদিকে বাংলার ছেলে নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র, ডাক্তার কাঞ্জিলাল, সিন্ধুনাথ পাণ্ডা,...বাংলার উজ্জল রত্ন; জননী-শ্রীচরণ ঘিরে সকলেই উপবিষ্ট...আর শুকতারার মত আঁখি দুটি মেলে বসে আছেন জননী। আনন্দিনী দুলালীর মত উছল হয়ে ওঠেন মিস্ গ্রে—"মা আমি আপনার মেয়ে।" বুক ভ'রে যায় বিদেশী মেয়ের, চোখে আনন্দের দীপ্তিশিখা ...প্রশ্ন করেন ডাঃ হ্বালক্, "তুমি যে জগন্মাতা কি করে তা বুঝব?" অধরা মেয়ের প্রসাদ প্রসন্ন স্মিত হাস্যের বিকশিত করুণায় বলেন, "এখানে যখন এসেছ তখন বুঝতে পারবে।" তাই ত' দূর পাশ্চাত্য হ'তে আসে পত্র, "হে জননী কে তুমি নিত্য আমার প্রার্থনার সময় এসে

উদিত হও মেরীর স্থানে ?"—ও,দেশেরই একটি বাণী মনে পড়ে যায়—'ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেন নিশ্চয় কিন্তু সেটি পূর্ণ করতে তিনি কিছু সময় নেন'—অতি সত্য এ কথা।

খ্যাতনামা ডাক্তার কাঞ্জিলাল। তাঁর সহধর্ম্মিণী জানালেন প্রার্থনা—"মা তোমার ছেলের যেন উপায় হয়"—বিস্মিতা মা বলেন তার মুখের পানে চেয়ে—"এমন আশীর্ব্বাদ করব আমি,—যে সকলের অসুখ হোক্ কষ্ট পাক ? আমি তো তা করব না মা, সকলে ভাল থাক জগতের মঙ্গল হোক।" এমনি বিশ্বজোড়া ছেলের জন্য নাড়ীর টান ; ক্ষুদ্রতার কোন স্থান নেই এখানে। এমন কথাও শুনি ভক্ত মুখে যে কোন কোন মাতৃহারা বালকভক্ত জননীকে দেখেছে তার গর্ভধারিণী মায়ের রূপে—বিস্ময়ে অভিভূত পলকহীন দৃষ্টি মেলে দেখেছে···বুক ভ'রে পেয়েছে বঞ্চিত স্নেহের আস্বাদ—ভুলেছে সব ব্যথা···। তবু থাকে অবিশ্বাসে অন্ধ হৃদয়, বুঝেও অবুঝ হয়ে থাকা যার স্বভাব—সেদিন মায়েরই কৃপাপ্রাপ্ত কোন সন্তান করেছেন মাতৃমন্দির মার্জ্জনা। করেছেন সত্য কিন্তু মনে জেগে উঠেছে একটা প্রবল ধিক্কার, এ আমি কার ঘর ঝাঁট দিচ্ছি ? আর তার সঙ্গে জননীর প্রতি আসে আবরনের মোহ···। সহসা মোহের ঘন তমসার জাল ছিন্ন ক'রে আবির্ভূতা বিশ্বেশ্বরী···দিব্য বিভায় বিকশিত মাতৃমূর্ত্তি—আলুলায়িত কেশপাশ, শক্তি আর করুণায় মূর্ত্তিমতী—বেদবন্দিতা···জ্ঞান বিজ্ঞান দায়িনী সারদা। সন্তানের অবিশ্বাস—ব্যথা বেজেছে বুকে তাই এসেছেন ছুটে···শ্রীকরে তুলে নিয়ে সন্তানের হাতখানি আপনাকে নির্দ্দেশ করে দেন স্বরূপ পরিচয়, "আমি মা জগতের মা—সকলের মা, বুঝবি বুঝবি কালে বুঝবি"...আসে প্রশ্ন, "তুমি সকলের মা কেমন ক'রে ? তুমি কি পশুপাখী কীটপতঙ্গ ······ মা ?" ধীর গম্ভীর হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর—"হ্যাঁ ওদের মায়ের

ভিতর দিয়ে আমি ওদেরও মা...এ জন্মে ওরা এই ভাবেই আমার স্নেহ যত্ন পেয়েছে"...। স্তম্ভিত ভক্ত, আনত চোখে জেগে ওঠে শ্রদ্ধা ভক্তির দ্যুতি—মনে পড়ে জননীর বাণী, "ঠাকুর মাতৃভাব বিকাশের জন্য এবার আমায় রেখে গেলেন।"

তাই চিরদিন নিত্য আকুল হয়ে জাগতো তাঁর প্রতীক্ষারত দুটি আঁখি, পথহারা ছেলেদের পথের পানে...বেদনা মথিত কণ্ঠ হয়ে উঠতো আকুল উদ্বেল—"ছেলেরা তোরা আয়...।"

পথ হারা ছেলের পথ যে চির আঁধার, তাইতো অদিশ হয়ে পড়ে তার পথ চলা—ক্লান্ত ছেলের পথে দিতে আলোর দিশা—তার চোখে এঁকে দিতে দীপ্ত জ্ঞানের শিখাঞ্জন...তাই বুঝি জননীর কান্তকম মাতৃরূপের মাঝে চিরবিকশিত ছিল জ্ঞানঘন গুরুরূপ—মোহময়ী মহামায়ার রূপে ছেলের চোখে যিনি এঁকেছেন মায়ার কাজল "পাবকা সরস্বতী" তিনিই তো আবার আলোর চুমায় মুছিয়ে দেবেন ভুলো ছেলের ভুলের কালো। মা যে আমার জ্ঞানবিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে শুনি "ওরে ও সারদা সরস্বতী...জ্ঞান দিতে এসেছে।"

ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন—তাঁরি জীবনের একটি স্বর্ণময় অধ্যায়।... স্বামী বিবেকানন্দ তখন তরুণ ভারতের দিশারী—মাভৈঃ মন্ত্রে তুলেছেন নব জাগরণের ডমরু নিনাদ...সুরেন্দ্রকুমারের তরুণ মনে তারি সাড়া জাগে গভীর হয়ে, ছুটে আসেন স্বামী পাদের চরণ প্রান্তে বলেন,

"দাও তোমার ত্যাগের অমর টিকা আমার ভালে, বৈরাগ্যের আগুনে জ্বালিয়ে দাও আমার জীবনের দীপখানি।" বহু আর্ত্তিতে স্বামিজী হন রাজী…কিন্তু বিধাতার পথ নির্দ্দেশ হয় অন্যরূপ—দীক্ষার শুভলগ্ন উপস্থিত—মন্দিরে স্বয়ং গুরুরূপী শিবসুন্দর আছেন ধ্যানলীন—ভক্ত করজোড়ে উপবিষ্ট…সহসা ধ্যানোত্থিত শিবাবতার বলে ওঠেন, "আমি তোমার গুরু নই—শ্রীঠাকুরের দেববাণী আমি শুনেছি—তোমার যিনি গুরু তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়।" হতাশায় ভ'রে ওঠে ভক্তচিত্ত— "হতাশ হবার কারণ নেই বাবা, সময়ে সব হবে।" নিরুপায় হয়ে আসে ফিরে। অন্তরখানি পড়ে থাকে অন্তরের অন্তরে, বরণ করে নেওয়া শ্রীগুরুর চরণান্তিকে। দিন কাটে, স্বামিজীর আশীষপূত সেই শুভক্ষণ বুঝি ধরা দিল—সেদিন সুষুপ্তির আনন্দলোকে গভীর রজনীতে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেখেন স্বপ্নযোগে—জ্যোতির্ম্ময় গরগর দেবতনু…গদাধর-সুন্দর, তাঁর কোলে তিনি আছেন উপবিষ্ট—সহসা সম্মুখে আবির্ভূতা জ্যোতির্নিন্দিতা, অনিন্দিতা এক দেবীমূর্ত্তি…আলোর শতদলের মত দলমল সেই রূপকান্তি দর্শনে স্তম্ভিত হন ভক্ত…দেবী বলেন "একটি মন্ত্র নাও" "কে তুমি?" বীণার ঝঙ্কারে বলেন মহাদেবী—"আমি সরস্বতী"— যুগের সকল অজ্ঞান সকল আঁধার যেন হয় ঝঙ্কৃত। মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে সন্তানকে করেন কৃপাধন্য—"কিন্তু কি হবে এতে?" আসে প্রশ্ন—"কেন কবি হবি" "কবি তো হ'তে আমি চাইনা।" "ওরে কবি মানে যে জ্ঞানী" স্বপ্নের মত অন্তর্হিতা হন স্বপ্নময়ী—চোখের সামনে জেগে থাকে শুধু তিমিরায়িত রজনী…আর অন্তরীক্ষে বুঝি বেজে ওঠে বৈদিক ঋষির ধ্যানছন্দিত কণ্ঠ—"পাবকা নঃ স্বরস্বতী…চেতন্তী সুমতী নাম.." তারপর একদিন ভক্ত সুরেন্দ্র ছুটে এসেছেন জ্ঞানগুরুর সন্নিধানে, জানিয়েছেন সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত, মায়ের বীর সন্তান স্বামিজী আনন্দে

ডগমগ উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, "এইটি জপ করলেই তোর সব হয়ে যাবে। আর কিছু করতে হবে না"—শ্রীঠাকুর যে বলেছেন দেব স্বপ্ন সত্য।"... "স্বপ্ন সে তো মানস কল্পনা—প্রতিচ্ছায়া মাত্র—সে কেমন করে হবে বাস্তব সত্যের মত সত্য?"—ভক্তের বালোচিত প্রশ্নে জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্করের নয়নপল্লব যেন হয়ে ওঠে বিদ্যুৎশিখাবন্ত। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন "এসব বুঝি বোধোদয় বইয়ে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ প'ড়ে তোর ধারণা হয়েছে? তা নয়...ধারণা করে রাখ বাস্তবিক এটী সত্য। ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক, পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্ত্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী মূর্ত্তিতে বর্ত্তমানে আবির্ভূতা। সময়ে সব বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি, উপরে মহা শান্ত ভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার মূর্ত্তি। সরস্বতী অতি শান্ত কিনা...।" চির রহস্যের জালে আবৃত এই দেববাণীর রহস্যাবরণ যখন হল উন্মোচিত তখন কাল-চক্রে সুদীর্ঘ নয়টী বৎসর পর পর গেছে কেটে।—

জয়রামবাটীর মাতৃদেউলে সেদিন দেখা গেল শ্রীগুরুরূপিনী জননী সারদার চরণান্তিকে উপবিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার...পবিত্র দীক্ষালগ্নে; অতীতের তিমির যবনিকা ছিন্ন করে ভক্ত সুরেন্দ্রকুমারের স্মরণ হয় সেই স্বপ্নস্মৃতি—চেয়ে দেখেন স্বপ্নলোকের সেই শ্বেত-শতদল-দলিত

জ্যোতির্ম্ময়ী বেদরাণীই সম্মুখস্থিতা দীক্ষাদাত্রী জননী, জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় উন্মীলিত করতে সন্তানের মোহঅন্ধ আঁখি।

চণ্ডিকার ঐশ্বর্য্যময়ী দশমহাবিদ্যার এক একটী রূপ প্রকাশে স্বয়ং মহাকাল হয়েছিলেন পরাভূত; সন্ত্রস্ত ভোলানাথ করজোড়ে জানিয়েছিলেন স্তুতি, দেবীকে রূপসংহত করতে; সেই বগলার প্রতিমূর্ত্তি জননী। এই কথা শুনি তাঁর দ্রষ্টা সন্তানের মুখে। সেদিন বঙ্গজননীর এক নিভৃত পল্লী প্রান্তে আর একবার প্রকাশিত হ'ল আশিব দলনীর সেই সংহারময়ী রূপ।…কথামৃতের লীলাচিত্রে বহুস্থানে দেখি ভক্ত হরিশের নাম—নিয়তির দুর্ব্বোধ্য বিধিতে সেই হরিশ একদিন হ'ল উন্মাদ। সন্থ বিচ্ছেদ ব্যথায় মা তখন একান্তে শ্রীঠাকুরের ধ্যানে তন্ময় আকুল—একান্ত একাকী বাস করছেন লীলাপীঠের নিভৃত কুটীরে—সেদিন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে বিশেষ কি কারণে জননী গেছেন জনৈকা পল্লীজননীর গৃহে… একাকী আসছেন ফিরে—মধ্যাহ্নের পল্লী…গভীর তার নির্জ্জনতা… সহসা পিছনে কার উন্মত্ত পদক্ষেপ, শুনে থমকিত হয়ে ওঠে চরণ—চেয়ে দেখেন উন্মাদ সন্তান হরিশ আসছে ছুটে, তাঁর প্রতিই তার তীব্র গতি। বিশ্বেশ্বরী অসহায়া পল্লীবালার মত যেন কত ভয়ে আকুল—আত্মগোপনে আত্মরক্ষায় হয়ে ওঠেন সচেষ্ট। ইতস্ততঃ পদক্ষেপে চেয়ে দেখেন সম্মুখে ধানের মরাই। তাকেই পরিবেষ্টন করে চলে উন্মাদ সন্তানের কাছ হতে আত্মরক্ষার চেষ্টা—পাগলী মেয়ের এ যেন সাধ করে ধরা না দেবার খেলা। সহসা বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের মত গর্জ্জন করে ওঠে অসুরনাশিনী…দেবীর দলমল অঙ্গে হয় বিদ্যুৎ স্ফুরণ… করুণ নয়নে জাগে রুদ্রভ্রূকুটি…ভীষণং ভীষণানাং…সেই সংহার রূপ আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মহিষাসুরের মত দেবীর জানুতলে পিষ্ট হ'চ্ছে উন্মাদের বক্ষ। জননী এক হস্তে তার জিহ্বা টেনে অপর হস্তে

বিস্রস্ত করাঘাতে তাকে করে তুলেছেন অতিষ্ঠ। বগলার তেজোময়ী রূপ। একদিন চণ্ডমুণ্ডবধের জন্য—পার্ব্বতীর ললাট ফলক হতে আবির্ভূতা হয়েছিল কালী করালী, আর সেদিন উন্মত্ত সন্তানকে নিরস্ত করতে আবির্ভূত হল কল্যাণীর রুদ্রাণী রূপ। এরূপ চিনেছিলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ···বলেছিলেন, "বাইরে মহাশান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্ত্তি।" বাহিরে মা আমার সারদা বেদবন্দিতা ভারতী —শান্তির নির্ঝরিণী, আর ভিতরে বগলা, সে প্রকাশ শুধু একদিন নয় হয়েছে একাধিকবার। সেদিন অপরাহ্ণে জননী সহসা আহ্বান করেন ভক্ত নরেশচন্দ্রকে...চমকিত ভক্ত এসে দেখেন, জননী বিশেষ ভাবে ভাবিতা, শ্বেত শুভ্রবাস, আকুল কুন্তলা, ধ্যানমথিত গাম্ভীর্য্যে শ্রীমুখ তরঙ্গ প্রতিহত মহাসাগরের মত থমথম করছে, দক্ষিণ-পাণিতে অভয় মুদ্রা নিয়ে আছেন দাঁড়িয়ে। "কি ফুলে হবে মা তোমার এই রূপের পূজা, আমরা যে মা অবোধ ছেলে। "সাদা ফুল হলদে ফুল দুই-ই আনতে বল।" জননীর আদেশ হয় প্রতিপালিত —আরো বললেন, "সাদাফুল ঠাকুর ভালবাসেন, আর হলদে ফুল আমি ভালবাসি।" কম্পিত হস্তে ভক্ত অঞ্জলি ভ'রে শ্রীচরণ দুটি সাজিয়ে দিতে হন উদ্যত। আবার জননীর প্রত্যাদেশ, সাদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে তাঁর দক্ষিণ চরণ আর বাম চরণে নিবেদিত হবে পীতপুষ্পের ডালি। একি শুধু বগলারূপের প্রকাশ; মনে হয় জননী সর্ব্বদেবীস্বরূপিনী···একাধারে কমলদলবাসিনী কমলার আর রণরঙ্গিনী বগলার রূপে নিলেন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি। তা' না হ'লে দক্ষিণ চরণে নিলেন কেন নারায়ণের অভিলসিত শ্বেত পুষ্পের নিবেদন···

আবার করালীর ভীম-ভবানী প্রতিমূর্ত্তিও হয়েছে সময় সময় প্রকটিত, অদ্ভুত ক্ষণিক ভাবান্তরের ছলে···রহস্যের ছলে কোন ভক্ত

সেদিন বলেছেন, "কামারপুকুর শ্রীমন্দির যদি হয় অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত" —সঙ্গে সঙ্গে হয় ভাবান্তর...অগ্নিলীলার কথায় বুঝি মনে পড়ে ধুধু করা শ্মশান চিতার স্মৃতি, সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে শ্মশান সুন্দরীর রুদ্রভাব। তাই বুঝি দুঃখ বিরক্তির পরিবর্তে তীব্র হাস্যরেখা ফুটে ওঠে মা'র সেই কান্ত কোমল মুখচন্দ্রে···সেই মমতামথিত কণ্ঠ হয়ে ওঠে যেন অস্বাভাবিক, "তা হ'লে বে—শ হবে, বে—শ হবে, ঠাকুর যেমনটি ভালবাসেন তেমনি হবে, তিনি শ্মশা—ন ভালবাসেন সব শ্মশা—ন হয়ে যবে।" তারপরেই সুরু হল—হাঃ হাঃ হাঃ রবে ভয়াবহ অট্টহাসি, কম্পিত স্তম্ভিত ভক্ত—দুরু দুরু বক্ষে চেয়ে থাকে, বুঝি দেখেছিল প্রকটিত শ্মশানবাসিনীর প্রতিমূর্তি, বাণীহারা ছেলের পানে চেয়ে তখন ধীরে ধীরে শান্ত হয় অশান্তমেয়ের রুদ্ররূপ...জেগে ওঠে বরাভয়··· ক্ষমাসুন্দর—ক্ষান্ত মুখে।—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগ—। তখন দিকে দিকে চলেছে হত্যার দানবীয় লীলা···অজস্র লোকক্ষয়ের সংবাদে সংবাদপত্র গেছে ছেয়ে— ভক্ত নলিনবাবু তাই শোনাচ্ছেন মাকে—মনে হয় এই বুঝি ফুটে উঠবে দুটি নয়ন পল্লবে করুণার দুটি মুক্তাবিন্দু...শত শত সন্তানের বিচ্ছেদ ব্যথায় জেগে উঠবে মমতার দীর্ঘশ্বাস। সে ক্ষণিকের করুণার সিঞ্চনে হয়তো আবার ফিরে আসবে বিশ্বশান্তি। কিন্তু

কোথায় সে করুণাময়ী···তার পরিবর্তে একি রূপ? কালী কপালিনী ভীমার প্রতিচ্ছবি যেন দীপ্ত হয়ে ওঠে সেই হেম বরদঅঙ্গে। প্রথমে মৃদু স্বরে হো হো শব্দে...তারপর সে হাসি হয় রূপান্তরিত করালীর ব্রজকণ্ঠের করাল হাস্যে...সৌম্যাৎ সৌম্যতরা মহেশ্বরীর জেগে উঠেছে অসিপাশ ধারিণী রণচণ্ডিকার স্মৃতি—সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রলয়ছন্দে সুরু হয় উল্লসিত ধ্বনি। সেই অট্টনিনাদ গৃহের অণু পরমাণুতে হয়ে ওঠে প্রতিধ্বনিত। বিকম্পিত ভক্তকুল করজোড়ে জানায় স্তুতি, "হে জননী সম্বরণ কর তোমার এই ভীমাভৈরবী অবির্ভাব। আমরা চাই তোমার সেই প্রসাদময়ী দ্বিভুজারূপ···।" ভক্ত কন্যা আকুল কণ্ঠে গললগ্নীকৃতবাসে বলেন, "সম্বর সম্বর"—বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অর্জ্জুনের জেগে উঠেছিল যে আকুল প্রার্থনা, "প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস"···ধীরে ধীরে শান্ত সংহৃত হয় সেই মৃত্যুময়ীর রূপ। ভক্তের ভগবান যে অনন্ত কল্যাণগুণ সম্পন্ন। সন্তানের আকুতিতে জননীর ক্ষেমঙ্করী শুভদা সারদা রূপই প্রাণময়ী, ধ্যানময়ী, রূপ...সেখানে কালীও কাল মনোরমা রূপময়ী শ্যামা···। নীলমাণিকের মাণিকগলা সে অঙ্গদ্যুতি ···সেরূপে নয়ন দিতে নয়ন যেন ঠিকরে পড়ে—।

আষাঢ়ের এক মেঘ মেদুর রজনী—বিশ্বশিশু তন্দ্রায়িত, বেদনির্ণীত জননী রাত্রির স্নেহাঞ্চলে। রাঁচী সহরের একপ্রান্তে এক গৃহকোণে শায়িত এক মর্ম্মী ভক্ত—নাম তাঁর নিশিকান্ত, চোখে মুখে গভীর সুষুপ্তি এসেছে নেমে। ধরা অধরার মিলনপ্রান্ত এই সুষুপ্তির স্তরভূমী—ঘুমোছেলের চোখেই যে গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকে জননীর চুম্বন স্পন্দন। সহসা স্বপ্নলোক স্নিগ্ধ তরঙ্গায়িত জ্যোতিধারায় আলোয় আলো—দেখেন নিশিকান্ত জগজ্জননী ভবভয় হারিণী শ্যামা এসে দাঁড়িয়েছেন দলমল রূপে···আকুল স্নেহে তাঁকে টেনে নিয়েছেন বিশ্বের ভয়হরা

অভয় কোলে...কণ্ঠের বাণীতে ঝড়ে পড়ছে যুগযুগ মথিত সান্ত্বনার চুম্বন—বলছেন, "ভয় কি বাবা, আমি তো রয়েছি।" পলকের ব্যবধানে ঘটে গেল আর এক অপরূপ রূপান্তর। কোথায় সে নীলচন্দ্র-কান্ত জননী—তার পরিবর্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, শুভ্রা হিমাদ্রি কান্তি এক অপরূপা—শ্রীঅঙ্গে সিতশুভ্র ক্ষৌমবাস, সুঠাম বাহু যুগলে বিজড়িত কণক কঙ্কণ···শ্বেতপদ্ম নিবাসিনী সারদা। দেবী উচ্চারণ করলেন একটী প্রণবযুক্ত পবিত্রনাম। দিলেন নির্দ্দেশ ১০৮ বার করবে এই জপ। আর তার সঙ্গে যুগের আর্ত্তিহারিণী দিলেন গভীর আশ্বাস "তুমি শুধু এইটুকু করে যাও, বাকী যা করবার তা আমিই করব।" সুখস্বপ্ন যায় ভেঙ্গে। সদ্যোত্থিত শিশুর মত কেঁদে ওঠেন নিশিকান্ত—"মা! মা!"—তারপর সারটি রজনী যাপিত হয় সুখস্মৃতি আর নাম রস আস্বাদনে···

শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের আলোয় রাঁচী সহর তখন সবে অরুণায়িত। কথামৃত পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে দিকে দিকে উঠছে মধু গুঞ্জরণ —ভক্ত নিশিকান্ত এসে যোগ দিয়েছেন সেই মধু সম্মেলনে—সেই-খানেই মিলল পরম লগ্নের আশা...কৃপাধন্য ভক্তমুখে শোনেন জননীর পূণ্য নাম...শোনেন অখ্যাত সেই পল্লীবক্ষে করুণায় বিগলিতা জাহ্নবী, নিত্য ধৌত করে নিয়ে চলেছেন বিশ্বের যত মলিনতা। আবির্ভূতা

হয়েছেন···মমতার মূর্ত্ত প্রতিমা, সন্তানের সব ব্যথা জুড়িয়ে দিতে। "তবে কি তুমিই জননী দাঁড়িয়ে ছিলে আমার স্বপ্নের প্রাঙ্গনে,— দুহাতে অপসারিত ক'রে অজ্ঞান তিমির?" তবু সংশয়াকুল চিত্ত হয়ে ওঠে অধীর...অবশেষে সর্ব্ব দ্বন্দ্বের হয় অবসান···অকুলের টানে কুলের ডাক হয় মিথ্যা···। একদিন দেখা যায় ভক্ত নিশিকান্ত দিবসের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত জয়রামবাটীর মন্দির দ্বারে। দর্শনমাত্র বাহ্য জগৎ যায় হারিয়ে...জাগ্রত চোখের সামনে ছেয়ে দাঁড়ায় স্বপ্নলোক —সেই সিতশুভ্র শ্রীমুখকান্তি, সেই সিতবাসে সজ্জিতা আকুল কুন্তলা দেবী মূর্ত্তি, সেই বিম্বোষ্ঠে অভয় আর করুণার হাসি···নয়ন পল্লবে সেই চাহনি, যেন যুগের ব্যথাহারী স্নেহের শ্যামচ্ছায়া—বিহ্বল ভক্ত অচল চরণে স্তম্ভিত হয়ে শুধু চেয়েই থাকে···নির্ব্বাক নিস্পন্দ মনে জাগে···সেই মা-জগজ্জননী—বিশ্বপ্রসবিনী—বিশ্বেশ্বরী সেই জননী ···তারপর ধীরে, মায়ের আকুল হাতছানিতে, কখন যেন এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন মন্দির অভ্যন্তরে—আবেশজড়িত কর্ণে শুনছেন সেই কণ্ঠবীণা···"হ্যাঁ গা তুমি আমায় চিনলে কি করে?" আবেগ রুদ্ধকণ্ঠ অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, বুক নিঙরে আর্ত্তনাদের মত বলেন নিশিকান্ত, "মাগো! তোমায় চিনবার মত সাধ্য আমার কি আছে? তবে কৃপা করে যতটুকু চিনিয়েছ ঠিক ততটুকুই চিনেছি মা"···হেসে ওঠেন লীলাময়ী, সে হাসির বিদ্যুৎস্পর্শে সন্তানের সব জড়ত্ব যেন যায় দূরে। মা হারা ছেলে মাকে পেয়ে যেন সোহাগে হয়ে ওঠে উছল। চরণ দুটি আঁকড়ে ধরে লুটিয়ে পড়েন—যেন সব ব্যথা, সব জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই মিলেছে।···

তারপর দীক্ষা লগ্ন—সে লগ্ন ভক্তের স্মৃতির পটে হয়ে থাকে অমৃতের দেয়ালী। ছোট্ট ঠাকুর ঘর—ছোট্ট সিংহাসনে শ্রীমূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত—দণ্ডায়মানা জাগ্রত প্রতিমা জননী সারদেশ্বরী। প্রভাতের প্রথম আলোর প্রসাদের মত শ্রীমুখ উদ্ভাসিত, আর স্নানান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন ভক্ত মূর্ত্ত কৃপার লগ্নে নিজেকে নিবেদন করতে…হাতে শ্রদ্ধা আর ভক্তির অঞ্জলিস্বরূপ রাশিকৃত পদ্মফুল। "ঠাকুর প্রণাম কর।" জননীর আদেশ মোহাবিষ্টের মত পালন করেন নিশিকান্ত তারপর সম্মুখের চার পাঁচটি জলপূর্ণ ঘটের শান্তি বারিতে অভিষিক্ত করে জননী উচ্চারণ করেন স্বস্তিবাণী—সর্ব্বাঙ্গে বরদহস্তের স্পর্শে পবিত্র করে বলেন, "এখন মনে ভাব, তোমার জন্মজন্মান্তরীণ পাপ ভস্ম হয়ে গেল। তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা।" স্বয়ং দেবকুলকে যিনি দান করেছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-দায়িনীর কণ্ঠে বেদান্তের বাণী যেন সন্তানের যুগসঞ্চিত অন্ধকারে জ্বেলে দেয় পবিত্রতার দীপশিখা—দেহে জেগে ওঠে আনন্দের শিহরণ—সত্যই মনে হয়, "আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা…।" তারপর সব্বান্তর্যামিনী স্মরণ করিয়ে দেন স্বপ্নের স্মৃতি—"তোমার ত হয়েই গেছে—ঐ মন্ত্রই ১০৮ বার জপ করবে আর তোমায় কিছুই করতে হবে না, বাকী সব আমিই করব।" আবার সেই পুণরুক্তি পুলক বেপথু ভক্ত জানান মিনতি, "আমি তোমার শ্রীমুখে ঐ মন্ত্র আবার চাই শুনতে" দয়াময়ী সে আশাও করেন পূর্ণ। তারপর সেকি অমৃতময়ী বাণী—বুক জুড়ানো, তৃপ্তিতে আশ্বাসে ভরে ওঠে ভক্ত হৃদয়—। "ঠাকুরই সব, ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট। ঠাকুরই ইহকাল, ঠাকুরই পরকাল। তুমি ঠাকুরের—ঠাকুর তোমার। আমাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন ভাববে।" আনন্দে আত্মহারা ভক্ত নিয়ে আসে কমল অর্ঘ্য—সেই অজস্র পুষ্পসম্ভারে রচিত বেদীপীঠে স্থাপন করে কমলার কমলচরণ দুখানি—অঞ্জলিতে পূর্ণ করে করেন আত্ম নিবেদন। মা'র মুখে তখন স্বর্গের সুষমানিছানি একটু হাসি, আর

অতৃপ্ত কণ্ঠে চরণলুণ্ঠিত ভক্ত শোনেন—"বাবা কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরেছ, ঘুরতে ঘুরতে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছেছ, আর ভাবনা কি?" স্বপন সেঁচা রতন না হলে কি এমন করে স্বপন দেউল করে আলোয় আলো? কোথায় দূর বরিশাল—তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে এসে ডাকছেন জননী সন্তানকে, নাম প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত। "তুই এখনো বসে আছিস? তোর তো বয়েস হ'য়েছে—এখন শুভ লগ্ন রয়েছে। আমি কত কষ্ট ক'রে সাতসমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসেছি, আয় আমার সঙ্গে চলে আয়—।" অকুলের ইশারায় কুলের মায়া থাকে পিছে প'ড়ে। হারিয়ে পাওয়া মায়ের চুমায়, ছেলের চোখে জাগে জাগার বাণী—ছুটে আসেন ভক্ত প্রেমানন্দ—সেই স্বপ্নের দুয়ারে দেখাই প্রথম দেখা—পূর্ব্বে দেহ ঘটে, বিগ্রহ পটে, কোথাও ত' মেলেনি দর্শন তবু এত দয়া এত নাড়ীর টান—আর কি দূরে থাকা যায়! শারদীয়ার অবকাশে নীড়ে ফেরা পাখীর মত যখন আপন আপন গৃহের পানে চলে বিশ্বের যত ছেলে মেয়ে—ভক্ত প্রেমানন্দও সেই মিলন আসন্ন লগ্নে বিশ্বমায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে যেন পারলেন না। সে সাড়া যে আপনি ফুটে ওঠে অন্তরের আকুল প্রতিধ্বনির মত। দর্শনও মেলে আশাতীত মুহূর্ত্তে—সেই মূর্ত্তি—স্বপ্নের দেখা সেই মূর্ত্তি।...অপার বিস্ময়ের অঞ্জন চোখে মেখে দেখে ভক্ত সেই করুণায়ত চোখের মায়াভরা ঢলঢল শ্রীমুখ—সেই কান্ত করুণ কণ্ঠে "বাবা এসেছ, আমি আজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম—যাও এখুনি স্নান করে, এই ঘরে এস।"

মনে পড়ে যাত্রী মুখর বিষ্ণুপুর ষ্টেশন। কোলাহল পূর্ণ দিবসের চঞ্চল প্রহর গুণে সময় চলেছে কেটে—চলেছেন মা ভক্তসঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে। প্রতীক্ষা উন্মুখ ভক্তদের দল মাকে আছে ঘিরে। দেশান্তরের ডাক নিয়ে তখনো আসেনি গাড়ী। চতুর্দ্দিকে শুধু চঞ্চলতা আর ব্যস্ততা।—ঠিক এমনি সময়ে কোথা হতে এল এক দীন জননী—রুক্ষমলিনবেশা। পশ্চিমা কুলী, নয়নের আকুল ভক্তিপ্লাবনে বক্ষ পরিপ্লাবিত—প্রেম উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে আকুল কণ্ঠে অভিমান ঢেলে সে বলে, "তুমেরী জানকী, তুঝে মৈনে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?" "সে যে কত দিন গো মা, বুঝি বা এক যুগই গেছে কেটে—পাইনি তোর দেখা—কেমন করে ছিলি লুকিয়ে?"...ব্যথা আর অভিমান আজ হয়ে ওঠে বুঝি অশান্ত উচ্ছল—সে কি বাঁধ ভাঙ্গা কান্না, থামতে চায় না কোন মতে। স্নিগ্ধ কোমল হাতখানি দিয়ে জননী করেন শান্ত ছোট্ট মায়ের মত আদর ক'রে—কাছে টেনে কানে দেন তার ইষ্টমন্ত্র। আর গুরুদক্ষিণা—সে কিবা দেবে? কি আছে তার। দীন হতে সে যে দীনতর—তাই ছোট্ট একটি ফুলে আর চোখের জলের চন্দনেই হয় দক্ষিণান্ত। দক্ষিণামুখে নারায়ণী সেই পূজাই গ্রহণ করেন—দীনের পূজা কিনা। কোন্ স্বপ্ন লোকের ডাকে কোন্ গহিন ধ্যানের বুকে সে পেয়েছিল জননীর দিব্যপ্রকাশ কে জানে? কে তার খোঁজ রাখে? সেই থেকে হয়তো কতদিনের পর দিন তার কেটেছে আকুল প্রতীক্ষায় ভুবন ভরা অন্বেষণে? তাই

বা কে জানে ? তা' না হলে আসা যাওয়া ক্ষণিক পরিচয়ের 'মোহনা এই ষ্টেশনে, কত চেনা অচেনা মুখেরি ত মেলে দেখা—কিন্তু কই আর তো কেউ এল না এমনি করে ছুটে ? আর কৃপাধন্য দীনার্ত্ত ভক্তই বা কেমন করে খুঁজে বের করল এমনি একখানি মুখ যে শ্রীমুখ খানি বুঝি তার যুগ যুগের চেনা, চিরপরিচয়ের বাঁধনে বাঁধা সার্থক ঈশামসীর দেববাণী "দীনার্ত্তেরাই ধন্য—কারণ তারাই ভগবানকে পাবে।" হৃষিকেশে ধুন্নুরাজ গিরির আশ্রম থেকে ভ্রমণ নিরত জনৈক পরিব্রাজক ফিরছেন সন্ত তীর্থ দর্শনে। নীড়বিরাগীদের বাঁধা ছোটোখাটো নীড়গুলি হৃষিকেশী ভাষায় বলে 'ঝাড়ি'— তার বুকে কত দেশ বিদেশেদের সন্ত এসে যাকে ঠাঁই নিয়েছেন, আর কত প্রকারের তপস্যায় জপ ধ্যানে কাটছে তাঁদের দিনরাত—কত গভীর অগভীর জানা অজানা উদ্দেশ্য তাঁদের আছে, কেই বা জানে। সহসা ওকি ? কানে ভেসে আসে যেন কার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ?—কোন মাতৃকণ্ঠেরই আর্ত্তনাদ—মনে হয় আসছে যেন সেই সম্মুখস্থ কুটীরের বক্ষ ভেদ করে...ক্ষিপ্রবেগে দ্বার খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন পরিব্রাজক—দেখেন এক নেপালী সন্ন্যাসিনী জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। করুন কণ্ঠে চীৎকার করছেন, "এ মাঈ, এ মাঈ অভিতক নেহি ভেজি"—পরিব্রাজকের দর্শনে সন্ন্যাসিনী যেন পান তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু জানান স্বাগত—বলেন," এসেছ শীঘ্র এস—কাছে বস—যা বলি তা কর। আমার আর দেরী নাই।" একি অদ্ভুত রহস্য—সন্ন্যাসিনী যে পরিব্রাজকের চির অপরিচিতা তবু এর শেষ হবে দেখতে। কাছে এসে বসেন পরিব্রাজক। বলেই চলেন নেপালী সন্ন্যাসিনী "সন্দেহ কোরো না—মাকে জিজ্ঞাসা কোরো; তিনি একটি সন্তানকে আমার শেষ সময় পাঠাতে প্রতিশ্রুত আছেন।" 'মা' এযে চিরচেনার বাণী—সত্যিই তো পরিব্রাজক যে

অর্থ মা ?” “আমার কি টাকার অভাব ?” নিদ্রাজাল যায় ছিঁড়ে। দেবস্বপ্ন প্রকাশের আছে বাধা অথচ নীরব বিস্ময়ের মাঝে স্বপ্ন রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে হয়ে পড়ে আরও রহস্যাবৃত। তার কূল যেন মেলেনা বাধ্য হয়ে ছুটে যায় বন্ধুবরের কাছে। “বল ভাই, একি সত্যি ? সত্যিই কি মা এসেছিলেন আমার কাছে তোমার চিঠিখানি নিয়ে ?” নীরব মৌনমুখে বন্ধু লিখে রাখা চিঠিখানি মেলে ধরেন দুর্গেশচন্দ্রের চোখের সামনে। সে মুখে আর সেই শ্রদ্ধানত চোখে তখন ফুটে উঠেছে এক গভীর বিশ্বাস আর সান্ত্বনার দিব্য দ্যুতি।

১৩১২ সালের প্রখর নিদাঘ মধ্যাহ্নে বিক্রমপুর কাঁঠালতলী—এক প্রাচীন দেবমন্দির নাম তার বনদুর্গার বাড়ী, অতীতের নামাবলী সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছাদিত করে সে সেজেছে যেন এক অনাদি কালের চির পুরাতন দ্রষ্টা—কোন্ সুদূর যুগ হতে সে যে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে ?—ওই যে প্রাচীন বট অশ্বত্থের জটগুলি জড়িয়ে ধরেছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—সৃষ্টি করেছে এক নিবিড় ঘন অরণ্যের নির্জ্জনতা, তারাও বুঝি ওর কাছে শিশু। সেই নিবিড় বনদেবালয়ে কে যেন সেদিন কাঁদে—চাপা ব্যথাতুর ক্রন্দনে দেব প্রাঙ্গন ওঠে গুমরে—সে এক দীনার্ত্ত ভক্ত অভাবের রুদ্র অভিশাপে সে অসহায় গৃহ বিতাড়িত ;—সে কাঁদছে আকুল হয়ে “মা—মা—গো ! কোথায়

তোর দক্ষিণপাণি, দশভূজে জগৎকে বিলাচ্ছিস বরাভয়ের পরসাদ তবে আমি কেন রই মাগো উপবাসী—কোন অপরাধে? ধ্যানময় তন্দ্রা আসে নেমে—ঘন পত্রজালে সমাচ্ছন্ন বনাঙ্গনে যেন জাগে তপোবনের হোম গন্ধ—কে ঐ দেবী? মূর্ত্ত হয়ে ওঠে চণ্ডীর অষ্ট কুমারীর রূপের মাঝে দেবীর মাহেশ্বরী যোগিনী রূপ—"ত্রিশূল চান্দ্রাহিধরে নখে মহাবৃষভবাহিনী মাহেশ্বরী স্বরূপেন নারায়ণী নমস্তুতে" ধ্বনিত হয় ঋষিকণ্ঠের দেব্যাস্তুতি।—আলুলায়িত জটাভার উদ্যত ফনিণীর সর্পিল ছন্দে এসেছে নেমে—বামহস্তের ত্রিশূল ফলকে চন্দ্র-দ্যুতি—অঙ্গের গৈরিক বাসে যেন নেমে এসেছে বিদ্যুৎবন্যা—বনদুর্গার বাড়ীতে বনবাসিনী বনদুর্গারই বুঝি হ'ল প্রকাশ। মমতা বিগলিত কণ্ঠে আর বরদহস্তের সস্নেহ সঞ্চালনে ভক্ত পায় পরম আশ্বাস, "আর কাঁদিসনি, তোর চাকরির জোগাড় হচ্ছে।" সচকিত হয়ে ওঠে ভক্ত —ধ্যানাবেশ যায় টুটে, কোথায় বা কে? সামনে দৃষ্টি বাধিত করা ঘনবৃক্ষের মোহজাল···আর আছে শুধু সারা অঙ্গে অভয়ার অভয় হাতের অমৃত স্পর্শের সুধা শিহরণ...। সত্যই দারিদ্র্যের করাল গ্রাস হতে মুক্ত হ'ল ভক্ত। যোগনিদ্রায় ক্ষণিক দর্শন—পরিণত হ'ল বাস্তবে। জননী সারদার দর্শনমাত্র খুঁজে পেলেন ভক্ত ধ্যানলোকে বনদুর্গার ক্ষণিক দেখা শ্রীমুখখানি। কণ্ঠে পেলেন বনদুর্গারই কণ্ঠ ধ্বনি···চরণ দুটি আঁকড়ে ধ'রে অশ্রুজলের নৈবেদ্যে আপনাকে করলেন সমপর্ণ, আর পরিবর্ত্তে পেলেন অগাধ কৃপা—আর আশ্বাস বাণী, "সব সময় মনে রেখো ঠাকুর আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

ভুলো ছেলের অভিমান তবু যায় না—মায়ের দরদ পেয়ে বুক যেন আর ভরে না—কোন ছেলের জাগে হয়তো অভিমান, "তুই যদি মা ভববন্ধনহারিণী তারিণী, তবে কেন কাটিস্‌না আমার ভবের বাঁধন?

"আর একটি গান গা মা—আর একটি গান গা।" ভক্তমেয়ে সুললিত কণ্ঠে গানে গানে জানায় তার প্রাণের কথা। আর মা—পূজাঞ্জলি হাতের মুঠায় থাকে প'ড়ে—গোপনতার আড়াল—গেছে খসে—"আমি যে মাগো।" কাণ পেতে এখন শুনছেন মরমীর মনের কথা—আর্ত্তের ডাক। হৃদয় ঢালা একটী গানের টানেই পড়েন বাঁধা—চিরদিনের বাঁধন হারা…। চোখের জল আর বুকের ব্যথা,—সুরের সাধনের সঙ্গে যেন তাদের আছে এক অচিন্ত্য যোগাযোগ। কেন? তার কারণ বুঝি কেউই পায়না খুঁজে।—

তা না হলে সমাজের চক্ষে যারা হীন, আপন আদর্শকে পদলাঞ্ছিত করে যারা দাঁড়িয়েছে সমাজের বহুনিম্নস্তরে তাদের সুরেও যদি নেমে এসেছে ক্ষণিক ভক্তির নির্ঝরিণী অশ্রুজলের ধারায় করুণায় বিহ্বলা জননী—হয়ে উঠেছেন আকুল! সেদিন বাগবাজারে মাতৃমন্দির মুখরিত হয়ে উঠল গুমরে ওঠা সুরের মূর্চ্ছনায়—

"আমায় নিয়ে বেড়ায়
হাত ধরে"

এযে গিরীশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গলের সেই পাগলীর কণ্ঠ—কে গায়? সুরের মোহ সকলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় কাজ, টেনে নিয়ে আসে সেখানে, যেখানে চলেছে ভাব ও সুরের মিলন মেলা। চরণ দুটি মেলে বসে আছেন জননী—সবে মাত্র তখম পূজা হয়েছে সারা। নয়ন দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত একবার ক'রে ক'রে ত্রিনয়নী চাইছেন আরাধ্য দেবতার মুখচন্দ্রের পানে—সে আঁখি প্রেমাশ্রুতে উঠছে ভ'রে—আর গায়িকার কণ্ঠে তখন নেমেছে নবানুরাগের বন্যা—গেয়ে চলেছে :—

"মুখখানি সে যতনে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়

আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে,
কতই রাখে আদরে—।"

ফেনিয়ে ওঠে ভাবের সাগর। স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন জননী। দৃষ্টি হয়ে গেছে স্থির—জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তি যেন গানের বাঁশীতে হয়ে গেছেন আবিষ্ট···সদাশিবের নয়নে নয়ন রেখে স্থির হয়ে আছেন ব'সে, আর ভাবের ঘোরে মাঝে মাঝে উঠছেন দুলে, বলছেন "আহা! আহা!! সুরের খেলায় কাটে বহুক্ষণ! ধীরে ধীরে থেমে যায় গান কিন্তু তার মিলিয়ে যাওয়া আকুল রেশখানি যেন তখনও কেঁদে ফেরে মায়ের পায়ে। অনেকক্ষণ পরে নয়নপল্লবে ফিরে আসে নর্ম্মলীলার কাঁপন, মা মোছেন প্রেমাশ্রু গায়িকা পায় জীবনের পরম আনন্দ, মায়ের বুক জুড়ানো প্রসন্নতা, "আজ কি গানই শোনালি মা...।"

মনে পড়ে সেদিন নেমে এসেছে তিমির ঘেরা মায়াবিনী রাত্রি... ঘুমের কাঠী ছুঁইয়ে দিয়েছে যেন মহানগরীর কর্ম্মচঞ্চল অঙ্গে—চপল শিশু হঠাৎ যেন খেলতে খেলতে গেছে ঘুমিয়ে যাদুকরীর ঘুমের যাদুতে—হঠাৎ বাগবাজারের মাতৃদেউলের দ্বারে কে যেন—জড়িত বিশ্বস্ত কণ্ঠে ডাকে "দোস্ত্ দোস্ত্"। ঘুম ভেঙ্গে যায় সকলেরই সে ডাক মূর্ত্ত নিশাচরের ডাকের মতই বুঝি লাগে গৃহবাসীর কর্ণে। কেউ দেয় না সাড়া—বোঝেন মা'রসেবক শরৎমহারাজ—সে আর কেউ নয়, গিরীশচন্দ্রের নাটকের জনৈক অভিনেতা তাঁকেই ডাকছে। কিন্তু

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নয়, অত্যধিক মদ্যপানের ফলে বিকৃত মস্তিষ্ক—নাম তার পদ্মবিনোদ। কারো সাড়া না পেয়ে সে যায় চ'লে। পরের দিন ঠিক তেমনি সময় আবার এসে সে দাঁড়ায় দেউল দ্বারে। সেদিনও মেলে না কারো সাড়া। পাগল কি বোঝে কে জানে? বুঝি বোঝে আঁধার রাতে সাড়া দিতে আর কেউ থাকে না জেগে—থাকেন শুধু একজন...তাই বুঝি মত্ত হয়ে আহ্বান করে তাঁকেই...কণ্ঠ হ'তে জড়তা গেছে মুছে—

"ওঠো গো করুণাময়ী
খোল গো কুটীর দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে
অনিবার॥
সন্তানে রাখি বাহিরে আছ সুখে অন্তঃপুরে
ডাকিতেছি মা মা বলে নিদ্রা কি
ভাঙ্গেনা তোমার?"

খুলে যায় মাতৃউদেলের বাতায়ন দ্বার—আর পাগল আনন্দে উন্মত্ত হয়ে বলে, "উঠেছ মা? সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।" তারপর আর কি? সাষ্টাঙ্গ হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি—তারপর সেই রাঙা ধূলি খানিক মাথায় তুলে নিয়ে যায় চলে। দূর হতে ভেসে আসে!—

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন
কেউ নাহি দেখে
দোস্ত যেন নাহি দেখে।"

এমনি ঘটে প্রায় প্রতিদিন—সে আসে গান শোনায় দর্শন করে, আর চলে যায়,—কোন দিন বা গায়।—

শ্মশান ভালবাসিস ব'লে
শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে
নিরবধি।"

আর গানের টানে, নামের টানে, আর প্রাণের টানে তিনটি টানে আকুল হয়ে ছুটে আসেন জননী—দর্শন দেন বাতায়ন খুলে।

ভক্তদের বলেন, "জ্ঞান কি টনটনে"…"কিন্তু মা আপনার যে ঘুমের ব্যাঘাত করে"…বলেন জননী, "তা হ'কগে বাবা। ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে, তাই দেখা দিই।" কি অপূর্ব্ব দৃশ্য—কোথায় পাগল ছেলে ডাকছে কেঁদে পথের ধূলায় ধূলায় সারাদিন মাটী মেখে আর তার জন্যে মায়ের বুক উঠছে নিঙড়ে…গভীর রজনীতে ভুলো ছেলের মায়ের সাথে বোঝাপাড়া। এই দিব্যলীলাখানি স্মৃতির লোকে হয়ে থাকে যেন চিরস্মরণীয়—অনাদ্র ছেলের পরম পাথেয়।

হঠাৎ সেদিন আসে সংবাদ পদ্মবিনোদ অসুস্থ—উদরী রোগে আক্রান্ত! ছুটে আসেন ভক্তদল—সেবাভার তুলে নেন। একদিকে চলে আপ্রাণ চেষ্টা,…জীবন প্রাণপণে যুঝে চলে মরণের সাথে—কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল করে দেয় পদ্মবিনোদ—তার বহুদিনের অভ্যাস সংস্কার সে ছাড়তে পারে না কোন মতেই, ঘনিয়ে আসে জীবনের পরাজয়ের লগ্ন। মৃত্যুই হ'তে চলেছে জয়ী—। গভীর রাত্রি করছে থম্‌থম্‌। হঠাৎ বলে ওঠে পদ্মবিনোদ—"আর বাঁচব না, একটা আঙ্গুর চেয়েছিলুম দিলিনি। তা না দিয়েছিস্‌ বেশ করেছিস্‌—আর

চাইব না। 'এখন একটা কাজ কর দোস্ত্! ঠাকুরের কথা শোনা—আমার শেষ হয়ে এসেছে।"

সুরু হল কথামৃত পাঠ। খোলার সঙ্গে সঙ্গে উঠল তাঁর পবিত্র রামকৃষ্ণ নাম···শুনছে পদ্মবিনোদ তন্ময় হয়ে আর সমস্ত চিন্তা গেছে তার হারিয়ে; সেকি মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে? না—দাঁড়িয়েছে জীবন মরণের পারে আলোর দেশের মোহনায়? কে জানে কাকে সে দেখল একটিবার; মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল "রামকৃষ্ণ" —আর নয়ন হতে পড়ল ঝরে দুটি ফোঁটা অশ্রু তারপর সব শেষ··· যে গভীর রজনীতে সে চোখের জলে আর নামের টানে পেয়েছে পরম পাওয়া—শেষের দিনেও ঠিক সেই রজনীর গভীরে চোখের জলে আর নামে সে পেল আত্মার পরমাত্মীয়টিকে, আর তেমনি করে বুঝি লুটিয়ে দিল ধূলার দেহ ধূলার বুকে। বলেন জননী "ঠাকুরের ছেলে যে। কাদা মেখেছিল, তা হয়েছে কি? যাঁর ছেলে, তাঁরই কোলে গেছে।"

চির অচিন ভগবান—চির অচিন তাঁর ভক্ত—তাই চিরকালের রহস্য দিয়ে গড়া ভক্ত ভগবানের নিত্যলীলা—বৃন্দাবন।

এমনি কতবার হয়েছে···সেদিন কোথা হতে এল দিব্য এক উন্মাদিনী—শত ছিন্ন মলিনবাস, রূক্ষ জটিল কেশ—ধূলি ধূসরিত বেশ। কে চিনবে কেমন পাগল? অনুমতির অপেক্ষা সে করে না—স্বচ্ছন্দ পায়ে—চিরচেনার ভঙ্গীতে সে চলে মাতৃ সন্নিধানে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মায়ের দ্বারী, সারদানন্দ মহারাজ, "ওরে দেখ্ দেখ্ কে একটা পাগলী উপরে গেল।" দেখতে দেখতে সে তখন পৌঁছে গেছে যথাস্থানে আর মা পরম আদরে তাকে নিয়েছেন আহ্বান ক'রে, "এস মা এস!"—তার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নাই। হাতের মন্দিরাতে ছন্দ তুলে সে গাইছে, "দে দে আমায় সাজায়ে দে, তোরা সাজায়ে দে—আমি

যোগিনী হব, প্রাণ কানু লাগি যোগিনী হব।" মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে সে কি নিবেদনের আকুল ভঙ্গী, দেখলে চোখ ফেরেনা—বাহিরের রূপ ঐশ্বর্য্য বিধাতা তাঁকে দেন নাই, তাতে কি? ভিতরে যে তার অগাধ সম্পদ—অন্তরের সব রস নিঙয়ে সে আজ দিচ্ছে তার পাষাণ দেবতাকে—কখন হাত দুটি জোড় করে নতজানু হয়ে, কখন বা বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে কত ভাবে কত ভঙ্গীতে। তার ভাবো-উন্মত্ততায় উদ্দীপন হয় মহাভাবময়ী জননীর—স্তব্ধ হয়ে শোনেন সেই দিব্যকণ্ঠের সুর—উন্মাদিনী চলে যেতে চায়। করুণাময়ী পাগলী মেয়ের ছিন্নবাস দেখে দিতে চাইলেন নববস্ত্র, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রসাদ, কিন্তু পাগলী যে কিছুই চায়না নিতে। তার চাওয়া যে পরম চাওয়া। যেমন এসেছিল তেমনি করেই সকলকে বিস্মিত করে সে যায় চলে··· পরম স্নেহে বলে ওঠেন মা—"জোর বৈরাগ্য। ও নেবে না, খাবে না, শরীর ত্যাগ করবে।" মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের সাধন লীলাতেও এসে জুটেছিল এমনি এক গোপন মহাপুরুষ জ্ঞানোন্মাদের বেশে। সেদিন মূর্ত্ত ভৈরবের মত উন্মাদের ভীমকণ্ঠনাদে কেঁপে উঠেছিল ভবতারিণীর পাষাণ দেউল আর আজ প্রেমোন্মাদিনীর কণ্ঠ লাবণ্যে যেন গঙ্গাতরঙ্গ ব'য়ে গেল—শ্রীঠাকুরের এই ক্ষুদ্র দেবায়তনে।

ঠিক এমনি ঘটনাই ঘটল আরেক দিন। কালীঘাট হতে চলেছেন মা নকুলেশ্বরের পথে। কিছুদূর যেতে না যেতে চলার পথখানি আগলে দাঁড়াল এক অচেনা নামগোত্রহীনা ভৈরবী। অঙ্গে দীপ্ত গৈরিকবাস—হাতে মহা ভৈরবের প্রতীক ত্রিশূল—অপলকদৃষ্টিতে সারদা-গৌরীর মুখের পানে চেয়ে সে কি দেখল, কি বুঝল সেই জানে গেয়ে উঠল—

"কেমন ক'রে পরের ঘরে গেলি উমা বল গো তাই,
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই।"

শুদ্ধসত্ত্বময়ী জননীর কণ্ঠ যেন কত উদাস। "তবে উপায়, বড় যে কাঁদছে মা," শুধু এইটুকু—সব আপত্তি সব বাধা গেল মমতার বন্যায় ভেসে। করুণাময়ী দিলেন বিধান—"উপায় আছে বাবা, ওদের এখানে তিনরাত্রি বাস করতে বল। এখানে তিনরাত্রি বাস করলে দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে—এটা শিবের পুরী কিনা!" গিরিজায়া স্বয়ং যেখানে অধিষ্ঠাত্রী গৌরীশঙ্করও যে সেখানে নিত্য বিরাজমান—নিত্যতীর্থ সেইতো আমাদের স্বর্ণকৈলাস। ভক্ত করেছেন প্রশ্ন, "ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তুমি তবে কে মা?" সহজ প্রাণের প্রশ্নের আসে সহজ উত্তর—"আমি আর কে? ভগবতী।"

কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রম—আশ্রমের বহির্ভবনে মা আর ছেলেতে হচ্ছে কথা—ছেলের কথা আর ফুরায় না। সহসা পল্লীর নিস্তব্ধ অলস মধ্যাহ্ন হয়ে ওঠে মুখর; ঢাকের গুরু গম্ভীর নিনাদে। পল্লবছায় বটের নীচে জমে উঠেছে পূজার্থীদের ভিড়। বাঙ্গালীর তেত্রিশ কোটী দেবদেবী পূজার অতি প্রাচীন পূজা ষষ্ঠী পূজায় মেতেছে আজ পল্লীবাসী। কথায় পড়ে বাধা কোলাহল মুখর জনতাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন ভক্ত কেদার দাদা, "আঃ থাম্ নারে বাপু।" কণ্ঠস্বরে গভীর বিরক্তি। ভুল হয়ে গেছে, যাঁর সঙ্গে আজ কথায় মগ্ন তাঁরি পূজায় বিরক্তি—একি ভুল ছেলের। ভুলের জাল কাটেন মা নিজেই। "ওকি কেদার সবই যে আমি! তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন?" হে জননী! চণ্ডীমুখে সে কথা তুমিত বলেছে মা বারবার, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"। সর্ব্বস্বরূপে—সর্ব্বেশে…হে সর্ব্ব-স্বরূপিনী তোমায় প্রণাম। মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের বাণী—"যা কিছু সৃষ্টপদার্থ দেখছি সব এর ভেতর দিয়ে"—"ব্রহ্ম আর শক্তি যে অভেদ"—চির অভেদতত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাতত্ত্ব। বলেছেন স্বামী

প্রেমানন্দ ঠাকুরের মর্ম্মী, দরদী সন্তান—ব্যথার ব্যথী—"ঠাকুর, ও মাকে যে ভেদ ভাববে তার কিছু হবে না—কিছু হবে না।" ভক্তের মনে এসেছে ভেদভাব আগে মা তার পর ঠাকুর। সে মনে মনে মাকেই দিয়েছে প্রাধান্য—কিন্তু মাতৃসন্নিধানে আসতে কেন পদে পদে জাগে বাধা?—তার প্রতি জননীর মৃদু তিরস্কার শুনি, "আমি তো বলেছি যা কিছু সবই ঠাকুরের—ভুল কর বলেই তো বাধা পাও···ঠিক জানবে মনের সঙ্গে সবই ঠাকুর গ্রহণ করেন।" ঠাকুর তো করেন, কিন্তু—"কিন্তুর" মোহটুকু আর কাটে না। জননী দৃঢ় স্বরে ভেঙ্গে দেন বুঝি সব ভেদাভেদ—"আবার ভেদভাব কেন? দাহিকাকি ভাবতে পারে অগ্নি ছাড়া আপন অস্তিত্ব? ঠাকুরের মাঝেই মা—মায়ের মাঝেই ঠাকুর। বলেছেন কোন ভক্তকে, "যে ঠাকুর, সেই মা, জেনে জপধ্যান করবে।"

কিন্তু অবিশ্বাসের ঘন আঁধার আকাশের সুনীল ছবিকে নিত্য রেখেছে ঢেকে। কালো পাথরের মত অহংকারে গুঁড়ি রুদ্ধকরে রেখেছে দেউল দ্বারে যাতায়াতের পথ। তাই যুগের সারথী কম্বুকণ্ঠে শোনালেন মুক্তির বাণী, ব'লে দিলেন আজকের দীন জগতকে বাঁচতে হ'লে কোন পথ তাকে বেছে নিতে হবে—সে পথ বিশ্বাস আর ব্যাকুলতার পথ। বল্লেন, "চাই বিশ্বাস—বালকের মত বিশ্বাস। অবুঝ শিশুর মাকে চাওয়ার অবুঝ কান্না।"

মাতৃচরণে লুটিয়ে পড়েছে এক বালক ভক্ত। দুঃখী আর্ত্ত ছেলে—শৈশবের মুখেই সে চিরতৃষিত, স্নেহের অমৃত পাত্রটি তার গেছে হারিয়ে সে মাতৃহারা। আজ সে ঝাঁপ দিয়েছে অতল ছোঁওয়া এক সুধার সায়রে। আবেশে অঙ্গ আর মনের প্রতিটি কোণা কানায় কানায় উঠেছে ভ'রে। মনের অপূর্ব্ব অনুভূতির সঙ্গে অর্দ্ধশায়িতা জননীর স্থানে হয় তার অপরূপ দিব্য দর্শন—প্রথমে রাসরসমন্বিত দিব্য যুগলরূপের বিকাশ—

পরক্ষণেই আলোর সায়রে যেন মিলিয়ে যায় অলকার সে মোহন মাধুরী তার স্থানে ফুটে ওঠে নীলাদ্রিকান্তি শ্যামা... অরূপ সে চারূপ, আর হেমগলিত কান্তি গদাধর সুন্দরের ভাব বিলসিত তনুখানি। কালীরূপ দর্শনে ভয়ে আকুল হয়ে ওঠে আজন্ম বৈষ্ণব বংশসম্ভূত বালক। ছেলের ভয় ভাঙ্গাতে অভয় হস্তের মৃদুস্পর্শে অভয়া দেন অভী—তারপর সর্ব্বশেষে আবার অপরূপ অনুপমদর্শন—জননী প্রকাশিত হল বালকের ইষ্টদেবী শ্রীরাধিকারূপে। শিহরিত স্বর্ণচাঁপার মত সে অঙ্গ-লাবণ্য কৃষ্ণ প্রেমে গরগর ঢলঢল···অতৃপ্ত কর্ণে বালক শোনে, "তুমি বৈষ্ণববংশে জন্মেছ সেই সুকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে।" "রাধার দেখা কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকালে গো—সে যে সুদুর্লভ ধন।" মনে পড়ে পঞ্চবটের শ্যামরায়ের আকুল করা কণ্ঠ-মুরলী···বটের বীণায় আজো বুঝি সে সুর সাধা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মা'র শ্রীমুখে স্বরূপ প্রকাশ, "আমিই রাধা।"

তাই দেখি ভক্তগৃহে বসেছে কীর্ত্তনের আসর লজ্জাস্বরূপিনী জননী চিকের আড়ালে বসেছেন স্ত্রীভক্ত পরিবৃতা হয়ে, শ্রীয... মিত্র গাইছেন মাথুর—অর্থের বিনিময়ে লীলা কীর্ত্তন আর পরমার্থের ...গায় কীর্ত্তন-লীলা এ-দুয়ের মাঝে আছে যেন এক গভীর ব্যবধান। ভ...তীন্দ্র মিত্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর···। সুরু হ'ল কীর্ত্তন। কৃষ্ণ প্রেমোন্ম...ী বিরহিনী রাধার ভুবন গলানো সেই বিরহগাথা—বৈষ্ণবপদ কর্ত্তার ...য় নিঙরানো—গোপী শ্রেষ্ঠার সে বিলাপধ্বনি—গা...কের ভাবরসে সিঞ্চিত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে শ্রোতাদের মর্ম্মে মর্ম্মে···। আর বুঝি ঘা দেয় রুদ্ধ গোপন একটি স্মৃতির কুঞ্জদ্বারে···। অর্দ্ধবাহ্য দশায় উপবিষ্টা মা—হারিয়ে গেছে মন সেই রথ চক্রদলিত মথুরার পথে। আর তেমনি করে বুঝি লুটিয়ে পড়েছে মূর্চ্ছিত তনু ছিন্নলতার মত। ঘূর্ণিত ধূলিরাশির মাঝে

ধূসর হয়ে গেছে কনক অঙ্গ। যেতে হবে স্থানান্তরে। যতীন্দ্র মিত্র শেষ করেন বিরহের পালা। ভিতর থেকে আসে মাতৃআদেশ—গোলাপমার কণ্ঠে, "মা বলছেন মিলনে শেষ করতে।" যথারীতি মিলন গীতিতেই সমাপ্ত হ'ল হরিবাসরের মধুরসম্মিলনী। বিদায় মুখে ভক্ত কীর্ত্তনীয়া জানালেন প্রণাম মাতৃচরণে···কই ফুটে ওঠেনা তো আশীর্ব্বাণী কল্যাণীর কণ্ঠে···? বোঝেন নিত্য সঙ্গিনী গোলাপ মা···শ্রীরাধার সখীছাড়া রাধার ভাব আর বুঝবে কে?—ধীরে ধীরে আবেশ বিভোর তনুখানি ধরে নিয়ে আসেন গাড়ীতে করে; কোন রকমে শ্রীমন্দিরে এসে পৌঁছান—তারপর নিয়ে আসেন শ্রীঠাকুরের মন্দিরে। সেখানেও সেই পাষাণ প্রতিমা,—পলকহারা চোখে চেয়ে আছেন দেবদয়িতের প্রতিকৃতির পানে...কেটে চলে চলে ক্ষণ, নিত্য বৃন্দাবনে এখনও বুঝি নিত্য মিলনের পালা হয়নি শেষ। তাই ধরার ধূলায় মন নামেনা—কি হবে? বিমূঢ় ভক্তদল ভাবে উপায়-হীন হয়ে...সহসা মনে পড়ে ভক্তসন্তানের—আছে, উপায় আছে—"মা যতই কাজে থাকুক না কেন, ছেলের কান্নায়, ছেলের ডাকে, তখনই ছুটে আসে" এযে মায়েরই কথা। আর কি, এইতো পথ—"মা! মা! মা গো!" কাণের ভিতর দিয়ে পশে যেন মরম কোণে—যুগের প্রয়োজনে, যে ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছেন, দূর অলকার অলখমেয়ে—সে ডাক কি ভুলতে পারেন এত সহজে? নিথরিত অঙ্গে জাগে শিহরণ—নির্ব্বাক কণ্ঠে জাগে সুর···কোন অতীতের মহাসায়রে দিয়েছিলেন ডুব—যেন আবার এলেন ফিরে—অস্ফুটে বলেন "কেন বাবা?" ছেলের সহজ আর সবচেয়ে সত্য চাওয়া—"মা গো! খিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে ভোগ দিন।" বুঝি মনে পড়ে, এবার যে বিশ্বের ছেলের ক্ষুধা মেটাতেই আসা—মনে পড়ে, "আমি যে মা গো।"···যথারীতি ঠাকুরকে ভোগ দিলেন, খেতে দিলেন

ক্ষুধায় কাতর ভক্ত ছেলেদের···কে বলবে এতক্ষণ ডুব দিয়েছিলেন কোন অতলে, একটি মা ডাকই তাঁকে আনলো ফিরিয়ে। বলেন, স্বামী সারদানন্দ, উৎসাহে আর আনন্দে, স্বভাব সিদ্ধ স্বল্পভাষায়—"ঠিক করেছিস্—আমাদের জানা ছিল না।"

এমনি করে ভুলের আড়াল নিজের হাতে সরিয়ে দিয়ে জননী দেখান পথ, ছেলে যে অন্ধ—সে তো জানেনা কোথায় তার জীবন মরণের দিশা—।

দীক্ষা লগ্নে ভক্তের মনে জেগেছে আলো ছায়ার দোলা সন্দেহে আর পুলকে কোন্ দেবতা এসে বসবে তাঁর জীবনদেউলে ইষ্টরূপে? জ্ঞানময়ী দেবেন কি নির্দেশ? সহসা অঙ্গে লাগে তড়িৎ শিহর, জননীর স্পর্শে—"এই ছাখ,"—দেববাণীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের আঁধার ঘরে যেন জ্বলে ওঠে হাজারশিখার দীপ—চোখের সামনে অরুণ বিভায় বিকশিত হয়ে ওঠে ইষ্ট দেবতার জ্যোতির্ঘনরূপ। "এইতো তোমার ইষ্ট কেমন? এঁকেই তো বরাবর ধ্যান করে এসেছ।" ভাবের নেশায় বিভোর তখন ভক্ত—উত্তর দেবে কে? স্থানুর মত হয়ে গেছেন ···প্রহর গেছে কেটে...হুঁস নাই, সারা বেলা কেটেছে আচ্ছন্নের ঘোরে ···অপরাহ্নে মঠের প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুরের দরদী বাবুরাম, স্বামী প্রেমানন্দ—তাঁর প্রেমের চোখে পড়ল ধরা—"তারকদা! তারকদা! দেখেছ, কি করে ছেলেটাকে খেয়ে দিয়েছে মা?" তারপর মাতৃপ্রেমে আকুল কণ্ঠে যুক্ত করে জানান নতি—সেই পরমাবিদ্যা মহাপ্রকৃতিকে মা-মা-মা শুধু কি চোখের দেখাই? স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বসে আছেন উদ্বোধনের নীচে তলায়। তখনও জননীর দর্শন ধন্য হয়নি দুই নয়ন; আহ্বানের প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে আছেন ব'সে। সহসা ফুটে উঠল হৃদয় কমল, হৃদয়ের শ্বেতশতদল না ফুটলে মা সারদার কমল চরণ

জাগবে কোথায় ? আঁখি তো শুধু প্রহরী মাত্র তাই চোখের সামনে এসে দাঁড়াবার আগে জাগল মায়ের কমল আসন।

মায়ের কত কৃপা…মায়ের যত দেওয়া ছেলের তত চাওয়া—কেন পাবেনা তার আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমস্ত ধন, সব ঐশ্বর্য্য, তারা যে রাজরাজেশ্বরীর ছেলে তারা যে মা'র ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। অবুঝ ছেলে পাবার অধিকার না বুঝেই করে আব্দার, করে অভিমান। তাদের জন্যে জননীর সান্ত্বনার বাণী, অভয় বাণীর ছিল না বুঝি অন্ত ; অশান্ত ছেলেকে ক্ষান্ত করা সে বাণী যেন সারা যুগের বুকে… শান্তির ছায়া মেলা পঞ্চবটী—সমস্ত দুঃখ আর অশান্তিকে আড়াল করে।

তাই দেখি মানসিক অশান্তির তাড়নায় যে আত্মহত্যার সঙ্কল্পে হয়ে উঠেছে দৃঢ় সঙ্কল্প সেও মাতৃ চরণে আশ্রয় পেয়ে অশান্তির আঁধারে দেখেছে শান্তির…কল্যাণের দীপশিখা, লোক কল্যাণের ব্রতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে…।

অনুতপ্ত ছেলে কাঁদে, "মা গো! কিছু তো করতে পারিনা।" প্রকৃতি বুঝে বলেন জননী, "ঠাকুর যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন ভাবনা কি ?" বলেছেন, "ছাখ, মুনিঋষিরা জন্ম জন্ম তপস্যা ক'রে যা পায় নাই তোমরা এবার অনায়াসে তা পাবে।" এযুগ যে কৃপার যুগ। তাই বল্লেন—"আমাদের যা কিছু তোমরাই তার মালিক।"

অশান্তির জ্বালা নিয়ে এসেছে ছেলে, কাতর হয়ে জানাচ্ছে ব্যথা "মা! এত সাধুসঙ্গ করছি, আপনার কাছে আসছি কিন্তু কিছুই উপলব্ধি করতে পারছিনা কেন ?" বিষাদম্লান বুকের জন্য শান্তির পাত্র যেন ভরাই আছে। বলেন মা, "মনে কর তুমি খাটের উপর আমার এই ঘরে ঘুমিয়ে আছ ; তোমাকে যদি ঘুমন্ত অবস্থায়

খাটশুদ্ধ রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া যায়, তোমার ঘুম ভাঙ্গতেই কি মনে হবে? মনে হবে যেখানে ছিলুম সেখানেই আছি। তারপর যখন ঘুম ভেঙে যাবে তখন দেখবে কোথায় ছিলুম আর কোথায় এসেছি।" বুঝি বলেন জননী; পাবার যা তা'তো পেয়েছিস্ শুধু পেয়েছিস্ আঁধার রাতের ঘুমের মাঝে। সে ঘুম ভাঙলে বুঝবি আপনি, লাগবে প্রভাত আলোর পরশ সেই আলোয় দেখবি কি অমূল্য ধন তোরা পেয়েছিস্। এখন তোরা আধো ঘুমে থাক মায়ের কোলে শুয়ে—তাই বুঝি বলছেন "আমার যা করে দেবার একসময়ে করে দিয়েছি; যদি সত্ত শান্তি চাও তবে সাধন ভজন কর, তা না হলে দেহান্তে হবে।" এই একটি আশ্বাস বারবার দিয়েছেন, "এখন কামনা বাসনা থাকলেও—শেষে তা থাকবে না···শেষে ঠাকুরকে আসতেই হবে।"

ধূলাকাদা অঙ্গে মেখে, মলিন মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কত তাপিত পতিত সন্তান। নিঃশেষে যারা খুইয়েছে তাদের অন্তরের সমস্ত সম্পদ—সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের মত অনুতাপের শূন্য ভিক্ষাপাত্রখানি হাতে নিয়ে তা'রা এসে দাঁড়িয়েছে নত শিরে—শুধু কৃপা—শুধু করুণার দুটি ফোঁটা অমৃত সিঞ্চন—তাতেই ভ'রে যাবে এই সর্ব্বগ্রাসী রিক্ততা—তারাও যায়নি ফিরে—হতাশা বুকে নিয়ে পেয়েছে অমূল্য সম্পদ··· পেয়েছে আশ্বাস। "আমার ছেলেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও কিছু করতে পারবে না।" পতিত মেয়েকে টেনে নিয়েছেন আপন বক্ষে "এস মা ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ, এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও—ভয় কি?" এরজন্যে কত অশান্তি সয়েছেন, দেখেছেন সমাজের রক্ত চোখ। কিন্তু করুণায়, ক্ষমায়, অটল-অচল সুমেরুর মত, ভ্রূক্ষেপের মধ্যে আনেন নাই সে বাধা, সে বিপত্তির কথা।—এই কারণে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের

আসার পথেও জাগে বাধা—ভক্তদের কাছ হতে আসে তাই আপত্তি—কিন্তু জননীর দৃঢ় কঠোর স্বরে, রূঢ় অবহেলা, "আমার কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছে তা'রা আসবে। একজন এলে আর একজন যদি না আসে, আমি তার কি করব ?"

আবার দেখি দীন ভক্ত দূর থেকে জানিয়েছেন প্রণাম। বিষয়ের কালো কলুষ যে জড়ানো তা'র অঙ্গে, তা'র মনে। কি জানি যদি তা'র হাওয়ায় মা'র দেব অঙ্গের হয় কোন ক্ষতি ? কি প্রয়োজন ? তার চেয়ে দূর থেকে নাও জননী দীনার্ত্তের আর্ত্তনতি। নাড়ীর টানে বেজে ওঠে দরদ—ছেলের চোখের অশ্রু যে মায়ের বুকে জমিয়ে তোলে ব্যথার পাষাণ, আবার ছেলেকে বুকে ধ'রে পাষাণ গ'লে নামে অশ্রুর অলকানন্দা।—ধীরে ধীরে আপনি এগিয়ে এসে কমল হাতখানি রাখেন মা ছেলের মাথে, আশীর্ব্বাদের পরম আকুতিতে।

অথচ দেবদেহ দিনে দিনে যেন হয়ে ওঠে অক্ষম। যেন কোন মতেই পারে না সইতে শতশত মনের কলুষ স্পর্শ। এক একবার অসহ যন্ত্রণায় শ্রীমুখের কথার ফুটে ওঠে তার আভাস। "দয়ায় মন্ত্র দিই—ছাড়ে না, কাঁদে—দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কি লাভ ? মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি শরীরটা তো যাবেই তবু এদের হোক।" মা ডাকে ভুলে গেছেন, হয়ে গেছেন আপনহারা। নিজমুখে বলেছেন—"এমন সব লোক আসে, যা'রা না করেছে এমন কাজটি নাই। আমাকে এসে মা বলে ডাকে, আমি ভুলে যাই—যে যার যোগ্য নয়, তারচেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতায় কামড়ায়।" সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠেছেন, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন, বলেছেন, "তা হোক তোমরা শরৎকে একথা বোল না,

শরৎকে একথা বোল না।” কত ভয় কত ব্যাকুলতা···পাছে সেবক প্রধান স্বামীপাদের নিষেধে পাপীতাপী ছেলেদের উদ্ধারের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। সে কি ব্যাকুলতা—প্রবল জ্বরে সমাচ্ছন্ন, শ্রীচরণে তীব্র ব্যথা—তারি মাঝে গভীর খেদে বলছেন, “আজ আর কেউ এলো না। ঠাকুর বলেছিলেন কত কাজ করতে হবে—বাকী আছে। একটি দিন বৃথাই গেল।” একটি প্রহরও বুঝি কাটে না—রাতের আঁধারেই এসে দাঁড়ায় তিনটি কৃপাভিক্ষুক—জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করতে।

এত কষ্ট তবে কেন এত ব্যাকুলতা, ছেলের কালি মুছিয়ে দিতে সাধের কালি বরণ করে নেওয়া আপন অঙ্গে? শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত ছেলেদের দিক হ'তে আসে প্রবল আপত্তি। জগৎপাবনী তখনও করুণায় অটল, বলেন—“ভাল ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটিকে কে নেয়?” আরো বল্লেন, “আমরা পাপতাপ না নিলে আর নেবে কে? আমরাই পাপতাপ হজম করতে পারি। আমরা তো সেইজন্যেই এসেছি—আমার ছেলে যদি ধূলোকাদা মাখে আমাকেই তো ধূলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।” যখন ভক্ত জানিয়েছেন দৃঢ় প্রতিবাদ “আর কাউকে দীক্ষা নিতে দেবো না। যত লোকের পাপের ভোগ নিয়ে আপনার কষ্টভোগ।” মৃদুমধুর হেসে পতিতোদ্ধারিণী দিয়েছেন উত্তর, “কেন গো, ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন?” সারা যুগের বিষ কণ্ঠে তুলে নিয়ে নীলকণ্ঠের লীলা-সঙ্গিনীই বলতে পারেন এ কথা।—

মনে পড়ে শুদ্ধতার প্রতিমূর্ত্তি স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীমুখোক্তি “যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, সব মা'র কাছে চালান দিচ্ছি—মা সকলকেই কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা”··· করুণায় আত্মহারা জননী। “কৃপা” এই দুটি আঁখরে যে লুকিয়ে আছে

এক অসীম পারাবার—যুগের সঞ্জীবনী সুধার পারাবার। তাঁর উজ্জ্বল জ্বলন্ত প্রমাণ বুঝি দিল শ্রীরামকৃষ্ণ—সারদার করুণা ঘন আবির্ভাব—কৃপামথিত শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ……

শুধু ধরার ধূলায় নেমে এসেই তো সারা হয় না কাজ—যেচে, দ্বারে দ্বারে সেধে, বিলাতে হয় করুণা…তাই যুগে যুগে দেখেছে জগৎ—শ্রীভগবানের তীর্থঙ্কর বেশ। ছুটে গেছেন গৌরচন্দ্র ভারতের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে—ছুটে গেছেন নিত্যানন্দজাহ্নবী—মৃতপ্রায় ভারতের তীর্থ যেন সোণার কাঠির ছোঁওয়ায়, জেগে উঠেছে নব জীবনের জয়গানে—আবার তীর্থের রাঙা ধূলে এসে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর। ভারত তীর্থ ত' নয়, এ যেন নিত্য স্মৃতির তীর্থ। কত লীলা, কত খেলা—মনে পড়ে গেছে সবই। হেসে-কেঁদে একাকার করেছেন। সে চোখের জলে আবার পল্লবিত, মুকুলিত হয়ে উঠেছে তীর্থের প্রাণতরু…তবু ভাববেপথু দেবঅঙ্গ…চিরদিনের মায়ের দুলাল…টলোমলো আধো চরণ, চলতে গিয়ে যেন চলে না—তাই পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থগুলি ছাড়া আর বিশেষ কোথাও হয়নি যাওয়া। তাই বুঝি দক্ষিণাঞ্চলের তীর্থপথে এসে দাঁড়ালেন জননী সারদা—ফেলে যাওয়া সব কাজই ত' করতে হয়েছে সম্পূর্ণ—অর্দ্ধনারীশ্বরের তিনি যে অর্দ্ধাঙ্গিনী। কিছুদিন পূর্ব্বে সারা হয়েছে

বিষ্ণুপুর দর্শন—বলেছিলেন ঠাকুর, "ওগো বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন। তুমি একদিন যাবে, গিয়ে দেখবে।" "আমি মেয়েমানুষ কি করে দেখব?" সরলা পল্লীবালার মৃদুসঙ্কোচ ভরা বাণী—ঠাকুর বল্লেন, "না গো দেখবে দেখবে।" যুগ গেল কেটে, ঠাকুরের ইচ্ছা হ'ল পূর্ণ।

১৩১৭ সালের শীতাতুর অগ্রহায়ণে যাত্রা হ'ল সুরু—। প্রথমে ভক্তছেলে বলরাম বসুর জমিদারী উড়িষ্যার কোঠারে কিছুদিন রইলেন মা—সেখানে মাঘী পঞ্চমীতে দেবী পূজার হ'ল আয়োজন, জননীর শুভ অবস্থিতিতে। একটি দিনের পূজা—তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত হয় অনুষ্ঠিত। ধনী ভক্তের পূজা, তার উপর জননীর পুণ্য আগমন। চিন্ময়ী আর মৃণ্ময়ীর হ'ল যেন এক ঘটে আবাহন। আনন্দের দিব্য প্রবাহ যেন প্রবাহিত হয়ে গেল কয়েকটি দিনের বক্ষ প্লাবিত করে। যাত্রা, গান, নৃত্য, বাদ্যে—কোঠার ভবন পরিণত হ'ল আনন্দধামে। এই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ল আর একটি শুভ অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানে চিহ্নিত হয়ে রইল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহুমুখী কল্যাণ কর্ম্মের মধ্যে একটি বিশেষ কর্ম্ম ধারা—পদদলিত জাতিকে তুলে ধরার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা। কোঠারের পোষ্টমাষ্টার নাম দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সুউচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও সংস্কারের অপ্রতিহত গতিতে তাঁর ঘটল মতিভ্রম। পিতৃপিতামহের পবিত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তিনি গ্রহণ করলেন বিজাতীয় খৃষ্টধর্ম্ম। দেশের ছেলে দেশে থেকেও হয়ে রইলেন যেন চির পরবাসী—চির বিদেশী। সে আজ অনেক দিনের কথা। কই এতদিন তো কেউ তুলে নিতে চায়নি তাঁকে, বাসতে চায়নি তাঁর লুপ্ত গৌরবের সিংহাসনে। সকলে তো ঠেলেই রেখেছিল অস্পৃশ্যতার আবর্জ্জনার স্তূপে। একটি বারও ফিরে চায়নি সমাজ—শুধু ঘৃণাই করেছে চিরকাল…তাঁরো জাগেনি ক্ষুধা, জাগেনি ধূলিসাৎ জাতিগৌরব ফিরে

পাবার আকাঙ্ক্ষা—তবে কেন আজ সহসা বুক, ওঠে নিঙ্ড়ে এ কার পুণ্য দরশনের ফল? দেহ মনে যেন পরিস্ফুট মনে হয় ভ্রষ্টাচারের কশাঘাত। সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে চিহ্ন—সে চিহ্ন কি মুছবার নয়? ভাবেন আর কি পাব না মঞ্জুমেখলার বন্ধনে গ্রথিত ব্রাহ্মণের রত্নহার? বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা—ব্যাকুলতার তপ্তঅশ্রু হ'য়ে ঝরে পড়ে অঝোর ধারে। আর বুঝি ভাবনা নাই। অশ্রুর অবিশ্রান্ত বর্ষণই ত' ধুয়ে দেয় সঞ্চিত ধূলিমালিন্য। ব্যাকুলতার পথই তো পথ। ভক্তমুখে শোনেন মা সব কথা—সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন বেদবিদ্যাদায়িনীর পুণ্যাদেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করলেন দেবেন্দ্রনাথ, আর গ্রহণ করলেন বহুদিনের বঞ্চিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম···শুভ্র যজ্ঞোপবীতের বন্ধনে গায়ত্রী মন্ত্রে ফিরে পেলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—নব কলেবরে পেলেন মা'র ব্যবহৃত একখানি দিব্য বস্ত্র আর তার সঙ্গে লাভ করলেন জীবনের পরম পাথেয় মূর্ত্ত ভারতীর শ্রীমুখোচ্চারিত পুণ্যমন্ত্র দীক্ষা। ব্রহ্মবিজ্ঞানদায়িনীর কৃপাশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ফিরে পেলে ব্রাহ্মণত্বের আর কিবা থাকে বাকী? সে সম্মান দেখালেন জননী নিজে —শুভ্রবাসে আর যজ্ঞোপবীতে সজ্জিত হয়ে মুণ্ডিত নত মস্তক ব্রাহ্মণ যখন এসে দাঁড়ালেন জননীর চরণান্তিকে—ব্রাহ্মণ্যদেব জ্ঞানে জননী জানালেন তখন প্রতিনমস্কার।

দক্ষিণাঞ্চলের পরমতীর্থ রামেশ্বর—"চল মা আমরা রামেশ্বর দর্শন করে আসি" প্রার্থনা জানায় ভক্ত ছেলে। রামেশ্বর? আহা! সে যে প্রাণের তীর্থ জননীর শ্রীমুখে বালিকার আনন্দ উৎসাহ। সেইখানেই ত' গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম—এনেছিলেন রামশীলা। আজও যে নিত্য-পূজার সিংহাসনে বিরাজমান। মনে পড়ে সবই, বলেন জননী—"ঠিক বলেছ, বাবা—আমার শ্বশুরও গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই রামশীলা

এনেছিলেন—এখনো কামারপুকুরে নিত্য পূজা হয়—দেখেছ তো? আমি যাব।"

তাই হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল সাড়া...আয়োজন ব্যস্ততায়, আনন্দে কোলাহলে ভক্তদল বিভোর। মায়ের সঙ্গসুখ আর পুণ্য দেবভূমি দর্শনাভিলাষ...অনেকেই নেয় সঙ্গ—এমন সুলগ্ন আর কি আসবে ফিরে? তারপর একদিন সত্যসত্যই দেখা যায় খুরদারোড পার হয়ে শান্ত নীল চিল্কা হ্রদের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে যাত্রী পূর্ণ মাদ্রাজ মেল—আর বাতায়ণ পথে দৃষ্টিমেলে দিয়েছেন আনন্দিনী মা, শ্যাম-দুলালী। চোখে মুখে উপ্‌ছে পড়ছে প্রভাতী আলোর আনন্দদ্যুতি—দেখছেন বিদায়ী শীতের শীর্ণশুষ্ক মুখে এঁকে দিচ্ছে প্রকৃতি, প্রথম বসন্তের সোহাগ চুম্বন। দেখছেন একদিকে দূর গিরিশৃঙ্গের শ্যামাভ কোল ঘেঁসে উড়ে চলেছে উধাও বলাকার মুক্তা পাঁতি, ঐ নীল আকাশের দিকে মুখ রেখে—হিল্লোলিত ডানায় শিহরিত সমীর—আর একদল ডানা দুলিয়ে বেড়াচ্ছে কাজল হ্রদের তীর ছুঁয়ে। মানসে ভেসে ওঠে জননীর আনন্দ উচ্ছল মূর্ত্তি—"ঐ দেখ গো—ঐ দেখ" বল্‌তে বল্‌তে হয়তো ডেকে দেখাচ্ছেন নিকটস্থ সন্তানকে রম্য প্রকৃতির আপন মনে খেলে যাওয়া রূপের খেলা—নিজের সৃষ্টি দেখে নিজেই বিভোর। ঝিকিমিকি ভোরের আলো ডানায় মেখে নীলের ঝলক দিয়ে যায় নীলকণ্ঠের দল—মোহনীয়া সে ছবি; উল্লসিত বালিকার মত আনন্দমা কণ্ঠে আনন্দধ্বনি তুলে করজোড়ে জানালেন প্রণাম—মহাদেবের প্রতীককে। ধীরে ধীরে গাড়ী এসে বিশ্রাম নিল গঞ্জাম জেলার বহরমপুর ষ্টেশনে। সেদিনকার মত সেখানেই নেমে এল বিশ্রান্তির ক্ষণ। কেল্‌নার কোম্পানীর ম্যানেজার, তাঁরি আতিথ্য গ্রহণ করলেন জননী ভক্তসঙ্গে—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত। দলে

দলে আসে স্থানীয় অধিবাসী ফলের ভেট নিয়ে—দর্শনং তৃপ্ত হয়ে যায় ফিরে।

তারপর আবার চলাপথে দেখি জননীকে; আবার ছুটে চলেছে মাদ্রাজ মেল—তার বাতায়ণ পথে মুখখানি রেখে মা আনন্দে আত্মহারা…বালিকার মত সুখ চঞ্চল। নয়ন ভ'রে পান করছেন প্রকৃতির সুখ সুষমা, দেখছেন অরুণ ছোঁওয়ায় জেগে উঠেছে ওয়ালটেয়ারের ধূম্রসুনীল পাহাড়পুরী। কুয়াসার জাল ছিঁড়ে হেসে উঠেছে তার বুকে ঘুমন্ত সহরখানি—মায়ের কোলে শিশুর মত। কলকণ্ঠে বলেন জননী, —"ছাখো, ছাখো, যেন ছবির মতন বাড়ীগুলো পাহাড়ের গায়।" সারা দিনরাতে অবিশ্রান্ত গতি নিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়ায় দাক্ষিণাত্যের সিংহদ্বার মাদ্রাজে;—ছুটে আসেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ…"ওরে মা এসেছেন"—মাদ্রাজবাসীর গুরুমহারাজ, কিন্তু মায়ের কাছে ছেলে। সেই দখিণাপুরের একটুখানি বালক শশী—আনন্দে আকুল, চরণ দুটিতে মাথা রেখে লুটিয়ে পড়েন। কতদিন পরে মায়ে ছেলেতে দেখা—তা কি বলা যায়? আদরের আপ্যায়নের যেন ত্রুটী না হয় এতটুকু—আজন্ম সেবকের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ নজর।—নিয়ে এসেছেন মোটর। অবগুণ্ঠিতা পল্লীজননীর জীবনে এই প্রথম মোটর যানে আরোহণ। যন্ত্রমুখর বিজ্ঞানের যুগে একথা শুনতে সত্যিই লাগে নাকি বিস্ময়? গাড়ী এসে লাগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ভবনে।

দাক্ষিণাত্য যেন ভারতের দক্ষিণবাহু—কর্ম্মে, উৎসাহে, ভক্তিতে, জ্ঞানে, সুউন্নত—সুপ্রসারিত, সুপুষ্ট। এই দক্ষিণের উৎসাহী তরুণ দলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামিজীর করুণাকজ্জলিত বিশাল আঁখি ফিরেছিল পাশ্চাত্যের অভিমুখে, যার ফলে সমস্ত জগৎ শুনলো বেদান্তের অভয়বাণী—প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মাঝে গড়ে উঠল ঐক্যের

মিলন সেতু—বিশ্বের দুটি প্রান্তকে এক ক'রে, প্রতিষ্ঠিত হ'ল রামকৃষ্ণ জগৎ—সাম্যের সামবাণীই যার প্রাণের মন্ত্র।—জননীর আগমনে দর্শন পিয়াসী শত শত ছেলে মেয়ে এসে ভীড় করে দাঁড়ায় মঠের প্রাঙ্গনে —ভক্তি অর্ঘ্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে মা'র চরণ দুটি—কেউ বা শোনায় দুর্ব্বোধ্য ওদেশের ভাষার ভজনাবলি—বিদেশীয় সুরের যন্ত্রসঙ্গীত—। ছেলের ভাষা বোঝেন শুধু মা। তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন সন্তানের কৃতিত্বে। বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে কি থাকে দেশী বিদেশী ছেলের পার্থক্য ?…সারা বিশ্ব সে দৃষ্টিতে এক হয়ে নিত্য আছে ধরা। তা না হলে বাংলা দেশের কোন্ নাম না জানা পল্লীর মেয়ে কেমন কোরে বোঝেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভাষীদের আকুতি—তাদের কথা ?— আর বিস্ময়ের কথা, যে তারাও নাকি বুঝে নিয়েছে জননীর দেবভাষা। অন্তরের টানে ভাষা হয়ে গেছে সেখানে ভাবের প্রতীক, হয়ে গেছে সার্ব্বজনীন। মাঝে মাঝে দোভাষীর প্রয়োজন হলেও বহু সময়েই মা-ছেলের কথায় দোভাষীর প্রয়োজন হ'ত না—অন্তরের যোগাযোগে চ'লত তখন সব কথা। দাক্ষিণাত্যে পাশ্চাত্যের সন্তান এসে নিয়ে গেছে অভয়মন্ত্র। দীক্ষালগ্নে নির্জ্জন দেউলে কেবল জননী, আর সন্তান —কত প্রশ্ন, কত মীমাংসা—সবই চলছে আপন আপন ভাষায়। কিন্তু সহজ সাবলীল ছন্দের মত সুবোধ্য হয়ে উঠেছে দুজনেরই কথা।

সেখানকার দর্শনীয়—প্রাচীন দূর্গ, মৎস্যাগার, শিবালয়, পার্থসারথির মন্দির দর্শনান্তে—আবার সুরু হল যাত্রা—রামেশ্বরের পথে।

সারারাত্রির ক্লান্তি নিয়ে শ্লথ গতিতে গাড়ী এসে দাঁড়ালো বাই গাই নদীর তীরে ভারতের প্রাচীন সহর মাদুরায়। সেখানে ভক্ত-সঙ্গে মা ধন্য করলেন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান জনৈক মান্দ্রাজী ভক্তকে তাঁর বাসভবনে। তারপর অপরাহ্নে তীর্থের প্রসিদ্ধ স্থান-

গুলি দর্শনের পালা—ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গৌরব পতাকা বহন করছে যেন দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীন মন্দিরগুলি—বিশালত্বে, সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যে, ভারতীয় শিল্পীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যবোধের দিচ্ছে কাল বিজয়ী পরিচয়—জননী পরমানন্দে দেখছেন আর আনন্দ করছেন। মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির, প্রস্তরনির্ম্মিত শিব-গঙ্গা সরোবর—সমস্তই দর্শন হ'ল। এমন কি শিবগঙ্গার স্বচ্ছ সরসী নীরে স্নান করে ঐদেশীয় প্রথা অনুসারে শিবগঙ্গার তীরে দীপদানও হ'ল সারা।

পরদিন মধ্যাহ্নে সেখান থেকে আবার রেলপথে আসা হল মণ্ডপম্ ষ্টেশনে। ষ্টেশনটী হরবলা খাড়ির তটে। তারপর বিস্তৃত খাড়িটি ষ্টীমারে পার হয়ে পবনবন্দরে নেমে আবার রেলপথে চ'লে পৌঁছলেন এসে বহুদিনের অভিলষিত রামেশ্বরে—তখন রাত্রি ১১টা—

সেই রামেশ্বর—কামারপুকুরের রামশীলার আবির্ভাব ভূমি—সেই নিত্যলীলাভূমি···রামেশ্বরের পাণ্ডাঠাকুর গঙ্গারাম পীতাম্বরের বন্দোবস্ত মত মিলল একখানি দ্বিতলবাড়ী—সেইটিই হ'ল কয়েকদিনের বাসভবন। আসার পথে দূর হতেই তীর্থরাজের উদ্দ্যেশ্যে জানান সকলে নতি। পরদিন উষাস্নান সমাপন হ'ল, উদ্বেলিত নিলাম্বুবক্ষে। পুণ্যতীর্থের চতুর্দ্দিকে সারি সারি দেবদেবীর মন্দির—স্নানান্তে মা সমস্ত দর্শন ক'রলেন সন্তানদল সঙ্গে—অবশেষে উপনীত হলেন রামেশ্বরের দেবায়তনে। সুবিশাল প্রাচীন দেবালয়—আকাশ ছোঁওয়া গৌরব উন্নত শিরে বহন করছে ভারতের ঐতিহ্যের চিহ্ন, বহন করছে ধূলার বুকে অলকার আকুল ঈঙ্গিত। বালুকাগঠিত অর্দ্ধহস্ত পরিমিত রামেশ্বর। ক্ষুদ্র কুণ্ড তাঁর সিংহাসন—মাথায় স্বর্ণমুকুট···রামরঘুমণির শ্রীহস্তনির্ম্মিত দেবা-দিদেব। দর্শনমাত্র বলে ওঠেন জননী, অস্ফুটস্বরে—"আহা! যেমনকার

তেমনিটি আছে গো!" চেপে ধরেন নিত্যসঙ্গিনী গোলাপ মা—"কি বল্লে মা—কি বল্লে?" অধরা মেয়ে আর কি দেয় ধরা?—নিরুত্তর মুখে—আর কোন উত্তরই যায় না পাওয়া। মনে প'ড়ে যায় সব কথাই। কেনই বা পড়বে না?—রঘুপতি যেদিন স্বগঠিত শিবরূপ করেছিলেন পূজা সেদিন সদ্য উদ্ধৃতা জানকীরূপে তিনিই তো ছিলেন পাশে।

যাই হোক, দর্শনের কোন অসুবিধাই হোল না—রামনাদের মহারাজার পূর্ণ আদেশে। মা'র সঙ্গে মায়ের ছেলেমেয়েরাও লাভ করল বিগ্রহ পূজা স্পর্শের পূর্ণ অধিকার। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সকলেই পুণ্য গাঙ্গ্যবারিতে দেবাদিদেবকে করলেন অভিষিক্ত। অথচ এ মন্দিরে দূরদেশাগত যাত্রীদল তো দূরের কথা পূজারী দাক্ষিনী ব্রাহ্মণ ছাড়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণেরও ছিল না প্রবেশাধিকার···তিনদিন ধ'রে যথারীতি হ'ল পূজা আরতি দর্শন। ১০৮ সোনার বেলপাতা করিয়েছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ঠাকুরের আজন্মসেবক শশী। মা করলেন সেই সোনার বিল্বপত্রে পূজা—তৃতীয় দিবসে বিশেষ পূজা, রামেশ্বর তীর্থের কথকতা শ্রবণ, পাণ্ডা ভোজন কোন অনুষ্ঠানই রইল না বাকী—এমনকি ১৪।১৫ মাইল দূরে ধনুস্তীর্থেও মা পাঠালেন সমুদ্র-দেবতার পূজা দিতে, সেখানকার প্রথামত রূপার তীর ধনুক দিয়ে।—রামনাদের রাজার হুকুম, "আমার গুরুর গুরু, পরমগুরু যাচ্ছেন, সব ব্যবস্থা করে দিও।" তাই কোন ত্রুটীই হ'ল না। একদিন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মণি কোঠা খুলেও হ'ল দেখানো—বহুমূল্য রত্নে, মণি মাণিক্যে গৃহের প্রতিটি কোণ উদ্ভাসিত। প্রোজ্জলিত ক্ষীণ দীপ শিখার আলো ছাড়া কোন আলোই সেখানে জ্বলে না। এই রত্নাগার দর্শন দিবসেই মহারাজের ছিল অভিলাষ জননীর ইচ্ছামত যেকোন জিনিষ গ্রহণ করলে

মহারাজ হবেন ধন্য, হবেন কৃতকৃতার্থ...। কুবের যাঁর ধনরক্ষী ধরণীর ধনে তার চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে না এতো জানাই। আর মা যে আমার নিজেই মনের মণি কোঠার গোপন মাণিক। তবু ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করতে একবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন আদরে পালিতা মানস কন্যা রাধুকে, যদি তার কিছু থাকে প্রয়োজন? এদিকে অন্তরে চলেছে আকুল প্রার্থনা, "ঠাকুর দেখো রাধুর যেন বাসনা না হয়।" মহামায়াকে মায়ার ডোরে বাঁধতে যোগমায়া এই রাধু···সেও জানালো পরম বিতৃষ্ণা "এতে আমার কি হবে? আমার লিখবার পেন্সিল গেছে হারিয়ে বাইরে গিয়ে তাই একটা কিনে দিও।" তৃপ্তির নিঃশ্বাসে ভরে ওঠে মা'র বুক। সারা হ'ল রামেশ্বর দর্শন...আবার জননী ফিরে এলেন মাদ্রাজের সেই শ্রীঠাকুরের নামাঙ্কিত মঠে—সেখানে জননীর শুভ উপস্থিতিতে সম্পন্ন হ'ল শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। শুভ জন্মবাসরে কৃপাপ্রার্থীরাও এল জননীর কৃপালাভে ধন্য হ'তে। তারপর এল ডাক—মাকে যেতে হবে বাঙ্গালোর। নিতে এসেছেন বাঙ্গালোর মঠের সেবক স্বামী নির্ম্মলানন্দ। সন্ন্যাসী ভক্তের ডাক—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে যারা পড়ে আছে ঠাকুরের নামে, সে ডাক তো অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করা যায় না। চ'ললেন মা ভক্তসঙ্গে বাঙ্গালোর। সেখানে বাস ক'রলেন তিনরাত্রি। সুন্দর মঠবাড়ী—মঠের জমিতে সুবাসিত চন্দনবৃক্ষ—সৌরভে ভরে তুলেছে মঠের প্রাঙ্গন, তার পর পিছনেই ছোট্ট একটি পাহাড়। বালিকার মত আনন্দে মা আত্মহারা। প্রস্তরাসনে ধ্যানানন্দে অতিবাহিত করেন একটি সন্ধ্যা। সে স্মৃতির গোধূলি, সে তো ভুলবার নয়। গগন বক্ষে শুভ্র মেঘবলাকার পাখায় ঝিলিক দিয়েছে অস্তমুখী তপনের রক্তরাগ—বিদায় রশ্মির সে আভা ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতির শ্যাম সলজ্জ অধরে—সে আভা জননীর স্নিগ্ধ

সজল চোখে ফেলেছে ছায়ার মায়া আর শুভ্র সুন্দর ললাটপটে এঁকে দিয়েছে রক্তরাগের বিজয় তিলক···সে এক মহিমময়ী মূর্ত্তি। সেই অপরূপ সন্ধ্যার ছবিখানি তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে জননী হলেন ধ্যান সমাহিতা। মুদ্রিত হল নয়নদুটি—যেন সন্ধ্যাশেষে কমল...বুঝি মূর্ত্ত হল সায়াহ্ন গায়ত্রী—সিত সৌম্যরূপ রবিমণ্ডলস্থা সরস্বতী···আর বৈদিক ঋষির মত নতজানু হয়ে জানান স্তুতি মার বেদশীর্ষ সন্তান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। "হে মাতঃ! তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা। তুমি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিতা। তুমি ভক্তজনে মুক্তি দান কর। আমাকে এবং তোমার চরণাশ্রিত অন্যান্য সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর যেন, আমরা সংসারবন্ধন হ'তে বিমুক্তি পাই।" প্রার্থনার স্বরে ভাঙ্গল মহামায়ার যোগনিদ্রা। উন্মীলিত হয় নয়ন দু'টি। করুণাদৃষ্টিতে সন্তানের পানে চেয়ে দেখেন জননী, বরাভয় খানি নেমে আসে চরণলুণ্ঠিত সন্তানের মাথে।

দলে দলে আসেন ভক্তদল—কৃপাপ্রার্থী...এক একদিন মঠের ঐ ক্ষুদ্র পাহাড়টীর মতই স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠে ভক্তনিবেদিত পুষ্পরাশি জননীর শ্রীচরণ প্রান্তে···।

এমনিকরে মুখে তীর্থের ধূলায় ধূলায় আনন্দ রতন কুড়িয়ে কা'টল কয়েকটী মাস···এইবার ফেরার পালা।

প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে একদিন মাদ্রাজ এবং রাজমাহেন্দ্রীতে সংস্কৃত পণ্ডিত জনৈক ভক্ত জজের আতিথ্য স্বীকার করে জননী এলেন সাগরতীর্থ শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে। সেখানে মাত্র ৩।৪ দিন থেকে ফিরে এলেন জননী আপন লীলাতীর্থে, সেদিন ছিল ২৮শে চৈত্রের মঙ্গলবার। মহানগরীর বক্ষশোভিত বেলুড়মঠে সেদিন এক অপূর্ব্ব শোভা হ'ল প্রকটিত—বসন্তের চঞ্চল সমীরণ বিক্ষোভিত গঙ্গাতটে শতসহস্র

মাতৃসন্তান প্রতীক্ষা চঞ্চল চক্ষে দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে মায়ের রথখানি এসে দাঁড়ায় মঠ প্রান্তে…পর পর নয়টী তোপের গুরু গম্ভীর ধ্বনিতে ঘোষিত হ'ল জননীর শুভ স্বাগত বার্ত্তা…সহস্র কণ্ঠে তখন জেগে উঠেছে কল্যাণীর বিজয়স্তুতি—"সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।" আর মা·· নহবতের সেই গোপন কোণটীর সারদেশ্বরী মা…সলাজমধুর মূর্ত্তিখানি বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত…মালার মত ঘিরে আছেন সেবিকার দল…চলেছেন সচল প্রতিমা…আর দেহরক্ষীর মত মায়ের দুলাল, রাখাল মহারাজ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উদগ্রীব ভক্তদের সাবধান করছেন, "খবরদার মা'র চরণ এখন কেউ স্পর্শ করতে পাবে না"…মঠের 'রাজার' কড়া হুকুম —কারো ক্ষমতা নাই যে অমান্য করে…এমন সময় ও কি ? কার দু'টি ক্ষিপ্রচপল হাত সকলের অনবধানে করে জননীর শ্রীচরণ স্পর্শ ?… চমকে চেয়ে দেখেন রাখাল মহারাজ আর কেউ নয় তাঁদের সেই চিরদিনের অবুঝ খোকা…সুবোধানন্দ মহারাজ স্বয়ং। "ধর ধর" করে ওঠেন মঠের 'রাজা'—ধরবে কে ? ততক্ষণে অমূল্য রতন চুরি করে উধাও হয়েছেন খোকাচোর…হাসির কলরোলে ভরে ওঠে মঠপ্রাঙ্গণ —আনন্দ মধুর লীলায় হিল্লোলিত হয় সুরধুনী বক্ষ।

দোতলার একখানি কক্ষে ব'সলেন জননী, ভক্তসঙ্গিনী সঙ্গে, আর নীচে আঙ্গিনায় সুরু হ'ল কালীকীর্ত্তন। সকলে আনন্দ উন্মত্ত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে ক'রেছেন মাতৃনাম—বুঝি প্রাণে প্রাণে হয়েছে সঞ্চারিত মাতৃশক্তি—অনুভব করেছে জগজ্জননীর মূর্ত্ত আবির্ভাব। একখানি বেঞ্চে উপবিষ্ট মঠের 'রাজা'—মায়ের ছেলে, রাখাল মহারাজ—আলবোলার নলটী মুখে দিয়ে পরমানন্দে শুনছেন মায়ের নাম, মা এসেছেন যে, আনন্দ আর ধরে না। কীর্ত্তন চলেছে মহোৎসাহে, হঠাৎ দেখা

যায় মহারাজের দেহ হয়ে গেছে স্থির—হাত থেকে কখন খসে গেছে আলবোলার নল—মহারাজ সমাধিস্থ। মায়ের শিশু, মাতৃরস পান করতে করতে যেন হয়ে পড়েছেন বিভোর—যোগ নিদ্রালীন—থেমে যায় কীর্ত্তন উচ্ছ্বাস, সকলে নিষ্পলকনয়নে চেয়ে দেখে—একটী কান্তকাম শিশুসুন্দর দিব্যমূর্ত্তি। ভাবে, এই বুঝি চাইবেন ভাব সুন্দর চোখ দুটি মেলে; কিন্তু পলে পলে কেটে যায় ক্ষণ…। পার হয়ে যায় পুরো দুটি ঘণ্টা…তবু সে সুখঘোর আর ভাঙে না। সংবাদ যায় মায়ের কাছে। ছেলের ঘুম ভাঙানী গান মা ছাড়া আর কেই বা জানে? শিখিয়ে দেন মা, কোন মন্ত্র শোনাতে হবে কর্ণমূলে আর ফিরে আসবে মন, সমাধির গহিন লোক হতে। হ'লও তাই মা'র দেওয়া মন্ত্র শ্রবণ করতেই যেন ক্ষণিকের ঘুম ঘোর হতে জেগে বলে ওঠেন মহারাজ,—"হ্যাঁ চলুক, চলুক—"যেন কিছুই হয়নি। কে বলবে সমাধির সপ্তসাগরে দিয়েছিলেন ডুব। ওদিকে ঠাকুরের বাল্যভোগ দিয়ে মা পাঠিয়ে দিলেন প্রসাদ—সেই প্রসাদ নিয়েও আনন্দের হুড়াহুড়ি, কেউ প্রসাদের থালা নিয়ে সুরু করেন, নৃত্য ভক্তবীর গিরীশচন্দ্র কেড়ে নেন তার হাত থেকে থালা "ঠাকুরের প্রসাদ মা'র স্পর্শে হয়েছে মহাপ্রসাদ—আমি থাকতে এ মহাপ্রসাদ আর কাউকে বিতরণ করতে দেব না।" এমনি করে সারাটি দিন ধরে চলল মায়ের আগমনীতে ছেলের দলে আনন্দের মাতামাতি…সন্ধ্যায় হ'ল তার অবসান। জননী ফিরে এলেন মঠ হতে আপন শ্রীমন্দিরে। উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হ'ল মুখরিত তোপধ্বনিতে।

মনে পড়ে ঠিক এমনি তার একটি উৎসব দিবস…সেদিনটী ছিল শ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের পুণ্য তিথি…মঠের তোরণ দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন জননী; ভক্তসঙ্গে সুসজ্জিত তোরণমুখে অভ্যর্থনার বিপুল

আয়োজন…ঠাকুরের রাখাল রাজাই তার মধ্যে অগ্রণী। ভাব গম্ভীর কণ্ঠে তিনি দিলেন জয়ধ্বনি, "মহামায়ী কি জয়।" গঙ্গাবক্ষে উঠল তার গুরু গম্ভীর প্রতিধ্বনি—সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধ সেবক দল জানাল স্বাগত অভিনন্দন, মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে। ধীরে ধীরে বরণশঙ্খে কল্যাণীকে বরণ করে আনা হ'ল মঠের অভ্যন্তরে।…তারপর সে এক অপরূপ দৃশ্য…শ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে এসে দাঁড়িয়েছেন মা দক্ষিণামুখে …বিশ্বের প্রসন্নতা দিয়ে গড়া সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি আর একদিকে শ্রীচরণতলে পুলক রোমাঞ্চিত কলেবরে নতজানু হয়ে উপবিষ্ট রাখাল মহারাজ। পরিপুষ্ট দিব্যোজ্জ্বল তনুতে গৈরিকের দীপ্তি—সিতশুভ্রা হিম দুহিতার চরণান্তিকে যেন আদর্শ মাতৃভক্ত ত্যাগব্রতী গণপতি—কম্পিত হস্তে অঞ্জলির পর অঞ্জলি সচন্দন পুষ্প তুলে দিচ্ছেন মা'র রাজীব চরণে। এরপর সুরু হ'ল আরতি—ঘণ্টার মধুর নিনাদে পঞ্চপ্রদীপের আলোয় জাগ্রতা পরমেশ্বরীর আরতি করলেন মহারাজ নিজেই—বিশ্বজোড়া বেলুড় মঠের [illegible]ঙ্গার তখন সব পরিচয় গেছে হারিয়ে—মায়ের একান্ত সেবক—মায়ের সন্তান, মায়ের দাস। তারপর সবার অঞ্জলি দেবার পালা। সমবেত কণ্ঠের চণ্ডীস্তোত্র "সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে" যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো মঠের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাঙ্গলিক শঙ্খের মত, আর শ্রীচরণে জমে উঠতে লাগলো কুসুম স্তবক…আধো সমাধিলীন দেবীর পদতলে তখনও সেই একভাবেই উপবিষ্ট মহারাজ—নয়নে নেমে এসেছে মঙ্গল জলধারা…সেদিন তাঁর সে এক অপরূপ ভাবান্তর। মহারাজের সন্তানরূপটী যেন সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে, মূর্ত্ত হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে, মধ্যাহ্নের শয়ান লগ্নে আবার জমে ওঠে ভিড়—দোতলার সিঁড়ির কাছে বিপুল ভক্তজনতার ঠেলাঠেলি মাতৃদর্শনের আকুল পিপাসায়, আর মঠাধ্যক্ষ তখন দীন প্রহরীর মত দু'হাতে দিচ্ছেন

বাধা "না না ওপরে যেতে দেওয়া হবে না।" বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়েও মায়ের কাছে মায়ের দীন সেবক, দীন সন্তান ছাড়া যেন আর কোন পরিচয়ই তাঁর ছিল না সেদিন। তাঁর সেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দ্বাররক্ষী রূপ দেখে নবাগত ভক্তেরা পারে না চিনতে তাই তারাও সমতালেই মহারাজের বাধাকে অতিক্রম করতে হয়ে ওঠে সচেষ্ট···ফলে ঠেলাঠেলি ওঠে বেড়ে···সহসা এদৃশ্য চোখে পড়ে কোন পরিচিত ভক্তের। বিস্মিত হয়ে ছুটে আসেন তিনি, সর্ব্বনাশ! অবুঝ ভক্তসঙ্ঘ যে এক গুরু অপরাধে অপরাধী হতে বসেছে, তারা তো জানেন না মহারাজের পরিচয়, বুঝিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন ভক্তবর···এবং বুঝিয়ে দেনও ধীরে ধীরে...চমকিত হয়ে ওঠে···ক্ষান্ত হয় ভক্তদল—মুহূর্ত্তে থেমে যায় সব গোলমাল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আর একটী উৎসব দিবস। বিদেশীনী মেয়ে নিবেদিতা, মা'র একদিন শুভাগমন হ'ল তাঁর বিদ্যায়তনে··· সেদিন মাতৃগতপ্রাণা নিবেদিতার সুখের নাই সীমা। আনন্দের সঞ্চারিণী দীপশিখার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাণীভবনের অঙ্গনে, আনন্দের আলোয় ভরিয়ে তুলতে। মা আসবেন, তাই সকাল থেকে আয়োজনের শেষ নাই। ছোট্ট সংকীর্ণ গৃহখানি কেমন করে সাজিয়ে তুলবেন সেই চিন্তায় আকুল। মায়ের মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে বেদ হাঁসি··· তাঁর মুখে শুনতে হবে প্রসন্নতায় ভরা দু'টি প্রশংসাবাণী— মেয়ের বুক যে তখন গরবে উঠবে ভ'রে—কেমন ক'রে জানাবেন তাঁকে সাদর অভিনন্দন—সে বাণী কি আছে তাঁর মুখের ভাষায়? চেষ্টারও ত্রুটি নাই, মেয়েদের দিচ্ছেন উৎসাহ ভরা প্রেরণা— "মাতা দেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর"—ছোট্ট ছোট্ট কচি মনে সে আনন্দের ছোঁওয়া

লাগতে দেরী হয় না, তারাও প্রবল উৎসাহে পত্রপুষ্পে সাজিয়ে তোলে তাদের বাণীমন্দিরটিকে—জাগ্রতা বীণাপাণির আবাহন উৎসবে। কোথা দিয়ে আয়োজনের কলরবে কেটে যায় সারাটি সকাল, সারাটি মধ্যাহ্ন। অপরাহ্নের প্রারম্ভে এসে দাঁড়ালো মা'র গাড়ী···ভক্তসঙ্গে এসে দাঁড়ালেন মা, মঙ্গল কলসে সাজানো বাণীমন্দিরের দ্বারে। আর নিবেদিতা? দেখা গেল নিবেদনের কমল মালার মতই তিনি লুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর শুভ্র সুন্দর তনুখানি জননীর চরণতলে···ঠাকুরদালানে বসলেন মা···নিবেদিতা নিয়ে এলেন পুষ্পের ডালি...ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের সাথে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি ভারতীয় প্রথায়—কে বলবে আইরিশ দুহিতা? আনন্দে পরিচয় দেন সব মেয়েদের, তাদেরও উৎসাহ কম নয়—মাকে শোনায় তারা গান, কবিতা···আজ হৃদয় ঢালা কৃতিত্বে তারা মুগ্ধ ক'রবে মূর্ত্ত সরস্বতীকে···তাঁর প্রসন্নতাই যে ছাত্র জীবনের কাম্য···। আর সিষ্টার—তিনি পেয়েছেন আপন মাকে...ঘুরে ঘুরে মাকে নিয়ে তিনি দেখান তাঁর গড়ে তোলা মাতৃভবন...মেয়েদের হাতের শিল্পকলা, মেয়েদের শিক্ষা—সর্ব্বোপরি মেয়েদের গঠনমুখী জীবন—দেখে মায়ের আনন্দ যেন উপচে পড়ে। শ্রীমুখে ছড়িয়ে পড়েছে হাসির জ্যোৎস্না—বলছেন, "বেশতো শিখেছে মেয়েরা?" শুনছেন নিবেদিতা—দেখছেন নয়ন মেলে আর হৃদয়খানি কানায় কানায় উঠেছে ভ'রে···তারপর নিবেদিতার নিজস্ব ঘরখানিতে একটু বিশ্রাম ক'রে মা সেদিনকার মত নিলেন বিদায়...শ্রীচরণ ধূলায় ধন্য ক'রে সদ্যগঠিত শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে...। ভারতের নারীশিক্ষার জন্য মায়ের কল্যাণ ইচ্ছা, আর নিবেদিতার শত আশাপোষিত অক্লান্ত পরিশ্রম হয়নি ব্যর্থ।···আজ মহানগরীর বুকে গৌরবোজ্জ্বল চরণচিহ্ন মাথায় তুলে দাঁড়িয়েছে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।'

১৩১৭ সালের চৈত্রে জননীর প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দমেলা শেষে এ'ল নববর্ষ—১৩১৮ সালের নববর্ষ—। নূতন অধ্যায় যে কি নিয়ে আসে তার অলখ অঞ্চলে ঢেকে, জানেন শুধু মহাকাল...মানুষের কাছে তা চির অজ্ঞাত...অনাগত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে থাকা চির ঔৎসুক্যই সম্বল···কখন হয়তো সে পেল আলোঝলমল নীলনভতল...আর কখন হয়তো পেল বজ্রগর্ভ ঘনঘটা···১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্রের প্রথম শরৎ; ধরণীর ভাগ্যলিপিতে এঁকে দিল দুঃখের মসীলেখা···সেদিন রামকৃষ্ণ জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ধূলার ধরণী থেকে নিলেন চির-বিদায়···আজন্ম সেবক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—এই কয়েকটি মাস আগেও যিনি জননীর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে ছিলেন প্রধান পূজারী। অকুণ্ঠ সেবায়—সেকি অসীম উৎসাহ, মা আসবেন, দয়া করে চরণধূলি দেবেন—তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া এই মান্দ্রাজ মঠে···সে আনন্দেই বিভোর। কোথাও রাখেননি এতটুকু কৃপণতা—এতটুকু ক্ষুণ্ণতা। সেখানকার সমস্ত সুবন্দোবস্ত হয়েছে তাঁর একাগ্র সাধনায়—সে কি ভুলবার? মায়ের সেই আদরের শশী বিদায় নিলেন ১৩১৮ সালের ভাদ্রের চতুর্থ দিনে। সে এক বিষাদ বিধুর দিন······শেষ দর্শনের আশায় আকুল ছেলের নয়ন সম্মুখে জননী এসে দাঁড়িয়েছেন, স্থূলে নয় —সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে···সূক্ষ্মলোকের পথযাত্রীর দিশারী হ'তে হ'লে মহামায়াকেও—সূক্ষ্মরূপেই নিয়ে যেতে হবে রামকৃষ্ণ লোকের দ্বারে— হঠাৎ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে বলে ওঠেন শশীমহারাজ, "মা এসেছেন।" তারপর চির আশ্রয় নিলেন মায়ের কোলে। একদিকে সূক্ষ্মরূপে খেলার শেষে ছেলেকে নিলেন মা বুকে তুলে, আর একদিকে জগৎ দেখলো পুত্রবিয়োগবিধুরা দেহধারিনী জননীর মূর্ত্তরূপ—যা নিত্যদিনের বাস্তব দিয়ে গড়া। জয়রামবাটীর সেই

পর্ণকুটীরে কাঁদছেন মা আকুল হয়ে, বলেছেন' "শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে"—

কালচক্র যায় ঘুরে—চিরন্তর দিন রাত্রির গতিতে···তার আবর্ত্তন বিলাসে জেগে ওঠে সুখদুঃখ, হাসিকান্না, বিরহমিলন···। ঠিক একটি বছর পর আকাশগঙ্গায় আলোর জোয়ার নিয়ে আবার আসে শরৎ—১৩১৯ এর মঙ্গল শারদীয়া···বেলুড়ের মঠ প্রাঙ্গণেও ছড়িয়ে পড়েছে কল্যাণদ্যুতি—সেখানেও যে আসবেন মহামায়া...ইতস্ততঃ আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরছেন সেবকের দল—পূজার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে...। দেবীর বোধনক্ষণ সমাগত—এসেছে সবাই আনন্দময়ীকে বরণ করতে। কিন্তু কই—যাঁর পূজা তিনি কই? মন্দির আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন দশভূজা—কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠের প্রাণ প্রতিমা যে দ্বিভূজা সারদা—তাই মঠবাসী হয়ে ওঠেন চঞ্চল। "মা আসেন্‌নি, মা আসেন্‌নি"—একটা অভাবের গুঞ্জন ফিরতে লাগলো মঠের দিকে দিকে। বাহিরের লোকে কি ভাবল কে জানে? তাঁরা দেখছে ঐ তো মা মন্দিরে···। ছুটে আসেন চঞ্চল চরণে স্বামী প্রেমানন্দ—মা আসেন নি কেন?—কি ত্রুটি রয়ে গেছে তাঁদের আয়োজনে? ফুলে, আলপনায় ধূপে, দীপে, নৈবেদ্যে, চণ্ডীমণ্ডপে. আয়োজনের কোন ত্রুটীইতো পড়েছেনা চোখে—তাই ছুটে এসেছেন মঠের প্রবেশ দ্বারে···দেখেন মঙ্গল ঘট, কদলীবৃক্ষ হয়নি স্থাপিত তাই বলেন, "এখনো কলাগাছ, মঙ্গলঘট রাখা হয়নি, মা আসবেন কি?" পাতা হল মঙ্গলঘট—স্থাপিত হল কদলীবৃক্ষ···ওদিকে বেজে উঠলো বোধন শেষের শঙ্খ···ধীরে ধীরে মঠের দ্বারে এসে দাঁড়ালো মা'র গাড়ী। গোলাপমা'র হাতে হাতটি দিয়ে নামলেন মহামায়া—আর রঙ্গ করে বলে উঠলেন "সব ফিট্‌ফাট্‌, আমরা যেন সেজে গুজে মা দুর্গা

ঠাকৃরুণ এলুম”…বোধন ঘট প্রতিষ্ঠিত না হ’লে দেবীর পূর্ণ আবির্ভাব হবে কেমন করে? তাই বোধন শেষেই হল মা’র পুণ্য আবির্ভাব, এ মঠে যে তাঁরই পূজা…মনে পড়ে স্বামী প্রেমানন্দের কথা…এই দুর্গা পূজাতেই অষ্টমীর সন্ধিপূজার শেষে সেবকের হাতে দিয়েছেন একটি গিনি—“যা এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।” ভাবেন ব্রহ্মচারী বুঝি দুর্গা প্রতিমার কথাই বলেছেন স্বামিজী…ভুল ভাঙে কিন্তু পরের কথায়। স্বামী প্রেমানন্দ বলে উঠলেন, “ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হ’ল।” এ শুধু মুখের কথা নয় এ সত্যিকার অন্তরের কথা… তাই দেখি কোন বৎসর দুর্গা পূজায় মায়ের ছেলে রাখাল মহারাজ মহাষ্টমীর লগ্নে ১০৮ কমলদলের অর্ঘ্য নিবেদন করছেন মাতৃচরণে অষ্টমী পূজার বিশেষত্ব এই শতাধিক পদ্মের অর্ঘ্য…। আবার কোন বার হয়তো বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন ভক্তদল মহাষষ্ঠির পূজা তিথিতে এসে দাঁড়িয়েছে জননীর রথ—অশ্বের বল্গা খুলে দিয়ে সে রথ টেনে নিয়ে চলেছেন মা’র পাগল ছেলের দল, সে এক অপরূপ দৃশ্য…শরতের স্বর্ণ আলো উদ্ভাসিত গঙ্গার শ্যামায়িত তটে চলেছে যেন এক গৈরিক বাহিনীর বিজয় অভিযান—মহামায়ীর জয়রথের রজ্জুধরে…আনন্দের নেশায় উন্মত্ত…টলে টলে পড়ছেন স্বামী প্রেমানন্দ—চোখে মুখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে গৌরবের আনন্দদ্যুতি। কেটে যায় তিনটি দিন নির্বিঘ্নে, ত্রুটীহীন সেবা পূজায়…মহানবমীর সমাপ্তি পূজায় মা’র প্রসন্নতার আশীষ বহন করে নিয়ে আসেন গোলাপমা—“শরৎ, মাঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুসী হয়ে তোমাদের তাঁর আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন” …চিরকালের গম্ভীরাত্মা শরৎ মহারাজ—চিরকালের স্বল্পভাষী—হৃদয়ের উচ্ছল আনন্দ তাঁর কণ্ঠে হয়ে ওঠে সংহত গভীর, বলেন “বটে,”

তার পর—উজ্জ্বল চোখে ফিরে চা'ন ভাই বাবুরামের দিকে—বাবুরামের চোখেও তখন বাঁধভাঙ্গা আনন্দ···"বাবুরাম শুনলে ?" তারপর মহানন্দের সাগরে কথা যায় হারিয়ে তখন সুরু হয় মায়ের দু'টি রত্নছেলের আনন্দ কোলাকুলি।

১৩১৯ সালের শারদোৎসবের হ'ল সমাপ্ত···হেমন্তের স্বর্ণ শ্যামোচ্ছলপ্রকৃতির বুকে আবার দেখি জননীকে তীর্থের পথে...চলেছেন মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী অভিমুখে···এই বারাণসী যাত্রাই জননীর শেষ তীর্থ যাত্রা···দেহে অবস্থানকালে আর কোনদিন তীর্থের মুখে আর কেউ দেখেননি জননী সারদেশ্বরীকে, সর্ব্বতীর্থের সার আপন লীলা তীর্থ ছাড়া···। ১৯শে কার্ত্তিকে হ'ল যাত্রা। পরদিন দিবসের মধ্য প্রহরে মা'র গাড়ী এসে দাঁড়ালো শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের নিকটস্থ লক্ষ্মীনিবাসে। বিপুল ভক্তগোষ্ঠী পরিবৃতা জননী এইখানে কাটালেন আড়াইটি মাস···ভক্ত কিরণ বাবুর নবনির্ম্মিত এই বাসভবন—চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত আবেষ্টনী—প্রশস্ত আঙিনায় প্রকৃতির দুলালী জননীর মনকে কোরে তোলে আকুল, বলেন,—"ভাগ্যবান না হ'লে এমন হয়না ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয় দর্শন হল কাশীর বিশ্বনাথ—দর্শন হল স্বর্ণকাশীর স্বর্ণ অন্নদা··· আনন্দে মায়ের মন উঠেছে ভ'রে তীর্থের বিশিষ্ট স্থানগুলিতেও পড়ে

তাঁর রাঙাচরণ···শ্রীচরণরজে পূত হয়ে ওঠে আবার তাদের তীর্থ মাহাত্ম্য দিব্য হতে হয় দিব্যতম।

২৪শে কার্ত্তিক বিশ্বজননী মহাকালিকার পূজার তিথিতে এলেন মা তাঁর বিশ্বজয়ী সন্তানদলের বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে গড়া সেবাশ্রমে, দেখেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তর দেবতা শ্রীঠাকুরের দেববাণী···"দয়া কিরে?—সেবা—সেবা। শিব জ্ঞানে জীব সেবা"—বিরাট সেবাগারের প্রতিটি অঙ্গ হয় জননীর চরণ ধূলিতে ধূসরিত···। ঘুরে ঘুরে দেখেন মা...দেখেন পুষ্পবাটিকা শোভিত বিরাট প্রাসাদোপম ভবন, এ যেন দীন, আর্ত্ত নারায়ণের পূজার দেউল···যার সেবায়, ত্যাগের গৈরিক শিখায়, দিয়েছে আত্মাহুতি তাঁর শত শত সন্তান··· গর্ব্বে আনন্দে মায়ের বুক বুঝি হয়ে ওঠে দশহাত—দ্বিভূজার হাতে যেন ঝ'রে প'ড়ে দশভূজার আশীষ ধারা—বলেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" দীন নারায়ণের সেবায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি ত' চিরপূর্ণ থাকবেই···। ছেলের গরবে গরবিনী মা শুধান "আচ্ছা এটী প্রথমে কি করে আরম্ভ হল?"

উত্তরে শোনেন আদ্যন্ত সমস্ত ইতিহাস, কি করে রিক্ত প্রেমিক সাধু শুভানন্দের চোখের জল, আর চার আনা পয়সা নিয়ে গড়ে উঠলো এই বিরাট সেবায়তন—যা কাশীর বুকে চির অমর হয়ে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নামের স্বর্ণস্তম্ভ হ'য়ে···পরমানন্দিতা জননী বলেন, "স্থানটী এত সুন্দর যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" তারপর সেই সেবা ভাণ্ডারের উদ্দ্যেশে লক্ষ্মীস্বরূপিনী দিলেন কিছু লক্ষ্মীর ধন। কিছুদিন পর ২৮শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে তীর্থের দর্শনীয় স্থানগুলি করেন দর্শন—বৈদ্যনাথ, তিল ভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি দর্শনশেষে মা এসে দাঁড়ালেন গঙ্গাতীরে···অস্তরাগরঞ্জিত বারানসীর ভাগীরথী

তখন নম্র নত পূজারিণীর মত শান্ত চরণে চলেছেন যেন দেবাদিদেবের সান্ধ্য আরতিতে। জননী এসে দাঁড়ালেন প্রশস্ত সোপান তটে...নয়ন ভ'রে দর্শন করেন গঙ্গার অপরূপ রূপমাধুরী...তারপর কেদারনাথের দেববিগ্রহ দর্শন আর আরতি দর্শনও হ'ল সারা। বিগ্রহ দর্শন করে বলে ওঠেন মা, "এ কেদার ও সেই কেদার এক যোগ আছে—এঁকে দর্শন করলেই তাঁকে দর্শন করা হয়, বড় জাগ্রত।"

সারনাথের প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন করতে আর একদিন হ'ল যাওয়া—কত লোকই হয় তো সেদিন গেছে ভারততীর্থের অন্যতম সেই বোধি তীর্থে—কিন্তু সকলের মধ্যে কয়েকজন পাশ্চাত্যবাসীকে দেখেই কি মনে হ'ল মায়ের কে জানে—বলেন, "যারা করেছিল, তারাই আবার এসেছে! আর দেখে অবাক হ'য়ে বলছে, কি আশ্চর্য্য সব করে গেছে।"

শুধু তীর্থের দেবতা, পাষাণ মন্দির দেখেই ক্ষান্ত হয় না মা'র মন। ছুটে যান দেখতে জীবন্ত চিন্ময় দেবমন্দির। দর্শন করেন সেই সব সন্তবৃন্দকে যাঁদের দেহমন্দির দেবতার নিত্য আবির্ভাবে হয়ে আছে চির অমৃত লোক। তাঁরা আছেন বলেই—আজও মানুষ দেখে তীর্থ পীঠে শ্রীহরির চরণ চিহ্ন...

প্রায়েন তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি
তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ। ১।১৯।৮

ভাগবতের এ বাণী যে চিরন্তন—

কাশীতে দুইজন মহাত্মার দর্শন হ'ল মায়ের তীর্থ দর্শনের অঙ্গস্বরূপ। প্রথমে ভাগীরথী তীরে জনৈক নানকপন্থী সাধুর দর্শন। বিশ্বজননী সাধারণ একটি পল্লীজননীর মত গ্রহণ করেন তাঁর পদধূলি—দেন কিছু প্রণামী।...জানিনা সন্ন্যাসীবর বুঝেছিলেন কিনা তাঁর বহুসাধের

অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী, আজ কোন শুভক্ষণে মিলিয়ে দিল মুক্তির দিশারীকে...মিলিয়ে দিল মূর্ত্তিমতি কাশীশ্বরীর সচল বিগ্রহ।...

তারপর দর্শন হ'ল সন্ন্যাসী চামেলী পুরীকে···পুরীজীর পরিচয়··· তিনি শ্রীঠাকুরের শিবগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীজীর সম্প্রদায় ভুক্ত... সর্ব্বত্যাগী নিঃস্ব সন্ন্যাসীর চোখে মুখে সেকি জ্বলন্ত দীপ্তি...এদিকে দেহযষ্টী কালের ছুর্লঙ্ঘ্য বিধিতে হয়ে পড়েছে জীর্ণ, বার্দ্ধক্যের শেষ কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছেন পুরীজী...তবু নাই এতটুকু চিন্তা···শুধান গোলাপমা, "কে খেতে দেয়?" চীরবাস ধারী বৃদ্ধের কণ্ঠে নির্ভরতার অমিত তেজ..."এক দুর্গা মাঈ দেতী হ্যায়, ঔর কৌন দেতা"...চোখের সামনে জীবন্ত ঈশানীকে দেখেই বুঝি কথার মাঝে নির্ভরতা হয়ে উঠেছে আরো পরিস্ফুট—আরো দৃঢ়তর...ছেলের কথায় মায়ের হৃদয় ওঠে দুলে। ফিরে এসেও ভুলতে পারেন না তার সেই পরম বিশ্বাস ভরা মুখখানি বলেন, "আহা! বুড়োর মুখটি মনে পড়ছে...যেন ছেলে-মানুষটীর মত," তারপর পাঠিয়ে দেন দুর্গামাঈ স্বয়ং,—ফল মিষ্টি, কম্বল। কত আদরে—বলেন, "আবার সাধু কি দেখব? ঐ তো সাধু দেখেছি, আবার সাধু কোথা?"

লীলার চিত্রে মাঝে মাঝে দরকার হয় রহস্য ভরা দৃশ্যের অবতারণা। তা না হ'লে বুঝি হয়না লীলারসপুষ্টি...সেদিন মাতৃদর্শনে এলেন কয়েকটি কাশীবাসিনী···জগজ্জননী বুঝি রঙ্গচ্ছলে করেন স্বরূপ গোপন।...জনৈকা রমণী তাই পারেন না চিনতে···তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়, গোলাপমাই বুঝি জননী সারদা···যাঁকে দর্শন করতে তাঁ'রা এসেছেন ছুটে।...গোলাপমার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রাচীন মূর্ত্তিই কি তার কারণ? যাই হোক তিনি এগিয়ে গেলেন গোলাপমাকে প্রণাম করতে ···সেইখানেই বাধল গোল। গোলাপমা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ব্যস্ত

হয়ে করেন মা'র প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ, "ঐ উনিই মাঠাকুরুণ'...রমণী তাড়াতাড়ি এসে মা'র চরণে নত হ'তে না হতেই ভুলিয়ে দেওয়া হাসি হেসে ঠিক তেমনি ক'রেই বলেন মা,—"ঐ উনিই মাঠাকরুণ" রমণী আবার ছুটে আসেন গোলাপ মা'র কাছে...আবার গোলাপমা দেন বাধা। মায়ের কাছেও সেই ভুলিয়ে দেওয়া কথা আর হাসি। লীলার গোলক ধাঁধায় পড়ে দিশাহারা হয়ে যান আগন্তুকা ; অবশেষে মহামায়ার মায়াই হয় জয়ী। ভুল করে রমণী গোলাপমাকেই সাব্যস্ত করে জননী ব'লে, তখন গোলাপমা নিরুপায় ; তীব্র ধমকে কাটতে হয় বিভ্রমের মোহজাল—"তোমার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই ?" দেখছে না মানুষের মুখ না দেবতার মুখ ? মানুষের চেহারা কি অমন হয় ?" তারপরের রহস্যটুকু আর পাওয়া যায় না লিখনী মুখে। তবে মনে হয় রমণীর অন্ধ নয়ন গিয়েছিল খুলে, আর দুই চোখের বিস্ময় দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, অনন্ত ঐশ্বর্য্য পেয়েছে লাজ, সে নিরাভরণার অনৈশ্বর্য্য রূপে ...আর তার সঙ্গে মনে পড়ে গানের দুটি চরণ—

"আভরণের কাজ কি বালাই
সব রূপের গরব চরণ ধূলাই।"

মাঝে মাঝে আসে একটি ভিখারিণী মেয়ে—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সে গায়...পাষাণ গলানো গান...মায়ের একান্ত করুণার পাত্রী সে। প্রথম দিন সে এসেই গাইল,

"আমার মা কোথায় গেলে ?
অনেকদিন দেখি নাই মা
নে আমায় কোলে।"

মা শুধান পরিচয়...সে বলে, "আমি, আপনার ভিখারিণী মেয়ে মা।" কখন অন্নপূর্ণার দুয়ারে কখন দশাশ্বমেধ ঘাটে সে থাকে প'ড়ে।

ভিক্ষান্নতেই চলে দিন অন্নপূর্ণার দুয়ারে কেউ তো থাকে না উপবাসী।...

কি ক'রে ভিখারিণী মেয়ে পেল সন্ধান সেই জানে...গোপন মর্ম্মী ভক্ত, কেমন করে জানলো বারাণসীকে ধন্য করতে আবার এসেছেন বিশ্বেশ্বরী...তাই কোন দিন বা কিছু আনে হাতে করে, ভিক্ষায় হয়তো পেয়েছে একটি ফল,—সেই রিক্ত প্রাণের নৈবেদ্যটুকুই সে নিবেদন করে—কত সঙ্কোচে কত লজ্জায়।...মাও তা'র দেওয়া ফলটী আদর করে করেন গ্রহণ "আহা! দাও মা, ভিক্ষার জিনিষ খুব পবিত্র, ঠাকুর বড় ভালবাসতেন।" সে কাঁদে বলে, "আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে—আমার ওপর এত দয়া।" তারপর প্রাণ ঢেলে, দেয় তা'র সুরের ডালি...এই তা'র মায়ের পূজা...মা বলেন, "তোমার যখন ইচ্ছা হবে এস মা।" আর হাত ভরে দেন প্রসাদ।...মায়ের ভুবনভরা ছেলেমেয়ের মাঝে এমনি গোপন, মর্ম্মী, দীন ছেলেমেয়ে যে কত আছে গোপনে, তা'র খোঁজ কেই বা রাখে?

আসে কৃপাপ্রার্থীর দল...কিন্তু তাদের যেতে হয় ফিরে—মা দেন না দীক্ষা।—বলেন, "জয়রামবাটী কিংবা কলকাতায় গেলে হবে।"...জানিনা কি নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে এর মাঝে। সেদিন এলেন এক মাড়োয়াড়ী রমণী—সাধারণ সংসারের গৃহিনী কিন্তু উচ্চস্তরের সাধিকা...গৃহ, সংসার, পুত্র কন্যা কিছুরই নাই অভাব; কিন্তু সীমার পূর্ণতায় ভূমার অভাব বুঝি মেটেনা। তাই তাঁর নিরন্তর একটা অভাব যেন জেগেই থাকে...এদিকে গোমাতার সেবা, ধ্যান ধারণা সবই করেন। ধ্যানের সময় শুনতে পান বেদান্তের বেদ্য যে মন্ত্র সেই সোঽহং মন্ত্র...অথচ চির অশান্ত জীবন; কি যেন চাচ্ছেন, পাচ্ছেন না তা'র সন্ধান...সেদিন স্বপ্নলোকে পেয়েছেন জননীর দর্শনকৃপা—তাই

এসেছেন ছুটে।...তাঁর জন্যে বলেন মা..."ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে। এখন দীক্ষাটি হলেই হয়ে যাবে। কাশীতে তো আমি দীক্ষা দিই না, এখানে শিব গুরু, জয়রামবাটী কি কলকাতা গেলে হবে।" আবার অপর কোন ভক্ত মেয়ে তাঁকে বলেন আর একটি কারণ...তিনিও পেয়েছেন স্বপ্ন, মা যেন তাঁকে দীক্ষা দিতে উৎসুক; কিন্তু জননীর কাছে শোনেন সেই এক আপত্তি, "তোমাকে আমি কলকাতায় কি জয়রামবাটীতে মন্ত্র দেব; কাশীতে মন্ত্রদিলে সদ্যোমুক্ত হ'য়ে যাবে।" মহামায়ার অচিন্ত্য লীলা কে বুঝবে?

দেখতে দেখতে কেটে গেল আড়াইটী মাস। তীর্থের বিধিনিয়ম সবকিছুই সারা ক'রে মা ফিরে এলেন আপন পিত্রালয়ে, যার নিবিড় বক্ষ অবলম্বন করে সহস্রদল মেলে বিকশিত হয়েছিল জননীর লীলার কমল। ভারতীয় নারীর এক একটী আদর্শ যেন তার এক একটী লীলায়িত দল, এ যুগের মন্থরবায়ু আজও বহন করে ফিরছে যার সুরভি সারা জগতে। জয়রামবাটী আর কামারপুকুরের সেই পর্ণকুটীর যেন ধরা অধরার মিলনপ্রান্ত...উদ্বোধন বা অন্য সব লীলাপীঠের সমস্ত মাতৃ-লীলার মূলউৎস যেন সেই পল্লীরাণী জয়রামবাটী। স্বজন পরিবৃতা মা যেন সেখানে ধরা দিতে গিয়েও হয়ে পড়েছেন চির অধরা...সাধারণের মাঝে একান্ত অসাধারণ। অলকার দেবী আবার মাটীর মানবী... নিত্যদিনের পরিচয়ে—নিত্যদিনের চেনায়—চির অপরিচিতা, চির অচেনা। তাই দেখি কলকাতা যাবার পথে যখন কোন আত্মীয়া জানিয়েছেন পুনরাগমনের মিনতি, সারদা আবার এস! পল্লীমাটীর মেয়ে দু'হাতে পবিত্র মাতৃভূমির ধূলি মাথায় স্পর্শ করে সজল নেত্রে দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি, "আসব বই কি" বলেছেন—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী..." আবার যখন বহুদিন কলকাতায় হয়েছে থাকা—

পল্লীর মেয়েকে দেশের মাটী যেন দু'হাতে হাতছানি দিয়ে ডাকে অথচ পদে পদে জাগে বাধা...তখন সে কি করুণ মিনতি···ঠাকুরের পানে চেয়ে বলেছেন, "জয়রামবাটী চল। জয়রামবাটীর বড় পুকুরের জল আর তুলসী কি মনে লাগেনা তোমার?" পিত্রালয়ের প্রতি এ টান মায়ের চিরন্তন···এই পিত্রালয়ের আকর্ষণে একদিন দেবাদি-দেবের অনুমতির আশায় ছিন্নমস্তার রূপ [illegible] দেখিয়েছিলেন মেনকার দুহিতা উমা মহেশ্বরী—মায়েরও এই টান দেখে কোন ভক্ত ছেলে রহস্যচ্ছলে বলতে ছাড়েন না—"মাগো! এ আকর্ষণ কি তোমার যুগে যুগে সাধা...।"

অথচ কি আশ্চর্য্য!...বিশ্বের শত শত সন্তানকে অভয় আশ্রয় দিয়ে আপন বিপুল স্বজনকুলের মাত্র ছয়জনকে দিয়েছিলেন মন্ত্রদীক্ষা··· তার মাঝে একটিকে নিলেন মা মানস কন্যা গৌরীমার একান্ত অনুরোধে, "মা একটী তোমার বলতে থাক'—মা'র ভ্রাতৃজায়া সুবাসিনী দেবী—সত্যিই মায়ের প্রতি ছিল তাঁর গোপন দরদ—মায়ের একান্ত স্নেহের পাত্রী···এক একদিন নিভৃতে জানান আকুতি, "মাগো সাধন ভজন তো কিছু জানি না।" জননীর মুখে একান্ত আশীর্ব্বাদ ও আশ্বাস, "তুমি এই যে কাজ করছ, এতেই সাধন ভজন করা হচ্ছে, এর চেয়ে আর কি সাধন ভজন? ঠাকুরকে জানাও আমার যেন ভক্তিলাভ হয়।" তাঁরি কন্যা বিমলার হ'ল একবার কঠিন অসুখ, তখন শ্যামার কুটীরে এসেছেন জননী জগদ্ধাত্রী—তারি পূজার আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। চারিদিকে আনন্দ কলরব এদিকে বিমলার তখন মুমূর্ষু অবস্থা...মরণের দুরন্ত বায়ে প্রাণপ্রদীপ এই বুঝি বা যায় নিভে···আনন্দধ্বনি সুবাসিনী দেবীর লাগে যেন ক্রন্দনধ্বনি...জননী তখন বাস করছেন তাঁর নবনির্ম্মিত মন্দিরে মাতৃভবনে—মা'র সেবক সারদানন্দের সজাগ দৃষ্টি ছিল কোথায়

জননীর অস্বাচ্ছন্দ্য, অসুবিধা—তাই স্বজন ও ভক্তসংঘ পরিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যপুকুরের পশ্চিম তটে পুষ্করিণী সমেত ক্রয় করলেন একখণ্ড ভূমি···সেইখানেই নির্ম্মিত হল মা'র নব-দেবায়তন। সেকাজে অর্থ সাহায্য করলেন মা'র অন্যতম কর্ম্মীছেলে ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...১৩২৩ সালের প্রারম্ভেই হয়েছিল মা'র নবমন্দিরে অধিষ্ঠান...যাই হোক সেইখান থেকে বরাভয়া এসে দাঁড়ালেন আর্ত্ত ভ্রাতৃজায়ার গৃহাঙ্গনে। মায়ের চরণ দু'টি ধরে আকুল হয়ে কাঁদেন সুবাসিনী দেবী—আর মা'র চরণধূলা দেন মেয়ের মুখে···মমতাময়ী আর কি পারেন স্থির থাকতে? মৃত্যুপথযাত্রীর সারা অঙ্গে দিলেন মরণ হরণ অভয় পরশ, আর জল ভরা চোখে দেবী প্রতিমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "কাল তোমার পূজো হবে মা, আর বড় বৌ হাউ হাউ করে কাঁদবে?" মায়ের আদরের ভ্রাতৃজায়াকে আর কাঁদতে হয় না—পূজার দিন তাঁর মুখের আনন্দহাসি থাকে অম্লান সেই রাত্রেই বিমলার জ্ঞান আসে ফিরে—ভয়ের সম্ভাবনাও যায় কেটে। ঘরের জনের কাছে নিত্যদিনের সঙ্গিনী হয়ে অনন্ত শক্তিকে এমনি করেই রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন তবু এমনি আমাদের নিরভিমানিনী জননী, যে শিষ্যের কাছেও প্রত্যাশা করেননি গুরুর পূর্ণ দাবী। ভক্ত মেয়ে দেখেছেন স্বপ্ন, তাঁর অসুস্থ শিশুসন্তানকে ঠাকুর দিলেন ঔষধ আর তাতেই সে আরোগ্য লাভ করলো—জননীর কাছে বল্‌তে গিয়ে ভক্ত পান্ বাধা, "আমাকে শুনিও না, স্বপ্নাদ্য ওষুধ বলতে নাই।"

বাংলার মেয়ে পালন করছেন গৃহধর্ম্ম...জগৎকে দেখাচ্ছেন গৃহীর চরম আদর্শ···আপন সন্তান শরৎ মহারাজ—তাঁকেও দিচ্ছেন সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা, সন্ন্যাসী যে বেদশীর্ষ। দূর হতে কোন ভক্ত দেখেছেন শরৎমহারাজের সদ্য পরিত্যক্ত আসনখানি মা বার বার স্পর্শ

করেছেন আপন মাথে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ভাবেন ভক্ত, সহসা জননীর কেন এ ভাবান্তর? বল্লেন জননী—"বাবা কত ভাগ্যে গেরস্তের দরজায় সাধুর পায়ের ধূলো পড়ে। সাধুর আসন তো মাথায়ই রাখতে হয়। আমরা গৃহী আমাদের এই তো ধর্ম্ম।" কি আশ্চর্য্য! তীর্থ হতে আগত ছেলেকে বলছেন "আহা পুণ্য তীর্থ সব সাধু কি কম গা? কত সব জায়গা ঘোরে। যেখানে যেখানে গিয়েছ, আমাকে এক এক অঞ্জলি জল দিয়েছো তো? যেখানে যেখানে যাও আমাকে তিন তিন অঞ্জলি জল দিও।" বলছেন আর বার বার জানাচ্ছেন সশ্রদ্ধ নাতি সুদূর তীর্থের উদ্দেশে...কত সময় বেদশীর্ষ সন্ন্যাস ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা দিতে গিয়ে আপনাকে করেছেন দীনাতিদীন...বেদশীর্ষ ধর্ম্মকে বেদমাতা ছাড়া আর কেই বা দেবে বিজয় মাল্য—সম্মানের মণিহার? "ঠাকুরের কৃপা—যাঁরা পেয়েছেন, গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন তাঁরা তো সকলেই সমান সকলেরই তো একই গতি হবে?" সন্তানের সংশয় সঙ্কুল প্রশ্নকে জননী করেন তীব্র আঘাত..."সে কি বলছ? তা কি কখন হয়? দেখতে পাচ্ছনা, আমি এদের সব নিয়ে আছি ব'লে তাঁকে ডাকবার সময় পাচ্ছি না। সন্ন্যাসীতে গেরস্তে আকাশ পাতাল তফাৎ! গেরুয়া প'রেছে, সংসার ছেড়েছে ভগবানের জন্য; আর এরা সব নিয়ে আছে ব'লে ভগবানের দিকে মন দিতেই সময় পায় না..."। বৈধী তপস্যা ছাড়াও জীবনের প্রতিটী ক্ষণ যাঁর দুঃখের তপস্যার দহন দিয়ে ভরা, তাঁর মুখে এ কথা শুনে শুধু তাঁর মহতো-মহীয়ান আদর্শের দিকে চেয়ে থাকতে হয় অপার বিস্ময় নিয়ে। মহামায়া নিজে মান দিয়ে, দিলেন সমস্ত সাধু সমাজকে এগিয়ে চলার মন্ত্র,—সন্ন্যাসী যেন পায় তার পবিত্র সন্ন্যাস মার্গের প্রতিষ্ঠা...

তাই বুঝি সন্ন্যাসিনী মেয়ে গৌরদাসীর কথাগুলি সহজে পারতেন

না ঠেলতে। বহু কৃপাপ্রার্থীকে তাঁরই কথায় করেছেন দীক্ষিত, এমনকি কত সময় তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছেন—কৃপাপ্রার্থীকে কোন ইষ্টমূর্ত্তি নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া হবে সমীচীন। তাঁকে অবলম্বন ক'রে কত না লীলা হয়েছে। ভক্ত এসেছেন, পূজা ভোগের উপায়ন নিয়ে। জননীকে দেবী প্রতিমার মত বসিয়ে কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়েছেন শুভ্র যূথীর মালা, আর শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিয়েছেন রাশি রাশি গোলাপ আর জবা··· তারপর কম্পিত হাতে মা'র শ্রীমুখে ধরেছেন নৈবেদ্যের থালা···। কাছেই ছিলেন গৌরীমা। লীলারস উপভোগ করতে গৌরী মা ছিলেন চিরদিনের লীলাময়ী, হেসে বলছেন, "এবার শক্ত ছেলের পাল্লায়—এখন দেখা যাবে না খেয়ে কি করে ওঠো মা।" নিরুপায় বালিকার মত মা গ্রহণ করলেন সব জিনিষ একটু একটু······তারপর মৃদু হেসে নিজের কণ্ঠের মালাখানি দুলিয়ে দিলেন গৌরীমা'র কণ্ঠে···। তাঁকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরেও সে কত বুক ভাঙ্গা লীলা, সে তো ভোলা যায় না ···আর গৌরীমা'র কাছে মা'র স্থান যে কোথায়—তা বোঝা যায় তাঁর কথায়, তাঁর ব্যবহারে···ঠাকুর তখন দেহে। একদিন শুধান ঠাকুর, "ব'লত মা তুই কাকে বেশী ভালবাসিস ?" লীলাময়ের সঙ্গে লীলায় গৌরীমা'র কণ্ঠে জাগে গান, হাসিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠে বলেন,—

"রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী
লোকের বিপদ হ'লে ডাকে মধুসূদন বলে
তোমার বিপদ হ'লে পরে
বাঁশীতে বল রাই কিশোরী।"

ঠাকুরের মুখেও লীলার হাসি, বলেন, "না বাপু, তোর সঙ্গে আর পারিনি।" আর মা তখন ব্রীড়ানত সলজ্জ বধূটী। কুণ্ঠায় আকুল

হয়ে শুধু চেপে ধরেছেন গৌরীমা'র দুটি হাত। এমনি কত লীলাই হয়ে গেছে···। যখনই বলেছেন এই সন্ন্যাসিনী মেয়ের কথা, বলতে গিয়ে যেন কথা হয়ে উঠেছে অফুরান। "এই যে গৌরদাসী সন্ন্যাসিনী, মেয়েদের ত' সন্ন্যাস নাই—গৌরদাসী কি মেয়ে? ওত' পুরুষ—ওর মত কটা পুরুষ আছে? ঠাকুর বলতেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাস নেয় সে কখনও মেয়ে নয়, সেই তো যথার্থ পুরুষ।"

সন্ন্যাসীর ছদ্ম বেশেও একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গৌরীমা—জয়রামবাটীর দেউল দ্বারে, সন্ধ্যার আব্ছা আঁধারে—ভিক্ষু সন্ন্যাসীর মত চেয়েছিলেন ভিক্ষা। সে এক রঙ্গময় দৃশ্যের অবতারণা। পুরুষ-বেশী গৌরীমাকে গৃহাঙ্গনে দেখে চীৎকার করে ওঠেন ছোটমামী—। আর মা, তিনি কিন্তু ঠিক চিনেনেন তাঁর আদরিণী দুহিতাকে···এই পুরুষবেশের আড়াল দিয়ে গৌরীমা জগতের বহুলোকের দৃষ্টি এড়ালেও মায়ের সন্ন্যাসিনী মেয়ে মাকে পারেননি চাতুরীতে ফেলতে··· খাঁটী সন্ন্যাসীর মর্য্যাদার আসন মায়ের কাছে ছিল মাথার মণি। তাই সেই সন্ন্যাসীর মাঝে এতটুকু কলুষের হাওয়া লাগলে হয়েছে তাঁর অসহনীয়···। জনৈক সাধুর মনে জমে উঠেছে বৃথা ক্রোধ···সহ্য হয় না জননীর। সম্যক ন্যাস আদর্শের মাঝে একি অভিমানের কলঙ্ক রেখা? বিদ্যুৎবর্ষী নয়নে বলে ওঠেন মা······"বামুনের ছেলে সন্ন্যাসী হলে হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়। আর সন্ন্যাসীর রাগ অভিমান থাকলে বেতের রেক্ চামড়া দিয়ে বাঁধানো হয়। ত্যাখনা তার কি হয়।" মায়ের তীব্র ভর্ৎসনা বাণী হয় সফল—, অপরাধী সন্তানকে ত্যাগের গৌরব গৈরিক পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে হয়—সংসারের আবিল বক্ষে···

মনে পড়ে কামারপুকুর শ্রীধামে এসেছেন উৎকল দেশীয় এক প্রাচীন

সাধু...তখন শ্রীঠাকুর করেছেন লীলা সম্বরণ···জননী· একাকিনী কামারপুকুরবাসিনী। সত্যিকার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিনা? তাই বুঝি মূর্ত্তিমতী জগন্মাতা নিজেই গ্রহণ করলেন তাঁর সব ভার। সর্ব্বহারা রিক্ত ছেলের জন্য পল্লীর ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা নিজেই করছেন ভিক্ষা··· নিত্য যোগাচ্ছেন তাঁর ক্ষুধার অন্ন···তাঁর যোগক্ষেম সবকিছু করেছেন বহন...পল্লীদুলালদের দিলেন সাধুসেবার প্রেরণা—দিলেন উৎসাহ···। ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর জন্যে বেঁধে দিতে হবে ছোট্ট একটি কুঁড়ে—যাতে নিশ্চিন্ত মনে সন্ন্যাসীর দিনগুলি হয় অতিবাহিত একান্তে ভজন আরাধনে, তাই হল—সকলের উৎসাহ চেষ্টায় নির্ম্মিত হল ছোট্টসুন্দর একটি পর্ণকুটীর...সেটুকুর জন্যেও দেখি জননীর কি আকুলতা... একদিকে তৈরী হ'তে থাকে সাধন কুটীর—আর প্রতিদিন আকাশ ভ'রে দুলে ওঠে মেঘের জটা...গর্জ্জে ওঠে বজ্র ভৈরবের কণ্ঠ···আর মহামায়া দুটি হাত জোড় ক'রে তিমির ঘেরা মেঘের পানে করুণ কাজল চোখদুটি তুলে জানান অশ্রুসজল মিনতি, "রাখ গো ঠাকুর রাখো, আগে সারা হোক তোমার চরণাশ্রিতের ঠাঁইটুকু—তারপর ঢেলে দিও যত খুসী" সত্যিই দেখা যায় এই মিনতিটুকুর শেষে ফিরে যায় মেঘের দল। দেখতে দেখতে কুটীর খানিও হয় সম্পূর্ণ··· সন্ন্যাসীরও মেলে শেষের দিনের আশ্রয় জননীর স্নেহচ্ছায়ে। দুটি বেলা মা খোঁজ নেন, কুটীর দ্বারে এসে—"সাধু বাবা কেমন আছ গো?" তাঁরই ত' দায়—সাধু বাবা কুশলেই থাকেন। আর একদিন সেই পরমাশ্রয়েই শেষ নিঃশ্বাস রেখে তিনি ধরণীর খেলাঘর থেকে নেন চিরবিদায়।

এমনি করে চরম দুঃখের দিনও মহিমময়ী জননীর সেবার রূপটি ছিল সমভাবেই সমুজ্জ্বল...সেখানে বিচারের ছিল না স্থান। সাধু সন্ন্যাসী, পল্লীর দীনদরিদ্র সকলেই সন্তান, সকলেরই সেখানে সমান

আসন···কোন ভক্ত হয়তো সন্ধ্যায় এসে দেখেছে এক স্বর্গের দৃশ্য··· জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে প্রদীপের আধো আলো কাঁপা একটি গৃহকোণে বসেছে যেন একটি ছোট্ট সভা। বসেছেন জননী, কর্ম্ম অবসরে, ছোট্ট একটি চৌকীর ওপর চরণ দুলিয়ে, আর পায়ের নীচে ঘিরে বসেছে পল্লীর যত কৃষকমজুর ছেলেমেয়ের দল, আর কইছে খুঁটিনাটি যত দুঃখ সুখের কথা—তাদের মায়ের সাথে। মাও তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুখী হয়ে, নিচ্ছেন তাদের ঘর সংসারের খোঁজ খবর। কলকাতা থেকে আগত ভক্ত, সহরের আলো চোখে মেখে এসেছেন বিশ্বজননীর দর্শন কামনায়। জানিনা জননীর কি রূপের কল্পনা ছিল তাঁর মানস লোকে...কিন্তু এসে স্তম্ভিত হয়েই দেখেছিলেন—বুঝি বুঝেছিলেন এইতো বিশ্বজননীর প্রকৃতরূপ। বিশেষ করে দীন ভারতের দরদী কল্পনা বুঝি একে আর ছাড়িয়ে যেতে পারে না—যে ভারতের অধিকাংশ সন্তানই চিররিক্ত কৃষক মজুর, মধ্যবিত্তের দল। তাই শুনি জননীর মুখে, "ভগবান যখন আসেন তখন শিশু আর গরীবের ভিতর দিয়েই আসেন।" জয়রামবাটীর অধিবাসী যে জেনেছিলেন ভাল ভাবেই তাদের গাঁয়ে আছে এই একটি শান্তিনীড়, যেখানে মিলবে তাদের জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয়··· মিলবে রোগের ঔষধ, শোকের সান্ত্বনা, ক্ষুধায় অন্ন, দুঃখে সমবেদনা —তাইতো তা'রা আসতো ছুটে···

কোনদিন হয়তো এসেছে দীনদরিদ্র মাঝি বউ···মায়ের দৃষ্টি এড়ায় না, তার মলিন মুখখানিতে যে ব্যথার ভাষা লুকিয়ে ছিল, দৃষ্টিমাত্র তা নিয়েছেন জেনে,—"এতদিন আসনি কেন, মাঝি বউ?" সোহাগ ছোঁওয়ায় দুলে ওঠে মাঝি মেয়ের শোকের সায়র—কেঁদে জানায় তার দুঃখের কথা—একটি মাত্র জোয়ান ছেলে—ভবিষ্যতের আশার প্রদীপ,

দীনের একমাত্র সম্বল—অকাল মৃত্যু করাল গ্রাসে নিয়েছে টেনে... জননীর কণ্ঠ ভেঙ্গে জাগে আর্ত্তনাদ, "বল কি মাঝি বউ ?" তারপর আকুল হ'য়ে কাঁদেন জননী তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে·· সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য···সহসা মায়ের আর্ত্তক্রন্দনে সকলে আসে ছুটে—বাণীহারা মুখে চেয়ে দেখে, চোখের পলকও যায় বুঝি হারিয়ে। মাঝি বউ কাঁদল বুক ভ'রে, আর কাঁদল মায়ের সাথে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সে যে নিয়ে গেল গভীর সহানুভূতি দিয়ে গড়া এক সুনিবিড় শান্তি তার বুঝি তুলনা নাই—সেই শান্তিই হয়তো সারা জীবনের সমস্ত দুঃখের গ্লানিকে দিল ধুয়ে মুছে।···যাবার সময় সে পেল আঁচলভরা প্রসাদ আর পেল মায়ের করুণ কণ্ঠের আহ্বান, "আবার এসো মাঝি বউ"—ভরা প্রাণেই সে গিয়েছিল ফিরে। এমন কি ধনীভক্ত বহুল কলকাতার উদ্বোধনেও এই একই রূপ—মা জননীর। দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে ভিক্ষুক—শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। কোন দিন ফিরাতে পারেন না মা ; সেদিন কিন্তু নীচে কোন সাধুর কঠিন তিরস্কারে আহত হয়ে ভিখারী যায় ফিরে... জানতে পারেন মা—পথের ছেলে এসে চেয়েছে ক্ষুধায় অন্ন, আর তার পরিবর্ত্তে পেয়েছে অপমান আর তিরস্কার—সে ব্যথা কেমন করে সয় মা'র প্রাণে ?—কঠোর আদেশ হল ধ্বনিত—যেখান থেকে হয় ফিরিয়ে আনতে হবে ভিখারীকে। জনবহুল সহরে কে জানে কোথায় হারিয়ে গেছে সেই এক নাম গোত্রহীন দীন ভিক্ষুক ? কে তাকে চিনে রেখেছে ? তবু আনতে হবে। চতুর্দ্দিকে অন্বেষণের পড়ে যায় সাড়া না হ'লে জননী হবেন রুষ্টা···অবশেষে বহু অনুসন্ধানে মিলল তা'র খোঁজ—সকলে মিলে যখন নিয়ে এল তাকে মাতৃসন্নিধানে—মায়ের বুকেও তখন পরমতৃপ্তি, ক্ষুধার্ত্ত ছেলের মুখে অমৃত পাত্রটিকে ধ'রে দিয়ে।—

জগদ্ধাত্রী পূজার দিন দীনদরিদ্র ভক্ত জানিয়েছেন, যদি মা কৃপা ক'রে অধম সন্তানের বাড়ীতে একটি বার চরণধূলি দেন···সেখানেও ছুটে গেছেন জননী। অতি ক্ষুদ্র ভগ্নগৃহে একান্ত স্থানাভাব-সংকীর্ণ ঘরখানিতেই মা বস্‌লেন, ভক্তসঙ্গে আসনখানি পেতে; প্রসন্নমুখে··· দীন ভক্ত হ'য়ে গেছেন আজ ধন্য—কৃতকৃতার্থ।···জননীর শ্রীচরণ দুটি ধুইয়ে দিয়ে সে পূতচরণামৃত রেখে দিয়েছেন যত্ন ক'রে।···ভক্তের বৃদ্ধ জননী জানান আকুতি—"মা আশীর্ব্বাদ কর আমার ছেলেকে, ওর পূজা করবার বড় সাধ, কিন্তু বাড়ীঘর কিছুই নেই।" ইত্যাদি··· চিরদিনের আন্তরিকতার বাণী জননীর শ্রীমুখে—তাতে মেলে দুইই; আশীর্ব্বাদ আর সান্ত্বনা। "আহা তা বেশ করেছে। মা যখন এসেছেন তখন বাড়ীঘর সব হয়ে যাবে; তোমার ছেলেটি বড় ভাল, খুব ভক্তি আছে" তা'রা আনে দীন উপচার—মাও প্রসন্নমুখে গ্রহণ করেন। তারপর কত প্রশংসা। দীনের বুক ভ'রে ওঠে—অপার করুণায়। "প্রতিমা খানি বড় সুন্দর হয়েছে। চমৎকার মুখের ভাব ভক্তের পূজা কিনা?" দীনের পূজাকে এমন মান আর কে দেবে—দীন জননী ছাড়া? এমন করে উপচারহীন আঁধার ঘরের উৎসবে আর কেই বা এসে দাঁড়াবে—আলোর আলো···ছাড়া?··· সে স্বীকৃতিও পাওয়া যায় জননীর মুখে "মা দুর্গা কৃপা করে ওর বাড়ীতে এসেছেন।"...এই আমাদের বিশ্বজননী পল্লীমায়ের রূপ। আবার মহালক্ষ্মীই গৃহের গৃহলক্ষ্মী—অপূর্ব্ব কর্ম্মময় জীবন। স্বামী প্রেমানন্দের ভাষায় "রাজ-রাজ্যেশ্বরী সাধ করে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজ্‌ছেন—সংসার যে কর্ম্মক্ষেত্র, সে আদর্শ পূর্ণভাবে দেখিয়ে গেলেন মা সারদা...মহামায়ার কাজের শেষ নাই।" ভক্ত মেয়েরা হয়তো চেয়েছেন, মাকে দেবেন না তাঁ'রা কোন কাজ করতে। তাই ভোর না হতেই তাড়াতাড়ি

এসেছেন কাজ সুরু করতে কিন্তু একটু স্থানান্তরে যেতেই দেখেন, জননী ক্ষিপ্রতড়িৎহস্তে সে কাজ করে ফেলেছেন সম্পন্ন...শেষের দিকে দুর্ব্বল শরীরেও ঘটে নাই তার ব্যতিক্রম···স্নান করতে যাবেন, হঠাৎ যেন কোথায় চলে গেলেন—অনুসন্ধানরতা ভক্তসেবিকা—সবিস্ময়ে দেখেন গোয়ালের পিছনে চুপি চুপি দাঁড়িয়ে ঘুঁটে দিচ্ছেন—অথচ শরীর তখন একান্ত অক্ষম...কি আকুতি—পাছে ছেলেদের হবে কষ্ট, তাই অক্ষম দেহেও করছেন তাদের কর্ম্মভার লাঘব। ভক্ত মেয়ে দুঃখ জানালে বলেন, "তাহোক সবাই তো কাজে কর্ম্মে আছে মা, আমিই দিয়ে দি।"

অলসজীবন ছিল জননীর একান্ত উপেক্ষার। বার বার বলেছেন, "কর্ম্মলক্ষ্মী"। এই তো এ যুগের বাণী—এই তো যুগের মন্ত্র। অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ধ্যানতন্ময় বৈদিক যুগ। আজ মানব-চিত্ত সংযমের শৃঙ্খলহারা। তাই ব্যাহ্যিক নৈষ্কর্ম্ম্য তাকে দেবে বৃথা অলসচিন্তার ইন্ধন মাত্র। তাই জননী নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন এ যুগের মর্ম্মবাণী...বিশেষ করে যে কর্ম্মের মাঝে গঠিত হবে আদর্শ মাতৃজাতি—তা'রি মূর্ত্ত প্রতিমা দেখি জননী সারদাকে। বলেছেন সরল গ্রাম্য ভাষায় "মেয়ে মানুষের কাজই লক্ষ্মী। আমার মা বলতেন, যে খুব ভাল ক'রে রেঁধে বেড়ে লোকজনকে খাওয়ায় তার ঘরে মা অন্নপূর্ণা অচলা হয়ে অবস্থান করেন। আমার মা লোক-জনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন।" ভক্ত মেয়ে বল্লেন, "তাই বুঝি মা তুমি এসেছিলে তাঁর ঘরে?" গোপন স্বরূপিনী একটু হেঁসে শুধু বলেন, "আমি কে মা—? ঠাকুরই সব।"

এই আমাদের কল্যাণী মা—যে গৃহে যখন থেকেছেন সেই গৃহই যেন হয়ে গেছে লক্ষ্মীর আবাহন গেহ। গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি

বস্তুকে দিয়েছেন তা'র যোগ্য আদর, তাই স্বল্পেই হয়ে গেছে পূর্ণতায় উচ্ছল। কখনও কেউ দেখেনি মায়ের হাতে কোন কিছুর বৃথা অপচয়—সে লক্ষ্মীমন্ত হাতে হয়নি কারো অমর্য্যাদা—হয়নি কিছু নষ্ট···বলেছেন, 'যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।" বলেছেন, "অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন।" গৃহমার্জ্জনার অবশেষে সম্মার্জনীটিকেও যদি কেউ রেখেছে ছুঁড়ে নিতান্ত অবহেলায়—সে অবহেলাটুকুও মা'র প্রাণে বেজেছে। তিরস্কার করেছেন, কি-না, "কাজ হয়ে গেল আর অমনি তাকে করলে অবহেলা···" সযত্নে তুলে রেখেছেন তাকে স্বস্থানে···।

এমনি করে সর্ব্বংসহা কল্যাণী হাসিমুখে করে চলেছেন স্বকার্য্য-সাধন। গভীর দুঃখ বরণ করে নিয়েছেন, সহজ প্রাণের আনন্দ দিয়ে—গভীর হতেও গভীর আবার সহজ হতেও সহজ। কত সময় ফুটে উঠেছে এই সরল মধুর ভাবটি। নিজেই যেমন বলেছেন ঈশ্বরের ভাবের উপমা দিতে গিয়ে, "ঈশ্বর বালকস্বভাব কিনা—কেউ চাচ্ছে তাকে দিচ্ছেন না—আর কেউ চাচ্ছে না তাকে দিচ্ছেন।" তেমনি সেবায় উদগ্র স্বজন, ভক্তদের মাঝে জননীর এক এক সময় ঝোঁক পড়ে তাদের পানে, যাঁ'রা হয়তো চায় একটু স'রে থাকতে। চার পাশে রয়েছে সেবকবৃন্দ, সকলকে ছেড়ে—ছোট্ট একটি ছেলে, তাকে বলছেন মা, "দে বাবা চারটি ফুল তুলে—লক্ষ্মীধন আমার।" ছেলেটি কিন্তু নারাজ। তা'র মোটেই ইচ্ছা নাই, মা'র কথা শোনবার। বলছে, "না আমি পারব না।" মাও নাছোড়। "দে বাবা চারটি ফুল তুলে দে।" ছোট্ট মেয়ের যেমন যখন যা আব্দার ধরবে সেইটিই হওয়া চাই পূর্ণ। তেমনি করেই মা ধরেছেন আব্দার—শেষে সেই আব্দারই হ'ল জয়ী—ছেলেটি তুলে দিল ফুল।—

চরণ দুটি সেবা করতে ভক্ত সেবিকার দলে পড়ে যায় কাড়াকাড়ি

...রঙ্গময়ীর কি রঙ্গ কে জানে ? তাদের না ব'লে বলছেন্ গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধাকে, "দে মা পায়ে একটু হাত বুলিয়ে—পা টা বড় কামড়াচ্ছে।" বৃদ্ধার কি মতিভ্রংশ—ঝাঁঝিয়ে ওঠে মায়ের কথায় ; —"আমি পারব নি বাছা।" তবু মায়ের সেই এক মিনতি—কি আকুতি বলছেন, "দে মা পায়ে একটু হাত বুলিয়ে।" বৃদ্ধা দেয় জবাব, "সমস্ত দিন গেল, আর এই রেতের বেলা পায়ে হাত বুলিয়ে দাও। আমি আর পারিনি !" আজও মায়ের সেই আব্দারের ভঙ্গী—"দে মা একটু হাত বুলিয়ে—কি আর করবি বাছা বল।" অবশেষে বৃদ্ধার হাতেই আগ্রহ ভরে যেচে নেন তা'র হেলায় ভরা একটুখানি সেবা... জানি না ভাগ্যবতী প্রাচীনা কে ? যাকে অহেতুক কৃপা করবার জন্য বালিকা স্বভাবা জননীর এত ব্যাকুলতা...

জননীর দেব জীবনে এমনি ছোট ছোট রঙ্গ পরিহাসের মাঝেই হয়তো কত সময় প্রকাশিত হয়েছে—কত গভীর উপদেশ, কত ঐশী-শক্তি ভরা লীলামাধুরী। জননী তখন কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে। কিছু দূরে একটি বাড়ীতে, মানস কন্যা রাধু অসুস্থা—তাকে নিয়ে আছেন নির্জ্জনে একান্তে...সেদিন সরল বালিকার মত বলছেন জননী, "আজকাল মনের কি যে হয়েছে—যা চিন্তা ওঠে তাই উপস্থিত হয়, তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক।" ভক্তেরা দেখে সত্যই তাই। তা নাহ'লে কোয়ালপাড়া দিক সীমান্তে কখন কেউ দেখেনি বন্য জন্তর আকস্মিক আবির্ভাব—সেই কোয়ালপাড়াতেই সেই নির্জ্জন বাড়ী-খানিতে সহসা একদিন মনে উঠলো মা'র, অজানা ভয়ের সম্ভাবনা—কথায় কথায় প্রকাশও করেন ভক্ত সকাশে—"যে জঙ্গল, কোনদিন ভালুক না বেড়িয়ে পড়ে।" নির্ভয় বিশ্বাসে বলে ওঠেন সন্তান—"কই মা এদিকে ত' কখনও ভালুক দেখিনি" কিন্তু এক মাইল দূরে

দেশড়ায় সত্যই সেদিন হল বন্য ভালুকের আবির্ভাব—মা'র কথা ত' সত্য হতে হবে।

আবার সেদিন আষাঢ়ের মেঘসজল রাত্রি—একটি বৃক্ষতটে উপবিষ্টা মা ভক্তসঙ্গে···সহসা বলে উঠলেন, "ত্থাখ, সে পাগলটা কই অনেকদিন আসেনি। বদ্ধপাগল—গানটান গুলি কিন্তু বেশ গায়।" পাগল ছেলেকে স্মরণ করছেন জননী, আবার দেখাচ্ছেন নারীসুলভ ভয়, "তবে বড় ভয় করে বাবা, পাছে এখানে চেঁচিয়ে মেচিয়ে ওঠে।" সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে শিউরে উঠে জনৈকা সেবিকা···"আর তা'র নাম কেন মা? যদি এখন এসে পড়ে—এই রাত্রি বেলায়?" সেবিকার মনে ভয় পাছে পাগল এসে ঘটায় কোন অঘটন। মা শুধু বলেন, "কে জানে মা" ...কথা শেষও হয় না—সবিস্ময়ে আর সভয়ে ভক্তদল দেখেন সত্য সত্যই পাগল এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে মায়ের কাছে—হাতের নীচে এক বোঝা সজিনা শাক—বলছে মাকে, "তোমার জন্যে সজিনা শাক নিয়ে এলাম"...ভক্ত সেবিকা পালায় সন্ত্রস্ত হয়ে...ভক্তদল অবাক, এই গভীর রজনীতে বর্ষার দুরন্ত নদী পাগল পার হল কেমন করে···? যাই হোক ভক্তদের মুখ চেয়ে মা তাকে অনুরোধ করেন স্থানান্তরে যেতে। সে জানায় আপত্তি—"যাব কি করে? নদীতে বান যে।" "তবে এলি কি করে?" ভক্তদের প্রশ্নে উত্তর দেয় পাগল—খুব সহজ কথায়, "সাঁতরে পার হয়ে এসেছি।" কারো মুখের কথা আর সরে না। যেন মায়ের স্মরণের আকুল টানে ছুটে এসেছে পাগল—এই গভীর রাতে বানের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে তার জীবনের সব ভয়...। মায়ের মুখে, "লক্ষ্মীটি গোল করিস্‌নি"—এই মধুর কথা শুনে সে তখনকার মত চ'লে যায় স্থানান্তরে...ভক্তেরাও পায় স্বস্তি—

এই কোয়ালপাড়ার মঠে সেদিন হ'ল মায়ের এক অভিনব দর্শন···

ছায়াচ্ছন্ন আশ্রমবক্ষে নেমে এসেছে নিঝুম মধ্যাহ্নের মায়া…আপন মনে থাকার এই নিরালা অবসরে সবাই আছে আপন আপন কাজে… সহসা আঙিনা বক্ষে শোনা যায় মা'র কণ্ঠ—কেমন যেন অস্ফুট আকুল স্বরে বলে ওঠেন, "ঠাকুর!" তারপর সব চুপ…ছুটে আসে আশ্রম-বাসিনী জননীরা…দেখে এলায়িত দেহে মা লুটিয়ে পড়েছেন, ধরণীর ধূলি শয্যায়—বিস্রস্ত কেশভার ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক…মা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা…আকুল হয়ে ঘিরে বসেন সেবিকার দল…সযত্ন চেষ্টায় ফিরিয়ে আনেন মা'র লুপ্ত সংজ্ঞা…"সহসা কেন মা এই অঘটন?" ভক্তদের ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে তখনকার মত তাদের করেন শান্ত, ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে সামান্য মাথা ঘুরে গিয়েই নাকি হয়েছে এই অঘটন। কিন্তু পরে কোন মর্ম্মী ভক্তের কাছে হয় আসল লীলার প্রকাশ…সেদিন তপ্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—ঠাকুর নিজে—সোনারবরণ বরতনুখানি ছিল তখন স্বেদ-জলে উছল। এসেই যেন কত শান্তিতে ক্লান্তিতে দেহখানি লুটিয়ে দিতে চাইলেন সেই ধূলিধূসর আঙিনার একটি কোণে…তাই কি প্রাণে সয়? হৃদয়আসন তাঁর তরে তো নিত্য বিছানো—তবে কেন এ ছল? কে বুঝবে এ লীলা! তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন মা—"যাই বিছিয়ে দি আমার আঁচলখানি—" জানিনা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল কি-না— 'আধো আঁচল'। বুঝি তা'র আগেই বিছিয়ে দিয়ে অঙ্গখানি, মা লুটিয়ে পড়েছিলেন ভূমিতলে, হয়ে পড়েছিলেন সম্বিৎ-হারা।—মরমীর চলার পথে তনুর তনিমা বিছিয়ে দেওয়া—প্রেমের তীর্থে সে যে চিরদিনের কামনা…

"যাব পঁহু আধচরণে চলি যাত
কাহে চরণক বিঘনি পরাণ ন লেত।"

প্রেমের এই আকুতি যে চিরন্তন···আর শ্রীঠাকুর—হয়তো যুগচক্র পরিচালনার যে শ্রান্তি তা জুড়াবার ঠাঁই পেয়েছিলেন এই অঞ্চলতলে।

করুণ হতেও করুণ কোমল হতে অতিকোমল প্রেম দিয়েই তো গড়া মরমীর দেবতনু খানি—সে তনুতে ফুলের আঘাতটুকু দিতেও যেন বাজে বুকে...তাই দেখি ভারী গড়ের মালা ঠাকুরের গলায় দিতেও মায়ের জাগে আপত্তি, "মতিকে বোলো—এত ভারী মালা যেন না দেয়, ঠাকুরের ভারী লাগবে।"

ধরণীর লীলা যতই আসে ফুরিয়ে—অধরার লীলা ততই হয় ঘনীভূত। অবশ্য ঠাকুরের অদর্শনে বিরহের মাঝে নিত্যমিলনের ছোঁওয়াটুকু ছিল চিরন্তন, একথা চিরসত্য—তা নাহ'লে কলকাতার প্রথম মাতৃ-মন্দিরে শুভাগমন কালে শ্রীঠাকুরের মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত তাঁর শয়ন মন্দির দেখে কেন জানালেন আপত্তি—"ঠাকুরকে ছেড়ে আমি কি থাকতে পারি? আমাকে ঠাকুর ঘরেই দাও।" তবু মনে হয় যতদিন যায়, শেষের দিন যতই আসে ঘনিয়ে—ততই জ'মে ওঠে অলখ দেবতার সাথে নিত্যলীলা,—দর্শন, কথা, চাওয়া—পাওয়া—সবই হয়ে ওঠে অবাধ। প্রত্যক্ষ দেখেন, নিবেদিত ভোগ ঠাকুর নিলেন কি-না? ঠাকুর গ্রহণ না করলে সে বস্তু নিজেও করেন না গ্রহণ—পরে দেখা যায় সত্যই সে বস্তু নিবেদনে আছে বিশেষ বাধা কোনদিন হয়তো ভক্তকে প্রসাদ দিতে এসেছেন—খিঁচুড়ি প্রসাদ, তাঁ'র দিক থেকে আপত্তি শুনে বলছেন, "একটু খাও স্বয়ং ঠাকুর খেয়েছেন।"···ভক্ত শুধান, "ঠাকুরকে কি দেখতে পাওয়া যায়?" বলেন মা "হ্যাঁ আজকাল মাঝে মাঝে এসে খিঁচুড়ি আর ছানা খেতে চান।" আবার কোন সন্ন্যাসী ছেলে হয়তো করেছেন প্রশ্ন, "মা, ঠাকুরকে তো ভোগ নিবেদন করি, কিন্তু তিনি খান কিনা—কিছুই বুঝতে পারিনা।"

আশ্বস্ত করেন জননী, "খান বইকি বাবা; প্রাণের ভিতর থেকে নিবেদন কল্লে নিশ্চয়ই খান। আমি যখন গোপালকে খেতে দিয়ে আদর করে ডাকি, তখনই দেখি গোপাল নুপূর পায়ে ঝুনঝুন করে এসে হাজির হয়, আর আব্দার করে খায়।"

বিদায় মুখে চলে যেন অসীম সীমার জোয়ার ভাঁটার খেলা—যত এগিয়ে আসে নিত্য লোকের আহ্বান তত লীলার লোকে অফুরাণ হয়ে ওঠে কৃপার পাত্র··নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার আকাঙ্খায় আকুল। পুণ্য জন্মতিথি দিবসেও ছিল না কৃপাপ্রার্থী আগমণের বিরাম। যে এসেছে সেই পেয়েছে পবিত্র নাম···আর দু'হাতে ঢেলে দিয়েছে গুরুদক্ষিণা তাদের ভোগরাশি। মা'র শ্রীমুখে শুনি কোন বার জন্মতিথির কথা..."দীক্ষা ত আর হ'ল না—কাল জ্বর এসে গেছে, জ্বর ছাড়ে নাই। কাল সকাল থেকেই শরীরটা একটু খারাপ ছিল—মনে কল্লুম স্নান করব না। তারপর ভাবলুম জন্মতিথি স্নানটা করি—বাবা, প্রথম মনের কথা শুনতে হয়, সেই ঠিক বলে।"

১৩২৪ সালের ২০শে পৌষ জন্মতিথি দিবসের জ্বর মা'র দেবদেহকে ক'রে তোলে আরও শিথিল—তবু নাই বিশ্রামের অবকাশ, কি দৈহিক—কি মানসিক। সারাটি দিন কাটে ভক্ত সেবায়, আর ভক্তকে কৃপা বিলাতে—আর সারা নিশি জাগরণ হয়, প্রতিটি ভক্তের হয়ে তাঁদের ইষ্টমন্ত্র জপে—তাদের ইষ্টের ধ্যানে—তা'রা যে অক্ষম···। ছেলে ঘুমাচ্ছে—ঘুমাক, তা'র শিরে জাগতে হবে মা'কে··সেই আদর্শ'ই যেন দেখাতে এবার আসা...কিন্তু কোমল দেবতনু আর কত পারে সইতে? ক্রমাগত প্রবল জ্বরে দেহ হয়ে আসে ক্ষীণ। আর তার ওপর একটির পর একটি নিভে যায় শ্রীঠাকুরের নিজের হাতে জ্বালানো দ্বাদশদীপের দিশারি শিখা। সে ব্যথা যেন মাতৃহৃদয়কে ক'রে জর্জ্জরিত।

১৩২৫ সালের ১৪ই শ্রাবণ বিদায় নিলেন স্বামী প্রেমানন্দ—"একে একে নিবিছে দেউটী"। আকুল হয়ে কাঁদলেন জননী···হায় ধূলার ধরণী আর কিই বা দিল ঐ দুরন্ত ব্যথা ছাড়া···আরো একটি বছর যায় কেটে—১৩২৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাসপ্তমীতে উদ্‌যাপিত হল জননীর শেষ জন্মতিথি—পুণ্য জন্মতীর্থ জয়রামবাটীতে।

সেদিন স্নানান্তে জননী পরিধান করলেন প্রিয় সন্তান সারদানন্দের নিবেদিত কাপড়খানি···সীমন্তে পরিয়ে দিলেন ভক্তমেয়েরা সিন্দুরবিন্দু আর চন্দন তিলক—আর গলায় দুলিয়ে দিলেন ফুলের মালা—তারপর সুরু হ'ল পুষ্পাঞ্জলি—সঙ্গে সঙ্গে কোথায় লুকালো সে রোগক্লিষ্ট দেহ—তা'র স্থানে যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লো রূপে অরূপ—মা'র ঐশীমূর্ত্তি···স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া সে দিব্যরূপে বুঝি চকিতে বিলিন হ'য়ে গিয়েছিল সমস্ত মানবত্ব·· রোমাঞ্চিত অঙ্গে দেখেন ভক্তদল প্রাণভ'রে···তারপর আবার ফিরে এল সেই সহজ সুন্দর দ্বিভূজারূপ···। সেই জন্মতিথি দিবস থেকে আবার সুরু হল বিরামহীন জ্বর...তারসাথে অবিরাম ধারায় চলল কৃপার বর্ষণ। শয্যালীন অবস্থাতেও অক্ষুণ্ণ রইল সব কিছু···তাঁর আদর্শ—তাঁর ভাব কিছুই হারালো না একটি ক্ষণের জন্যও...শরীর ভাল থাকলে ত' কথাই নাই—শরীর খুব খারাপ থাকলেও যথা সময়ে উঠে আবার হয়ত একটু শুয়ে নিতেন নিজেই যেমন বলছেন—"রাত তিনটে বাজলেই যেখানেই থাকি কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম।" এমনকি রোগশয্যাতেও আজন্ম লজ্জাশীলা জননী মাথার লজ্জাবাসটিকেও স্থানবিচ্যুত হতে দেন নি, কোন পুরুষ ভক্তের সাক্ষাতে···কোনদিন যদি হয়েছে অন্যথা—সেবিকাদের করেছেন তিরস্কার, কেন তা'রা মাথায় তুলে দেয়নি বাস··· আজীবন ঘৃণাই করে এসেছেন মেয়েদের নির্লজ্জ আচরণকে, ঘৃণা

করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে স্ত্রীস্বাধীনতাকে, সমাজে তাদের নির্ব্বিচার অবাধ মেলামেশাকে···। "পুরুষজাতকে কখনও বিশ্বাস কোরোনা অপর কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ ক'রে তোমার সামনে আসেন তাঁকেও বিশ্বাস কোরোনা।" এতখানি কঠোর বাণী না দিলে এ যুগকে বাঁচানো বুঝি দায় হবে। বুঝেছিলেন সভ্যতার নামে বর্ত্তমান আদর্শ মাতৃসমাজকে নিয়ে যাবে ভোগের কুটিল পথে—নিয়ে যাবে ধ্বংসের অগ্নি-গহ্বরে···। প্রকৃত নারীশিক্ষার যে আদর্শ, তার প্রকৃতি হবে অন্যরূপ—জননীর দিব্যজীবন যার পূর্ণপ্রকাশ···। মাতৃত্বের এই দিব্য আদর্শ গ্রহণ করে জগতে কবে হবে সত্যিকার মাতৃজাতির অভ্যুদয়···?

ধীরে ধীরে নেমে আসে আঁধার যবনিকা। বহুকঠিন নিয়ম নিগড় সত্ত্বেও গোপনে চলে কৃপা বিতরণ...মন্ত্রদানে কখন বা সেবার অধিকার দিয়ে। দরিদ্রকুলের কোন গৃহকল্যাণী এসেছেন ছুটে—শ্রীমায়ের কৃপা প্রাপ্তা···তখন কঠোর প্রহরায় মা'র দেউলদ্বার রাখা হচ্ছিল রুদ্ধ, যাতে না আসতে পারে বাইরের লোক...কিন্তু ভক্তের টানে আর ভগবানের আকর্ষণে বুঝি সবার ঘটে পরাজয়, তাই দৈবক্রমে সেইদিন থাকে না কোন প্রহরী···ভক্ত নির্বাধে এসে পৌঁছান জননীর চরণতলে—আর মাও জানান আহ্বান, "মা এসেছ বস মা ব'স।" তারপর দিলেন কৃপার সুযোগ, "দ্যাখ মা, ছেলেরা কখন এসে পড়বে বলা যায় না, আমার পা-টা একটু টিপে দাও তো—কেমন ব্যথা হয়েছে।"···আনন্দে অভিভূত ভক্তমেয়ে হয়ে পড়েন বিহ্বল, বুঝি মনে পড়ে জননীকে প্রথম দর্শনের দিন ঠিক এমনি ছিল কঠিন প্রহরা···কিন্তু সেদিনও ঠিক এমনি করেই মা দিয়েছিলেন পথের বাধা সরিয়ে—নিজে ডেকে দিয়েছিলেন দীক্ষা...সেই স্মৃতিই হয়ে আছে জীবনের পরম পাথেয়···

এমনি একটি নয়, দুটি নয়, গোপনে কৃপা পাওয়া ভক্তদলের ছিল না অভাব...। বিদায় মুখেও কখন হচ্ছে স্বরূপ প্রকাশ আবার কখনও বা হচ্ছে গোপনের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলা···। তাই বুঝি শেষ রোগশয্যায় জনৈকা রমণী তাঁকে জগদম্বা ব'লে স্তুতি করায় তীব্র কথার আঘাতে তাকে করেছিলেন নিরস্ত। আবার রাধুর প্রতি জননীর শেষবাণী শুনি, "তুই আমার কি করবি, আমি কি মানুষ?"··· মায়াচ্ছন্ন রাধু সত্যই চেনেনি তা'র দেবমাতাকে···অথচ তা'র কাছে আর তা'র উন্মাদিনী জননীর কাছে কতবার হয়েছে মা'র স্বরূপ প্রকাশ বলেছেন, "কত মুনিঋষি তপস্যা কোরেও আমাকে পায় না, তোরা আমাকে পেয়ে হারালি"···তবু চেনেনি তারা; জানিনা মহামায়ার ইচ্ছা, লীলার কোন পথ অবলম্বনে হয় পরিপূর্ণ। যে রাধুকে অবলম্বন করে চলেছিল ধরণীর লীলা, সেই রাধুর ওপর থেকে যেদিন তুলে নিলেন সমস্ত মন, সেদিন ভক্তদের চোখে নেমে এল আসন্ন বিদায়ের গোধূলি··· ভক্তদের বহুচেষ্টাতে—বহু আকুতিতেও ফিরে এল না সে মন। ঠাকুরেরই কথা, "যোগমায়াকে অবলম্বন করেই যে অবতার লীলা—" তাই যোগমায়ার বন্ধনটুকু ছিঁড়ে দিলেন মহামায়া, ধরণীর খেলাঘর থেকে বিদায় নিতে···। এর পরের কথা ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণের কথা বলতে গিয়ে কথা যায় হারিয়ে···ধরণী সদ্যমাতৃবিচ্ছেদবিধুরা, ক্রন্দসী ধরণী মাতৃহারা শিশুর মত আকুল—অশান্ত···চলে যাওয়ার পথের পানে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে...যেখানে মর্ত্যের রোদনকে ছাপিয়ে বেজে উঠেছে আগমনীর বোধন বাঁশী—নিত্য মিলনের বৃন্দাবন—রামকৃষ্ণলোকে···

জননীর চির আকাঙ্খিত সেই ধ্যানলোক—যেখানে বহুদিন পূর্ব্বেই হয়েছিল ক্ষণমিলনের অভিসার···আজ সে লোক আলোময়...

সেখানে মা আমার নিত্যলোকের নিত্য লীলাময়ী···রামকৃষ্ণ লোকের রাণী···। চিন্ময়ীর সেই রূপই তো শাশ্বত রূপ...তাই বুঝি সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ঋষির ধ্যানময় স্বপ্নলোকে আবির্ভূতা সনাতনী জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে বলেছিলেন—"তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখেছিলে সে দেহ মায়িক, এই দেখ আমি সেই রূপেই রয়েছি"···এর পর বহুদিন গেছে কেটে—সেদিন জয়রামবাটীর ভাঙ্গা পথের রাঙ্গা বুক ভেঙ্গে জেগে উঠেছে শুভ্র সুন্দর এক মন্দির শীর্ষ, উৎসব মুখর তার প্রশস্ত প্রাঙ্গন —দূরদূরাগত সহস্র সহস্র ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হ'চ্ছে জগৎজননীর জয় নিনাদ—'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে দিক মুখরিত···রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডারের দ্বার সেদিন লক্ষ লক্ষ ভুখারী শিবের জন্য উন্মুক্ত···হঠাৎ সেই মুখরিত উৎসবসন্ধ্যা যেন হয় সুরসুরভিত এক দীন ভিক্ষুকের কণ্ঠঝঙ্কারে। একতারার তারে ঘা দিয়ে সে গেয়ে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের প্রেরণায়—

"সেদিন ভিক্ষুশিবের সঙ্গী হ'তে,
শিবাণী তোর বাজেনি কি প্রাণে
আজ একি দেখি ওমা শুভঙ্করী
বিশ্বেশ্বরী তুমি বিশ্বেশ্বর বামে।"

নেচে নেচে তন্ময় ব্যাকুল কণ্ঠে সে গেয়ে চলেছে...মুহূর্ত্তের তরে থেমে যায় যেন সব কলরব। সমাগত ভক্তের নিমেষহারা লক্ষ আঁখি বুঝি হয়ে ওঠে অশ্রু উছল...মনে হয়, আজ যে প্রশস্ত উজ্জ্বল মর্ম্মর প্রাঙ্গনে নেমেছে তাঁদের মাতৃনামের পরমোৎসবরাতি— একদিন তা'রি ধূলিধূসরিত জীর্ণ বাটে জননীর কোমল চরণ বারবার হয়েছে ব্যথাহত···ধূলায় এসে চরণ ভ'রে শুধু ধূলাই নিয়ে গেছেন .. আর আজ? অলকার স্বর্ণসিংহাসনে মা রাজরাজেশ্বরী—তাই

ধূলার বুকেও বুঝি তা'রি স্বর্ণচ্ছবি···বাংলার এক অখ্যাত পল্লীবক্ষে শান্তির পুঞ্জীভূত তুষারে গঠিত ঐ মাতৃমন্দিরে সেদিন উড়েছিল যে বিজয় নিশান—শুচিশুভ্র হংসদূতের মত পক্ষবিস্তার ক'রে, সে একদিন ছায়া মেলে দাঁড়াবেই, সারা বিশ্বজুড়ে ঘোষনা করবে মাতৃনামের বৈজয়ন্তী—শোনাবে জননীর বীরসন্তান, বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠের মহাভারতী, "হে ভারত! ভুলিওনা—তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী,......ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না তোমার সমাজ—সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র"......

একদিন সকলকে এসে দাঁড়াতে হ'বে—সকলকে এসে মিলিত হ'তে হ'বে এই কল্যাণছত্রচ্ছায়া তলে···আর শতযুগের অন্ধকার ঠেলে উন্নত শীরে বলতে হবে, বীরসন্ন্যাসীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে,—"হে গৌরীনাথ! হে জগদম্বে! আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা—আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

আর উপনিষদের প্রথম ঊষায় উমা হৈমবতীর মত ক্ষণ প্রকাশিত ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিনী আমাদের মা'র চরণে আমাদের প্রার্থনা জানাতে হবে—যুক্তকরে—অশ্রুসিক্ত নয়নে—

"আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রী ছন্দসাং মাত "ব্রহ্মময়ী" নমোঽস্তু তে ॥"

সমাপ্ত

আর কি আসিবি ফিরে
তারা ঝিম্‌ঝিম্‌ পৌষালী রাতে
জননীর মত ঘিরে।
সাঁঝালো দীপেরে দেখি
মনে প'ড়ে যায় জননী গো তোর
কুহেলী জড়ানো আঁখি।
মনে প'ড়ে যায় ওমা,—
সন্তান তরে বুক ভাঙ্গা কত
দুঃখ বেদনা সোণা।
অলকার আঁখি মেলে
মনে কি পড়েনা ক্ষণিকের তরে
সন্তানে গেছ ফেলে।
জীবনের এই পারে
শত বাধা আর জর্জ্জর হিয়া
চেয়ে দেখা বারে বারে।
সীমা অসীমায় মিশা
"এঘর ওঘর" কভু নয় ভুল
অকুলে মিলায় দিশা।
স্বপনের চুমা আঁকি
জাগরণে যেন দাঁড়ায়ো জননী
তেমনি সোহাগ মাখি।
জীবন তীর্থ তীরে
মরণ পাত্রে অমিয়া উছসি
এসগো জননী ফিরে॥

—[illegible]—

বাণী

যার আছে ভয়, তারই হয় জয়।

*   *   *   *

বিশ্বাস কি সোজা কথা বাবা? বিশ্বাস শেষের কথা—বিশ্বাস হ'লেই ত' হ'য়ে গেল।

*   *   *   *

বাসি, পচাজিনিষ খাবে না। যা খাবে মনে মনে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে খাবে। তাতে রক্ত পরিস্কার হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্ম্মল হবে।

*   *   *   *

যে জিনিষ ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়, সে জিনিষ যেমনই হোক, আর তা থাকে না, প্রসাদ হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রসাদ হলেও লোভ ক'রে কখন খাবে না।—

*   *   *   *

এই যে খুঁটিটি দেখছ এর ভেতর ভগবান আরোপ কর্ত্তে পারলেও ভগবান লাভ হতে পারে।

*   *   *   *

মন দিয়েই সব হয়।

*   *   *   *

পৃথিবীর মতন সহ্য গুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে অবাধে সব সইছে, মানুষেরও সেই রকম চাই।

*   *   *   *

কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ যেমন আছে মনেরও সেইরকম অবস্থা হয়—

কখন ভাল, কখন মন্দ। এ প্রকৃতির নিয়ম। মনের যেমন্ অবস্থাই হোক না কেন, সকাল সন্ধ্যায় ব'সতে ছাড়বে না। মন ভাল অবস্থায় থাকলেও সকল সময় বেশ ব'সতে চায় না; আবার চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখন কখন বেশ ব'সে যায়। কোন্ মুহুর্ত্তে যে হবে তা বলবার যো নাই।—

*　　*　　*　　*

তীর্থভ্রমণ খুব ভাল, ওতে মন পবিত্র হয়। তবে দীক্ষা নিয়ে তীর্থদর্শনে যাওয়া ভাল।

*　　*

বকল্‌মা মানে, মনে মনে ভগবানকে সমস্ত ভার অর্পণ করা বকল্‌মা দেওয়ার পরেও ইষ্টমন্ত্র জপ, কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মরণ করিতে হয়।

সব এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে, একটি একটি করে হয়নি।

*　　*　　*　　*

মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি, কি চাইতে কি চাইবে। তবে ভক্তি ও নির্ব্বাসনা চাইতে হয়।—

*　　*　　*　　*

এই কাঁচা শরীর দিয়েই পাকা শরীর লাভ ক'র্ত্তে হয়; সেই জন্যে এই শরীরটাকে যত্ন করা চাই।

*　　*　　*　　*

শরীরধারণে কিছু মাত্র সুখ নাই। দুঃখপূর্ণই জগৎ। সুখ কেবল একটি নাম মাত্র। ঠাকুরের কৃপা যা'র উপর হয়েছে সেই কেবল তাঁকে ভগবান ব'লে জানতে পেরেছে; এবং তা'র সেইটুকুই সুখ জানবে।

*　　*　　*　　*

পূজাপদ্ধতির অত দরকার নেই। ইষ্ট মন্ত্রেতেই সব কাজ হয়।

*   *   *   *

ভয় কি? সর্ব্বদা জানবে, তোমাদের পিছনে একজন আছেন।

*   *   *   *

শোন নাই, নিত্যকৃষ্ণ—নিত্যভক্ত? সে ভাবে তা'রা থাকবে। তোমাদের ভয় কি? তোমাদের জন্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণলোক তৈরী করেছেন।

*   *   *   *

ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিষ—তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

*   *   *   *

মন্ত্র না নিলে সে কি পূজা ক'রবে? সে তো ছেলেখেলা।

*   *   *   *

ঠাকুরের নাম ব্রাহ্মণ হ'তে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই দেওয়া যেতে পারে।

*   *   *   *

যা কিছু দেখছ, সব ঠাকুরের।

*   *   *   *

ঠাকুরের ইচ্ছাই বলবতী। তোমার যেটুকু দরকার তিনি তাই দিচ্ছেন। এর জন্যে মনে দুঃখ না ক'রে আনন্দ কর।

*   *

কিছু না ক'রলে শরীর মন পবিত্র হ'বে কিসে? দশের সেবা কর।

*   *   *   *

আমার কাছে চাইবে না?—আমি মা!

*   *   *   *

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে ত' হয়? লোকে অহংকারে মত্ত হ'য়ে মনে করে, আমিই সব করছি, তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

*　　*　　*　　*

মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ ভ্রমণের কি দরকার?

*　　*　　*　　*

ঠাকুরের কাজ করবে আর সাধন ভজন করবে। কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী ব'সে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।

*　　*　　*　　*

সাধন মানে—তাঁর পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ করবে।

*　　*　　*　　*

জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বদা মগ্ন হ'য়ে থাকা।

*　　*　　*　　*

সাধুর রাগ দ্বেষ থাকবে না, সব সহ্য করা সাধুর দরকার।

*　　*　　*　　*

মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকার?

*　　*　　*　　*

মন বসুক না বসুক, জপ করবে।

*　　*　　*　　*

তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম্ম অনুসারে

সকলে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সূর্য্য এক কিন্তু জায়গা ও বস্তু ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

* * * *

সর্ব্বদা সদসদ্ বিচার করবে।

* * * *

সন্ন্যাসীর গৃহস্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অত্যন্ত খারাপ। বিষয়ী লোকদের বাতাস লাগাও খারাপ।

* * * *

আসন, প্রাণায়াম করলে সিদ্ধাই হয়। সিদ্ধাই লোককে পথভ্রষ্ট করে।—

* * *

সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে সর্ব্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? সাধু মেয়ে মানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর গেরুয়া কাপড় কুকুরের বগ্‌লসের মত তাকে রক্ষা করবে। কেউ তাকে মারতে পারবে না সাধুর সদর রাস্তা। সকলেই তা'র পথ ছেড়ে দেয়।

* * * *

সদ্ ইচ্ছাগুলিই পূর্ণ হয়।

* * * *

মন্দ কাজে মন সর্ব্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সে জন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ্ চাই।

* * * *

ধ্যান না হয় জপ করবে, 'জপাৎ সিদ্ধি।' জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে।

* * * *

যখন গাছ চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হ'লে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জ্জনে সাধন করা খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদয় হবে, জানবার ইচ্ছা হবে তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।"

* * * *

ভোগের জিনিস সব নিয়ে থাকলে তা'র ভোগের উপকরণও সব এসে থাকে। বাবা, কাঠেরও যদি মেয়েমানুষ হয়, তবে সেদিকে চাইবে না সেদিক দিয়ে যাবে না।

* * * *

মা'র পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য করতে পার তবেই ত' ঠিক ছেলের কাজ করলে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছেন, তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম জানবে। তবে তিনি যদি ভগবানের পথে যেতে বাধা দেন তখন অন্য কথা। কিন্তু সাবধান, মা'র সেবা করছি ভেবে বিষয় নিয়ে মেতো না।

* * * *

জগতের যত অনর্থের মূল—টাকা। তোমাদের কাঁচা বয়স, হাতে টাকা থাকলেই মন লোভ দেখাবে, সাবধান।

* * * *

ঠাকুরের একখানি ছবি নিজের কাছে রেখ, আর জানবে তিনি

সত্য—ঠাকুর তোমার কাছে রয়েছেন তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে বল 'ঠাকুর! আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও।' এরকম করতে করতে তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখ, যখনই কষ্ট হবে ঠাকুরকে জানিও।

* * * *

কৃপা বড় কথা।

* * * *

সহ্যের চেয়ে কিছুই নাই।

* * * *

যে সময়ে বলে, সে বান্ধব।
অসময়ে 'আহা' ক'রলে কি হয়?

* * * *

তোমাদের ভয় কি? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে, আর সর্ব্বদা জানবে যে ঠাকুর তোমার পিছনে আছেন।

* * * *

কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।

* * * *

যেখান দিয়ে যাবে তা'র চতুর্দ্দিকে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সব দেখে রাখবে, আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবর গুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।

* * * *

সব বাঁশ, শিমুলগাছ—চন্দনের কাছে থাকলে কি হবে? সারবান বৃক্ষ হওয়া চাই।

* * * *

যেভাবে ও যেমন ইচ্ছা হয়, ঠাকুরে একটু মন রেখে করবে। তাতেই সব মিল্‌বে।

*　　*　　*　　*

প্রথমে মনের কথা শুনবে। প্রথম মনই গুরু।

*　　*　　*　　*

এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলতে হয়। প্রথমত নদীর তীরে বাসস্থান, কোন সময় নদী হুস্‌ ক'রে এসে বাসস্থান ভেঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় সাপ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়—কখন এসে কামড়ে দেবে তার ঠিক নেই। তৃতীয়, সাধু; তাঁদের কোন্‌ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হ'তে পারে তা তুমি জান না। তাঁদের ভক্তি করতে হয়; কোনও জবাব ক'রে অবজ্ঞা দেখান উচিত নয়।

*　　*　　*　　*

যে যত বেশী সাধন ভজন করবে সে তত শিগ্‌গির্‌ দর্শন পাবে।

*　　*　　*　　*

সর্ব্বদা সাধন ভজন করতে পার না বলেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার।

*　　*　　*　　*

ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান।

*　　*　　*　　*

আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে?

*　　*　　*　　*

অসুখ হলে ঠাকুরদের মানত করলে বিপদ কেটে যায়; আর যা'র যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।

সকাল সন্ধ্যায় তাঁর নাম করবে।

*   *   *   *

দেশাচার মানতে হয়।

*   *   *   *

বিপদ যে তোমাদের আসবে না, তা নয় ও ত' আসবেই তবে ও থাকবে না; দেখবে পায়ের তলা দিয়ে জলের মতন চ'লে যা'বে।

*   *   *   *

ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এস, বস, নাও, খাও।' আর ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্র তন্ত্র লাগে? ওসব হ'চ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদর যত্ন করতে হয়, সেই রকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে; তেমনি ভাবেই নেবেন।

*   *   *   *

তাঁর নাম যেটুকু পেয়েছ ঐটুকুই কর দেখি। ঐটুকু করতে পারলে সব হ'বে।

*   *   *   *

দোষ ত' মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।

*   *   *   *

শরণাগত হয়ে প'ড়ে থাকতে হয়, তবে ত' তাঁর কৃপা হয়।

*   *   *   *

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এটি সর্ব্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে সব ভুল।

*   *   *

অবিশ্বাস ত' আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হ'বে।

এই রকম করেই ত' বিশ্বাস হয়। এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়।

* * * *

ভক্তি করতে করতে হবে।

* * * *

শুধু তাঁর কৃপাতে ভগবান লাভ হয়। তবে ধ্যান জপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান—এ সব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্ব্বাসনা যদি হ'তে পার, এক্ষুণি হয়।

* * * *

যা'রা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হ'য়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মত মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখন সার্‌সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।

* * * *

মনই শুচি অশুচি। বাইরে অশুচি ব'লে কিছু নেই।

* * * *

যো সো ক'রে—আগে উদ্দেশ্য সাধন ক'রে নিতে হয়।

* * * *

আগের কাজ আগে করতে হয়।

* * * *

শুধু পড়লে কি আর বিশ্বাস হয়? বেশী পড়লে গুলিয়ে যায়।

* * * *

ধ্যানজপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার। কারণ কখন

যে ক্ষণ হয়, বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না। সেজন্য যতই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার।

* * * *

সন্ধিক্ষণেই তাঁকে ডাকা প্রশস্ত। রাত যা'চ্ছে, দিন আসছে, দিন যা'চ্ছে, রাত আসছে—এই হ'ল সন্ধি। এই সময় মন পবিত্র থাকে।

* * * *

যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে।

* * * *

মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কা'র কি সাধ্য ? হে জীব ! শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দেবেন।

* * * *

সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

* * * *

মাথা যে গুরুর স্থান, মাথায় কি পা দিতে আছে ?

* * * *

কাজ কর্ম্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হ'ল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি না করলাম তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। পরে জপ করতে করতে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করতে হয়। ধ্যানে প্রথমে মুখটি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যা জপধ্যান না করলে, কি করছ না করছ বুঝবে কি ক'রে ?

ভালবাসাই ত' আমাদের আসল। ভালবাসাতেই ত' তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।

* * * *

এক কথায় বলতে গেলে, নির্ব্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্মমৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।

* * * *

সেবাপরাধ একটা আছে বটে। সেটা হ'চ্ছে—সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মত নাচাতে চায়। উঠতে, বসতে, খেতে, সব তাতেই কর্ত্তা। সেবার ভাব আর থাকে না। যা'রা নিজের দেহসুখ ভুলে তাঁর সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখ জ্ঞান ক'রে সেবা করে, তাদের ওরূপ হবে কেন ?

* * * *

মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক মানুষটি চেনা যায়।

* * * *

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় একটু কিছু খেয়ে জল খেলে শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ হয়। তার পর জপতপে বা যে কোন কাজে মনটি বেশ স্থির হয়ে বসে।

* * * *

ভগবানে মতি হওয়াই আসল।

* * *

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হ'বে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার— ভিতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি? তোমরা আমার আপনার লোক। তবে কি জান, বিদ্বান সাধু, যেন হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান।

* * * *

আমাদের যা কিছু, সবার মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধ'রে থাকলে কোন বেচাল হবে না।

* * * *

জপ সংখ্যা, কর গণনা, এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক ওদিক যেতে চায়, তবু ঐ সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ করতে করতে ভগবানের রূপ দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। ধ্যান হল ত' সবই হ'ল।

* * * *

মানুষ ত' ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ। তিনি শতবর্ষ ছেলেপুলে নিয়ে থাকবেন বলেছেন।

* * * *

মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মন স্থির করবার জন্য একটু একটু নিশ্বাস বন্ধ করে ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়। তা'তে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ওভাবে বেশী করতে নাই, মাথা গরম হয়। ভগবান দর্শন বল, ধ্যান বল, সবই মন। মন স্থির হ'লে সবই হয়।

শুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
অনন্ত আকাশ	(বাদ)	১	১
ক'রে	ক'রে রেখেছে	২	১১
যেন	(বাদ)	৩	২
পর	পরম	৩	১৭
অন্ধ	(বাদ)	৫	১৭
আবিভূতা	আবির্ভূতা	৬	১৪
সন্ধ্যার	সন্ধ্যায়	৮	৫
চরণ এই	চরণ রঞ্জিত	৯	৬
রঞ্জিত	(বাদ)	৯	৬
যে	(বাদ)	১৩	১০
কখন	কখনো	১৪	১১
মোহময়ীর	মোহময়ী	১৯	৬
পূর্ব্বাসার	পূর্ব্বাশার	২২	২০
হুকুর	কুক্কুর	২৬	১৩
গভীরা	গভীর	৩০	১১
কমল	কোমল	৩১	৬
জ্বর	জ্বরের	৩৪	৫
মুরলী নিঃস্বন	মুরলী নিঃস্বন	৩৫	৬
সিঞ্চন	সিঞ্জন	৩৫	৭
সিঞ্চিত	সিঞ্জিত	৩৬	২
আরার	আর	৩৭	১১
ভক্তি	উক্তি	৩৮	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
ধ্যানে	ধ্যান	৩৯	২
বালে, যে	বালে, হে.	৩৯	১৫
বস্তু	বস্ত্র	৩৯	২৩
রসসর্দ্দার	রসদ্দার	৪১	১৩
করে	করেন	৪২	১
কপ্পনার	কল্পনার	৪৩	১৮
আঢ়া	আড়া	৪৩	২৪
তন্ত্রালোকে	তন্দ্রালোকে	৪৪	১২
যে	(বাদ)	৪৪	২২
বলেন	বলে	৪৫	১৬
চেতনা,	চেতনায়	৪৭	৪
পালাই	পালায়	৪৭	৮
এক	একদেবী	৪৮	১১
তন্ময়	ঠাকুর তন্ময়	৪৯	৮
ঠাকুর	(বাদ)	৪৯	৯
তার	তাঁর	৪৯	৯
জানিয়ে দিলেন	দাঁড়িয়েছিলেন	৪৯	১০
ভিক্ষায়	ভিখারী	৪৯	১০
অবস্থা	আস্পৃহা	৪৯	১২
আপনি	আপন	৪৯	২২
গঙ্গাস্নানে	গঙ্গাস্নানের	৫১	১২
জননী	জননীকে	৫২	১০
অফুরণ	অফুরাণ	৫৩	৮
ঝঙ্কারে	ঝঙ্কার	৫৪	৫
শুঁটি	শুঁটি,	৫৫	১৮

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
পুতুলিটিকে	পুতলিটিকে	৫৬	১১
মাতা	মা	৫৭	১২
বৃষ্টি	প্রবল বৃষ্টি	৫৯	১
ভাব	(বাদ)	৬১	১৮
সমস্ত	সমস্ত ভাব	৬১	১৯
তার	তারা	৬২	৮
স্বর্ণপট	স্বর্ণপটে	৬২	১০
মানি	মণি	৬৫	৩
সেবারের	সেয়ারের	৬৯	১৩
ঔষধও	ঔষধজ্ঞ	৭৪	২০
যেদিন	সেদিন	৭৫	১৩
তিনি	(বাদ)	৭৬	১৭
সংঘট্টের	(বাদ)	৭৭	১৬
বহু	বর	৭৭	১৮
চিরগোপনবাস	চিরগোপনবাসে	৭৯	২
বাগানবাটী	বাগানবাটীতে	৭৯	১১
প্রমাদ দৃষ্টি	প্রসাদ দৃষ্টি	৭৯	২৪
দাহ	মাহ	৮২	২৪
নি	(বাদ)	৮৩	২৪
তুনু	তনু	৮৪	১
শ্রীতুখকান্তি	শ্রীমুখকান্তি	৮৫	৬
আকুলোচ্ছন্দ	আকুলোচ্ছল	৮৫	১৪
মা	মায়ের	৮৮	১৮
চেনাকণ্ঠে	চেনাকণ্ঠ	৮৯	১৪
সকালে	সকলে	৮৯	১৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
আদিশ	অদিশ	৯০	২৩
বিয়োধিতায়	বিরোধিতায়	৯১	৩
একটী	এক'টী	৯১	৫
সারদা, গৌরী, জয়া, বিজয়া,	সারদাগৌরী—জয়াবিজয়া,	৯৪	৮
এলে	(বাদ)	৯৪	২১
এসেছিলেম	এনেছিলেন	৯৬	১১
হাচ্ছিল	হচ্ছিল	৯৬	১৯
করিতে	ক'রতে	৯৮	২০
ঘুরছেন	ঘুরছে	১০১	৬
জলে	জ্বলে	১০২	১৭
জলতাং	জ্বলতাং	১০৩	৬
হবিভূর্জাং	হবির্ভূজাং	১০৩	৭
সুমধ্যত	সুমধ্যাতা	১০৩	৭
স্বমারীরং	স্বশরীর	১০৩	১০
আসহ	অসহ	১০৩	১২
দেখেলেন	দেখলেন	১০৩	১৯
জানাছেন	জানাচ্ছেন	১০৫	১০
আভিষেক	অভিষেক	১০৭	৪
অদ্ভুত	অদ্ভুত	১১২	২২
মায়াময়ীরূপ	মায়াময়ীরূপে	১১৩	১৮
মহাকায়ার	মহামায়ার	১১৪	১৪
মায়ামায়ীরূপ	মায়াময়ীরূপ	১১৪	১৪
চলেছেন	চলেছে	১১৬	১৯
বিদায়ে	বিদায়	১১৭	২৩
সবাই	সবই	১২৫	৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
কারো	কোরো	১৩২	২৩
অবির	আবির	১৩৬	৭
প্রতি	উপর	১৪১	১১
হইয়া	হ'য়ে	১৪৩	৮
দীপ্তিশিখা	দীপ্তশিখা	১৪৩	১৬
আশিব	অশিব	১৪৮	৭
ব্রজকণ্ঠের	বজ্রকণ্ঠের	১৫১	৪
মায়ের	মেয়ের	১৫৬	১৩
যাকে	তা'তে	১৫৭	৯
প্রর্থনা	প্রার্থনা	১৫৮	২০
জানো	জানে	১৫৯	১৮
সন্তাকে	সন্তানকে	১৬৩	৩
বিশ্বস্ত	বিশ্রস্ত	১৬৫	১৬
নিঙডে	নিঙড়ে	১৬৭	১৩
আমাজের	আমাদের	১৭১	৪
চিত্তপুত্তলিকা	চিত্রপুত্তলিকা	১৭১	৬
ব'লেছে	ব'লেছ	১৭২	২০
চলে	বাদ	১৭৫	১২
মা-মা-মা	(বাদ)	১৭৬	২১
তবু	তবে	১৮১	১৩
বাসতে	বসাতে	১৮২	২১
সে	(বাদ)	১৮৩	১৫
ব্রাহ্মণ্য দেব	ব্রহ্মণ্যদেব	১৮৩	১৭
লালাটপটে	ললাটপটে	১৯০	১
মুখে	(বাদ)	১৯০	১৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
তার	আর	১৯২	২২
রন্ধে	রন্ধ্রে	১৯৩	১৭
বলেছেন	বলছেন	১৯৭	৯
আবিভাব	আবির্ভাব	১৯৮	১
মস্তঃ	সন্তঃ	২০১	১৯
ব্যাহ্নিক	বাহ্নিক	২১৫	১৩
যাব	যব	২১৯	২৩
দেবী	দেবি	২২৬	১৮
ব্রহ্মবাদিনী	ব্রহ্মবাদিনি	২২৬	১৮
গায়ত্রী ছন্দসাং	গায়ত্রি চ্ছন্দসাং	২২৬	১৯
ব্রহ্মময়ী	ব্রহ্মময়ি	২২৬	১৯

যোগেশ চন্দ্রের নির্মাল্য

—: প্রাপ্তিস্থান :—
সৎকর্ম্ম লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৬, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা